বিলাতী স্বর্ণবাই।

(সাহেব বিবির গুপ্তকথা।)

শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

শ্রীশ্রীচৈতন্য পুস্তকালয় হইতে

শ্রীশিবশঙ্কর সাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

৬৭ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।

ইউনাইটেড প্রেস।

৬৬ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।

শ্রীতিনকড়ি চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১৩১৭ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

প্রকাশকের মন্তব্য।

প্রিয় পাঠকবর্গ! এই পুস্তক পাঠান্তে আপনারা একটু সমস্যায় পড়িতে পারেন, কারণ উপসংহারে গ্রন্থকার বলিয়াছেন যে, তিনি তাঁহার নামটী অপ্রকাশ রাখিলেন অথচ এই পুস্তকের টাইটেল পেজে তাঁহার নামটী বড় বড় অক্ষরে বিদ্যমান। এই সমস্যার কারণ আছে, কারণ এই—আমার জনৈক বন্ধু কিছুদিন বিলাতে ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহার সহিত কুমারী অলিভিয়া রোজের আলাপ পরিচয় হয় এবং বিবি নিজে তাঁহার নিকট আত্মকাহিনী বর্ণনা করেন, সেই বন্ধু নিজেই অলিভিয়া রোজের নাম দিয়াছেন—বিলাতী স্বর্ণবাই। অতঃপর তিনি কলিকাতায় আসিয়া, এই কাহিনীটী পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া আমাদের প্রাচীন ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট বিবির আত্মকাহিনীটী গল্পচ্ছলে বর্ণনা করেন এবং ভুবন বাবু নিজে এই আখ্যায়িকাটী অলঙ্কারাদি সংযোগে সম্পাদন করিয়াছেন, ফলতঃ ভুবন বাবু নিজে কখন বিলাতে যান নাই, এবং তাঁহার সহিত বিবির কখনও সাক্ষাৎ হয় নাই। তিনি কেবল শ্রুতিকাহিনীটী সজ্জিত করিয়াছেন মাত্র। এক্ষণে সমস্যা পূরণার্থ আমার এই মন্তব্যটী প্রকাশ করিলাম। ইতি—

প্রকাশক।

বিলাতী স্বর্ণবাই।

(সাহেব বিবির গুপ্তকথা।)

সূচনা।
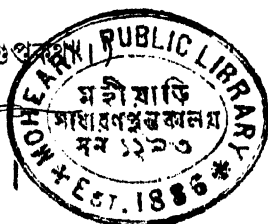
কলিকাতায় একটী স্বদেশী স্বর্ণবাই ছিলেন। আজিও তিনি বাঁচিয়া আছেন, কিন্তু বঙ্গদেশে উপস্থিত নাই। আমাদের দেশে যাঁহাদের বয়ঃক্রম বিংশতি বর্ষের অধিক, তাঁহারা স্বর্ণবাইজীর নাম শ্রবণ করিয়াছেন, তাহার কার্য্যকলাপের গল্প অবগত আছেন, কেহ কেহ তাহাকে চক্ষেও দেখিয়াছেন। স্বর্ণবাইজীর ক্রীড়াগুলির মধ্যে কতকগুলি সাত্ত্বিক, কতকগুলি রাজসিক এবং অনেকগুলি তামসিক। সে প্রকারের চরিত্র এতদ্দেশে বড় অধিক নাই, কিন্তু জগতের পাশ্চাত্য খণ্ডে সেইরূপ স্বর্ণবাই অনেক পাওয়া যায়; আমরা তাহাদের মধ্যে একটীকে নির্ব্বাচন করিয়াছি, তাহারই আখ্যা দিয়াছি—বিলাতী স্বর্ণবাই।

আমি কিছুদিন বিলাতে ছিলাম, যাহাকে বিলাতী স্বর্ণবাই বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি, তাহার সহিত নানা বিষয়ে আমার

কথোপকথন হইয়াছিল; আলাপ পরিচয়ের পূর্ব্বে ঐ নাম আমি দিতে পারি নাই, পরিশেষে মনে মনে ঐ নামটী গ্রহণ করিয়াছি। কেন করিয়াছি, তাহার মূল কারণ এই যে, সেই বিবিটীর অনেক কার্য্যের সহিত আমাদের স্বদেশী স্বর্ণবাইজীর অনেক কার্য্যের মিলন আছে। আমরা নিজে তদ্বিষয়ে বিশেষ পরিচয় দিতে ইচ্ছা করিনা। আবশ্যকতাও অল্প; কেন না, সেই বিবিটী নিজেই নিজের জীবন-কাহিনী আমার নিকট বর্ণন করিয়াছেন।

পাঠক মহাশয়! আপনারা বিবিধ ইংরাজী পুস্তকে বিবিধ বিলাতী-রহস্য পাঠ করিয়াছেন, এক্ষণে যাহাকে আমরা বিলাতী স্বর্ণবাই বলিয়া আপনাদের সম্মুখে পেস করিতেছি, তাহার জীবন-কাহিনীটী মনোযোগ দিয়া পাঠ করুন, বিশেষ প্রীতি লাভ করিবেন। নানা প্রকার উপদেশ পাইবেন, সংসারের অনেক প্রকার জ্ঞানও উপার্জ্জিত হইবে। ভূমিকায় আমরা আর বেশী কথা বলিব না; বিবি নিজে যাহা যাহা বলিয়াছেন, তাহাই পর্য্যাপ্ত হইবে। তাহাই পাঠ করুন।

প্রথম তরঙ্গ।

বর উমেদার।

আমার নাম মিস্ অলিভিয়া। জীবন কালের মধ্যে আমি অনেক খেলা খেলেছি, বেছে বেছে এক একটী বিয়ে করেছি, কিন্তু বিয়ের ফলে তুষ্ট থাক্‌তে পারি নাই। বাহিরে নায়কদের কাছে হেসে হেসে জানাতেম্, তাদের প্রেমে মনে যেন কতই সন্তোষ, কিন্তু বাস্তবিক প্রেমের সন্তোষ আমার নিকট ঘেঁস্‌তেই পারতো না, এখনও পারে না; সংশয়ের আগুন সর্ব্বক্ষণ আমার প্রাণের ভিতর যেন দপ্ দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে।

বলিয়াছি, আমার নাম অলিভিয়া,—মিস্ অলিভিয়া। এক দিন অপরাহ্নে আমি একাকিনী ময়দানের দিকে বেড়াতে যাচ্ছি, এমন সময়ে এক জন সাহেবের সঙ্গে আমার দেখা হয়। সাহেবটী যুবা, দিব্য সুশ্রী, মাথার চুলগুলি ও চোখের তারা দুটী অল্প অল্প কালো, দিব্য লম্বা লম্বা গোঁফ, গোঁফের চুলগুলি কিন্তু আমাদের দেশের সাধারণ দস্তুর মত অল্প অল্প কটা; বয়স অনুমান চব্বিশ পঁচিশ বৎসর।

যাকে দেখ্‌লেম, পূর্ব্বে দুই একবার তার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তিনি শীঘ্র শীঘ্র আমার কাছে এসে ত্বরিত স্বরে বোল্লেন, অলিভিয়া! এ পথে কোথায় যাচ্ছো? এক দল মাতাল আস্‌চে, ভারি হাঙ্গামা কর্‌ছে, তোমাকে দেখ্‌লেই

ধোরে ফেল্‌বে; এ পথে তুমি যেওনা, বামদিকে ঐ যে সঙ্কীর্ণ পথ, ঐ পথে তুমি চোলে যাও; আমিও বরং খানিক দূর তোমার সঙ্গে যাচ্চি।

মাতালের নাম শুনে সত্যই আমি ভয় পেলেম, দ্রুতপদে সেই সঙ্কীর্ণ পথে প্রবেশ কোল্লেম। আট দশ পা গিয়েই এক বার পেছন ফিরে চেয়ে দেখি, তিনিও আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌ছেন। তখন কিছু বোল্লেম না, আরও খানিক দূর এগিয়ে গিয়ে যখন একটা বৃহৎ বৃক্ষতলে উপস্থিত হোলেম, তখনও তিনি আমার সঙ্গে। আমি দাঁড়ালেম, তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে মৃদু স্বরে বোল্লেম, মিষ্টার পামর! অনেক দিনের পর আপনার সঙ্গে আজ দেখা, আপনাকে দেখে তুষ্ট হ'য়েছি বটে, কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে সঙ্গে আস্‌বেন না, যদি কেহ দেখে, বড়ই লজ্জা পাব। পরমেশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, আপনার পরিবারেরা সুখে থাকুন, আপনি এখন অন্য দিকে চোলে যান। মাতালেরা এ দিকে আস্‌বে না, আমি একাকিনী বেশ যেতে পার্‌বো।

পামর বোল্লেন, আচ্ছা, যদি তোমার সেইরূপ ইচ্ছা হয়, আচ্ছা, আমি তবে ময়দানের দিকেই যাই, কিন্তু অলিভিয়া, একটি কথা তোমাকে বোলে যাই।- তুমি আমাকে ভালবাস্‌তে পার কি না, তা আমি জানি না; কিন্তু যে দিন আমি প্রথমে তোমাকে দেখি, সেই দিন থেকেই তোমার উপর আমার আন্তরিক ভালবাসার সঞ্চার হোয়েছে; দিবানিশি তোমাকেই আমি ধ্যান করি, যে দিকে-চাই, সেই দিকেই তোমার ঐ মধুময়ী মূর্ত্তি দর্শন করি। সত্য বোল্‌ছি, ছলের কথা নয়, প্রাণের

কথা বোল্‌ছি, তোমাকে হৃদয়ে স্থান দিতে আমার একান্ত অভিলাষ; তোমাকে পূজা কোরবো, আদর কোরবো, প্রেম-রাজ্যের রাণী করবো, এইটী আমার সর্ব্বক্ষণ বাসনা।

লজ্জায় আমার মুখমণ্ডল আরক্ত হ'য়ে উঠ্‌লো, মুখ নীচু কোরে ধীরে ধীরে, একটু থেমে থেমে কম্পিত-কণ্ঠে আমি বোল্লেম, ও সকল কথা—এখন আপনি আমার কাছে তুল্‌বেন না, আমি বড় গরীব, আমাদের সংসারের এখন বড়ই দুর্দ্দশা, এ অবস্থায় ভালবাসার কথা আলোচনা করা আমার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টের বিষয়। আপনি এখন যান, অন্য সময়ে একটু সুস্থ হয়ে বিবেচনা করা যাবে।

কট্‌মট্‌ চক্ষে আমার মুখপানে চেয়ে পামর বোল্লেন, আচ্ছা যাই, কিন্তু অলিভিয়া! মনে রেখো, নিশ্চয় জেনো, তুমি আমার—না না, আমি তোমাকে আমার অঙ্কলক্ষ্মী কোর্‌বই কোর্‌বো। আমার এ প্রতিজ্ঞা অটল।

প্রত্যেক কথার উপর জোর দিয়ে দিয়ে, ঐ কথাগুলি বোলে, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাইতে চাইতে মিষ্টার পামর ময়দানের দিকে চোলে গেলেন।

সেই সঙ্কীর্ণ বনপথে আমি একাকিনী। দুইধারে জঙ্গল, মধ্যস্থলে প্রায় তিন হাত চওড়া সুঁড়ী পথ। সেই পথে— সেই বৃক্ষতলে আমি দাঁড়িয়ে আছি, কত কি ভাব্‌চি, এমন সময় হঠাৎ একটা প্রকাণ্ড কুকুর আমার নিকট দিয়ে ছুটে গেল, খুব গা ঘেসেই গেল; কিন্তু দাঁড়ালো না। কুকুরটি আমার চেনা, যাঁর কুকুর, তাঁকেও আমি বেশ চিনি। আমাকে দেখে কুকুর কেন দাঁড়ালো না, মনে মনে সেই সন্দেহটা

তোলাপাড়া কোরছি, এমন সময় এক নবীনমূর্ত্তি আমার নিকটে; যাঁর কুকুর, তিনিই তিনি। নাম ব্লাকিংহাম হোরেস। বয়স একুশ বৎসর। গোঁফ-দাড়ি কিছুই উঠে নাই, মুখখানি যেন ঠিক মেয়ে মানুষের মুখের মতন, আকারেও তিনি বড় একটা উচ্চ নন, গড়ন বেঁটে, একুশ বৎসর বয়সে তাঁকে যেন দ্বাদশবর্ষীয় বালকের মতন দেখায়। পাড়ার রসিকা যুবতীরা তাঁকে দেখে একটুও লজ্জা করে না, বালক বোলে তাকে কত রকম পরিহাস করে। বালক বোল্লে হোরেস কিন্তু ভারি চটে, যুবতীরা তাতেও পরিহাস কোত্তে ছাড়ে না। আমিও এক এক সময়ে হোরেসকে বালক বোলে একটু একটু রঙ্গ করি।

এই হোরেস যখন পাঠশালে পড়ে, তখন তার বয়স একাদশ বর্ষ। আমিও সেই স্কুলে পড়াশুনা অভ্যাস কোত্তেম, আমার বয়স তখন সাত বছর। সেই সময় থেকে হোরেসের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়। বাড়ীও নিকট নিকট, সর্ব্বদাই দেখা শুনা হোতো, কথা বার্ত্তা চোল্‌তো, দুজনে এক সঙ্গে খেলা কোত্তেম, এক সঙ্গে বেড়াতে যেতেম, দুজনে বেশ বন্ধুত্ব হোয়েছিল, সেই বন্ধুত্ব এখনও আছে, বরং পেকেছে; এখনও প্রায় সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ হয়।

সেই হোরেস আমার সম্মুখে উপস্থিত। উভয়ে সময়োচিত সম্ভাষণের পর হোরেস আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লে, রোজ! তুমি এখানে?

আমি সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে উপক্রম কোরছি, বাধা পোড়ে গেল। কুক্কুরটী আগে আগে ছুটে যাচ্ছেল, মনিবকে

দাঁড়াতে দেখে লেজ নাড়তে নাড়তে ছুটে ছুটে ফিরে এল, ঠিক আমার কাছেই দাঁড়াল। আমি সেই সময় তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর কোর্ত্তে লাগলেম।

এইখানে বলে রাখি, আমার নাম অলিভিয়া, কিন্তু বাড়ির সকলে আমাকে রোজ বোলে ডাকে, হোরেসও বলে রোজ। সেই জন্যই রোজ বোলে সম্বোধন করেছে।

কুকুরকে আমি আদর কোর্‌চি, তাই দেখে হাঁসতে হাঁসতে হোরেস বল্লে, দেখ রোজ! আমার এই নেল্‌সন্‌টি পরম সুখী। হোরেসের কুকুরের নাম নেল্‌সন্‌।

নেল্‌সন্‌ পরম সুখী, হোরেসের মুখে সেই কথা শুনে একটু হেঁসে আমি বল্লেম, সুন্দর সুন্দর কুকুরেরা সকলেই পরম সুখী।

আবার একটু হাস্য করে হোরেস বল্লে, তা নয়, এই নেল্‌-সন্‌ আজ তোমার হাতে আদর পেয়েছে, সেই জন্যই পরম সুখী। আমি নত বদনে হাস্য কল্লেম। আবার যখন মুখ তুলে চাইলেম, হোরেস তখন আমার মুখপানে চেয়ে প্রফুল্ল বদনে বল্লে, রোজ! আজ আমি তোমাকে একাকিনী নির্জ্জনে পেয়েছি, একটি মনের কথা তোমাকে শুনাতে চাই। এই বৃক্ষতলে ক্ষণকাল উপবেশন কর, সেই কথাটি আমি বলি।

ভাবার্থ বুঝতে না পেরে আমার মনে কেমন একটু সন্দেহ এল, ধীরে ধীরে আমি বল্লেম, কথা যদি বেশী হয়, তবে ক্ষমা কর, বেশী কথা শোন্‌বার আমার সময় হবে না; শীঘ্র আমাকে বাড়ি যেতে হবে। জানইতো, মা আমার পক্ষাঘাত রোগে অচলা; সন্ধ্যাকালে আমি উপস্থিত না থাকিলে তাঁর আরও কষ্ট বাড়ে। আমি বেশীক্ষণ এখানে থাক্‌তে পার্‌ব না।

হোরেস বল্লে, আমিও তোমাকে বেশীক্ষণ রাখ্‌ব না। গোটা কতক কথা আমার বল্‌বার আছে, শীঘ্রই শেষ করা যাবে।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে আমি বল্লেম, আচ্ছা, যত সংক্ষেপে পার, বলে যাও।

হোরেস বল্লে, সংক্ষেপ হতে পারে, কিন্তু তুমি যদি আমার কথার উপর কথা ফেল, তাহলেই বেড়ে যাবে, অনেক সময় লাগ্‌বে।

একটু চিন্তা করে আমি বল্লেম, না না, তোমার কথায় আমি বাধা দিব না, যত সংক্ষেপে যত শীঘ্র পার, কথাগুলি বলে ফেল।

বৃক্ষতলে বড় একখানা পাথর পাতা ছিল, সেই পাথরের এক ধারে আমি বস্‌লেম, আর এক ধারে হোরেস। কুকুরটি আমাদের উভয়ের পায়ের কাছে শুয়ে থাক্‌লো।

ক্ষণকাল স্নিগ্ধদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে, হোরেস আরম্ভ কল্লে, দেখ রোজ! আমি একটি কামিনীকে ভাল বেসেছি। সেটি দিব্য সুন্দরী। নিতান্ত দীর্ঘও নয়, নিতান্ত খর্ব্বও নয়, বেশ মাফিকসই, হস্তপদ বেশ মোলায়েম, চক্ষু দুটি সতেজ নীলোজ্জ্বল, ললাট প্রশস্ত, নাসিকা সরল, ঠোঁট দুখানি পাতলা পাতলা, তাতে ঈষৎ আরক্ত আভা, মাথার চুলগুলি স্বর্ণবর্ণ অপেক্ষাও উজ্জ্বল, ঠিক যেন কনক চম্পক। দিব্য সুন্দরী; বুঝলে কিনা,—দিব্য সুন্দরী,—ঠিক তোমার মতন। বয়সেও বোধ হয় সমান হবে। তোমার বয়স এখন কত? আঠার বৎসর হবে কি?

বক্তার মুখপানে চেয়ে চেয়ে তৎক্ষণাৎ আমি বল্লাম, কেন,

তোমার কি মনে হয় না, আমি তোমার চেয়ে চার বছরের ছোট, আমার বয়স এখন সপ্তদশ বর্ষ।

গম্ভীর বদনে হোরেস বল্লে, মধুর সপ্তদশ। হাঁ, সপ্তদশ—সপ্তদশ, হাঁ, যে কামিনীটিকে আমি আমার প্রাণের সঙ্গে গেঁথেছি, সেটির ও বয়স সপ্তদশ। ঠিক তোমার মতন।

দুইবার শুন্‌লেম ঠিক তোমার মতন। অনুমানে অনুমানে একটু একটু বুঝতে পার্‌লেম, অন্য কামিনীর নাম করে হোরেস যেন আমারই রূপ বর্ণনা কচ্ছে। তার মনের ভাব আমি ঠিক বুঝতে পার্‌লেম না, কিন্তু গতিকটা আমাকে ভাল লাগল না; অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ালেম, একটু আহ্লাদ প্রকাশ করে বল্লেম, ভাল বেশেছ বেশ কোরেছ, তাকে নিয়ে সুখী হও, এই আমার কামনা। এখন আমাকে বিদায় দাও, তুমি যে কাজে যে দিকে যাচ্ছেলে, সেই দিকে যাও, শীঘ্র আবার একদিন দেখা হবে। এখন আমি চল্লেম।

এই কথা বলে দুই এক পদ অগ্রসর হয়েছি, হোরেস তাড়াতাড়ি উঠে আমার হাত ধরে ফিরিয়ে আবার সেই পাথরের উপর বসালে, আপনিও আমার কাছে বোস্‌লো। অল্পক্ষণ কি যেন ভেবেচিন্তে একটি নিশ্বাস ফেলে বল্লে, রোজ! তুমি কি সে বন্ধুত্ব ভুলে গেলে? তোমার সঙ্গে আমার শিশুকালের বন্ধুত্ব, তোমাকে আমি যত খানি ভাল বাসি, তা তুমি জান, কিম্বা হয়ত জানই না, আমি কিন্তু তোমাকে প্রাণের সঙ্গে ভাল বাসি। এতক্ষণ একটু চাতুরি খেলিয়ে একটি কামিনীর রূপ বর্ণনা কোচ্ছেলেম, বাস্তবিক সে কামিনী অপর কেহই নহে,—তুমি—আমার হৃদয়াকাশের পূর্ণশশী,—তুমিই সেই মনোমোহিনী কামিনী।

যা ভেবেছি তাই। হোরেস এতক্ষণ আমারই রূপ বর্ণনা করেছে। আসল মতলবটা যে কি, সেটা এখনও ভাঙ্গেনি, হয়ত সেই জন্যই আমাকে আবার বসিয়েছে, না, ভাল কথা নয়, এখান থেকে শীঘ্র পলায়ন করাই শ্রেয়। ভাবলেম শ্রেয়, কিন্তু কেমন করে পালাই? হোরেস তখনও পর্য্যন্ত আমার হাত ধরে ছিল, জোর করে হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যাওয়া অভদ্রতা, অধিকন্তু সে স্থলে পালাবার চেষ্টা কোল্লে হয়ত বিপদ ঘট্‌তে পারে। তাই ভেবে নিরুত্তরে অধোমুখে বসে থাক্‌লেম্, মন কেমন চঞ্চল হোল। মৌন ভঙ্গ করে মৃদুস্বরে বল্লেম, ছেড়ে দাও, আমি যাই, সন্ধ্যা হয়।

মুখ টিপে টিপে হেঁসে হেঁসে হোরেস বল্লে, সন্ধ্যা হবার এখনও অনেক দেরী, সন্ধ্যা হবার আগেই তোমাকে ছেড়ে দিব, না হয় সঙ্গে গিয়ে বাড়ি পর্য্যন্ত রেখে আস্‌বো। যা আমি বল্‌ছিলেম, তা এখনও শেষ হয় নাই, সকল কথা বলা হয় নাই, একটু স্থির হও, শেষ কথাগুলি শুনে যাও। মিনতি করি, দয়া কর, আমাকে নিরাশ-সাগরে ভাসিয়ে দিওনা। শেষ কথাগুলি শুনে যাও।

চঞ্চলা হয়ে আমি বল্লেম, কি তোমার শেষ কথা, শীঘ্র শীঘ্র বলে ফেল, আমার মন বড় অস্থির হয়েছে, পথের মাঝে দেরী করা কখনও আমার অভ্যাস নয়।– শীঘ্র বল।

আমার হাতখানি হোরেসের মুষ্টিতে আবদ্ধ, আমার মুখখানি হোরেসের নয়নের স্থির লক্ষ্য, আমার চক্ষু সলজ্জভাবে নিম্নদিকে আকৃষ্ট। হোরেস আবার আরম্ভ কল্লে, হাঁ, আমি তোমারই রূপ বর্ণনা করেছি। রোজ! তুমি আমার হৃদয়-সর্ব্বস্ব—জীবন-সর্ব্বস্ব। যদিও আমার পিতার ধন সম্পদ বিস্তর, তথাপি তোমার

মতন রত্নলাভে বঞ্চিত থাকলে সে সকল ধন সম্পদ উপভোগে এজীবনে কখনই আমি সুখী হব না। তোমার সঙ্গে আমার শৈশবের ভালবাসার সম্বন্ধ; সে সম্বন্ধ প্রেম সম্বন্ধে বন্ধন করা আমার ইচ্ছা। তুমি আমার সেই ইচ্ছাটি পূর্ণ কর। তোমার পিতা মাতা বড় গরীব, ভাইটিও কিছু উপার্জ্জন করে না, আমি জানি, তুমি অত্যন্ত কষ্টে আছ। আমার সঙ্গে প্রেম সম্বন্ধ বাঁধাবাঁধি হলে সকল কষ্টই দূরে যাবে, তোমার মাতা পিতাও সুখী হবেন, তুমিও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বরী হবে। তাই বল্‌ছি, আমার মনবাসনা পূর্ণ কর।

কথাগুলি শুনে প্রথমেই আমি শিউরে উঠলেম, তারপর মনোমধ্যে নানা চিন্তার সংযোগ। কতকগুলি চিন্তা ভাল, কতকগুলি মন্দ। যেগুলি ভাল, সেইগুলিই আলোচনা করে মন এক রকম নরম হয়ে এল। বিবাহের প্রস্তাব শুনে মনের ভাব ব্যক্ত করা, আমাদের দেশের রীতি বিরুদ্ধ নয়; তথাপি আমার লজ্জা এসেছিল, তত কষ্টের সময় সৌভাগ্যের উদয় হবে, সেই আশাতে লজ্জা ত্যাগ করে গদগদ স্বরে আমি বল্লেম, আচ্ছা হোরেস, তুমি যে আমাকে বিবাহ কত্তে ইচ্ছা কোচ্ছ, তোমার পিতা এ বিবাহে রাজি হবেন কেন? একজন গরীব ধর্ম্মযাজকের কন্যা আমি, তোমার পিতা প্রচুর ধনের ঈশ্বর, সমাজে তাঁর মান সম্ভ্রম যথেষ্ট, তিনি কদাচ গরিবের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে সম্মত হবেন না। তবে এ বিবাহে—

আমার কথা সমাপ্ত হতে না হতে হোরেস যেন বিদ্রুপের স্বরে বলে উঠলো, বিবাহ?—বিবাহ কি?—ভদ্রলোকে কি বিবাহ করে—ছি—ছি—ছি! রোজ! প্রিয়তমে! তোমার

মুখে ঘৃণাকর বিবাহের কথাটা আমায় শুনতে হ'ল! ছি—ছি—ছি! বিবাহ কর্ত্তে হবেনা। দুজনে নির্জ্জনে প্রেমানন্দে সুখভোগে দিনযামিনী যাপন কোরবো। আমার পিতা মাতা কিম্বা তোমার পিতা মাতা, কেহই কিছু জানতে পার্‌বেন না, কেবল তাঁরাই বা কেন, পৃথিবীর জনপ্রাণীও কিছু জান্‌বে না; অথচ আমরা উভয়ে স্বর্গসুখে সুখী হব।

আর আমি ধৈর্য্য রাখতে পার্‌লাম না, ক্রোধে আমার দুই চক্ষু দিয়ে যেন আগুন ছুট্‌তে লাগ্‌লো, সজোরে হোরেসের হাত ছাড়িয়ে উঠে দাঁড়িয়ে সতেজে উচ্চকণ্ঠে বল্লেম, কি! তুমি আমাকে বিয়ে কত্তে চাওনা? কুলটার মতন প্রেমসোহাগের দাসী করে রাখ্‌তে চাও? ধিক্—ধিক্—ধিক্! তোমার যত গুলি সৎগুন আমার জানা ছিল, সমস্তই কি অগাধ সাগরের জলে ডুবে গেছে! তুমি আমাকে টাকার লোভ দেখাচ্ছ, সুখের লোভ দেখাচ্ছ, জানি আমি, তোমাদের টাকা অনেক, কিন্তু টাকা আমি চাইনি, সুখ আমি চাইনা, যদি দিন দিন উপবাস করে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাও ভাল, তথাপি সে রকম কলঙ্কের টাকায় আমার এক বিন্দুও স্পৃহা হবে না; সে রকম টাকাকে আমি অসার তূষের মতন জ্ঞান করি। তুমি পাষণ্ড, টাকার অহঙ্কারে ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানশূন্য, তোমার সঙ্গে কথা কইলেও পাপ হয়। যে কথা আজ তোমার মুখে নির্গত হ'ল, সে কথা যদি ভুলে যেতে না পার, তবে আর একদিনও আমার চক্ষের কাছে দেখা দিতে এসনা। যাও এখন, ঐদিকে তোমার পথ, আমার পথ এই দিকে।

সক্রোধে হোরেসকে এই রকম তিরস্কার কোরে চঞ্চল পদে

আমি গৃহাভিমুখে চল্লেম। পশ্চাৎ থেকে হোরেস আমাকে বল্লে, একটু দাঁড়াও, আর একটি কথা তোমাকে আমি বোলে যাব। দোহাই ধর্ম্ম, আমার শেষ কথাটি কি, তা তোমাকে শুন্‌তেই হবে।

আবার আমি দাঁড়ালেম। নিকটে গিয়ে আরক্তমুখে চক্ষু ঘুরিয়ে হোরেস বল্‌তে লাগলো, শোন আমার প্রতিজ্ঞা। তোমার সঙ্গে এখন আমার অন্য সম্পর্ক দাঁড়াল। তোমার মঙ্গলের জন্য যে কথা আমি বল্লেম, তাতে তুমি অবহেলা কল্লে, রাজি হলেনা, আচ্ছা, আজ অবধি আমি তোমার পরম শত্রু হয়ে থাক্‌লেম। এত দিন আমি তোমার বন্ধু ছিলেম, এখন সে সম্বন্ধ ঘুচ্‌লো এখন আমি তোমার শত্রু। যাতে করে পারি, তোমার অনিষ্ট আমি কর্ব্বো, মজাখানা দেখাব, তবে ছাড়্‌বো, তখন জান্‌বে, আমার নাম হোরেস রকিংহাম।

তাচ্ছিল্যভাবে আমি বল্লেম, বালক! তুমি আমার যত মন্দ কর্ত্তে পার, করো, তাতে আমি কাতর হব না; তোমার স্বভাব যখন এত দূর বদ্‌লেগেছে, তখন আর আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই না, তুমি আমার শত্রু হওয়াই ভাল।

বরাবর যেমন অভ্যাস, সেই রকমে হোরেস তখন চোটে গেল। আমি তাকে বালক বল্লেম, সেই জন্যই রাগ,—ভারি রাগ। রাগে দুই চক্ষু পাকল করে সে আমাকে আবার বল্লে, আচ্ছা—আচ্ছা—আচ্ছা, থাকো—থাকো—থাকো, দেখবো—দেখবো—দেখবো। যখন তুমি আরো দুর্দ্দশায় পতিত হয়ে কেঁদে কেঁদে আমার কাছে দয়া ভিক্ষা কত্তে যাবে, তখন আমি তোমাকে ক্ষমা কত্তে পারবো কিনা, দয়া কত্তে পারবো কিনা,

তাও এখন বল্‌তে পারি না। আমাকে তুমি বালক বল, এখনও এত তেজ তোমার, এত দম্ভ তোমার, কিন্তু জেনে রেখো যুবা-পুরুষেরা যত দূর পরাক্রমশালী, আমার পরাক্রম তাদের চেয়েও অনেক বেশী। আমার এ প্রতিজ্ঞা টল্‌বে না। এখনও বিবেচনা কর, স্বইচ্ছায় তুমি আমার হবে কিনা? যদি ভাল চাও, রাজি হও; যদি মন্দ চাও, চলে যাও। এখন আমার এই দুই কথা;—তুমি আমার বন্ধুত্ব চাও, কি শত্রুতা চাও? বিবেচনা কর।

ঘৃণায়, ক্রোধে, লজ্জায় অধীরা হয়ে তৎক্ষণাৎ আমি উত্তর কর্‌লাম, বিবেচনা অনেকক্ষণ করা হয়েছে, তোমার মত নর-পিশাচের কথার আবার বিবেচনা কি? চলে যাও। তোমার চক্ষে বিষ, বাক্যে বিষ, অঙ্গে বিষ, সেটা আমি এত দিন বুঝিনি, আজ বুঝেছি, আর আমি তোমাকে বন্ধু মনে করবো না, তোমার মত লোকে যাদের শত্রু, তারাই নিরাপদ।

হোরেস্ কি বলে, শোনবার অপেক্ষা না রেখে দ্রুতপদে আমি সেখান থেকে প্রস্থান কল্লেম। হোরেস খানিকক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে থেকে মনে মনে কি ভেবে ধীরে ধীরে অন্য দিকে চল্লো, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে গেল, ল্যাম্বার্ট কুমারি! দেখো তুমি, একদিন না একদিন নিশ্চয়ই আমি তোমার সর্ব্বনাশ কর্ব্বো। একদিন না একদিন আমি তোমাকে আপন বলে অধিকারে আন্‌বো, কেহই রক্ষা কত্তে পারবে না।

সে সকল কথায় আমি কাণ দিলাম না, আপন মনে চল্‌তে লাগলেম। সূর্য্য তখন অস্ত গিয়েছিল, প্রায় সন্ধ্যাকাল। ঠিক সন্ধ্যাকালে আমি আমাদের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত।

দ্বিতীয় তরঙ্গ।

আমার পরিচয়।

কুমারি অলিভিয়া যে দিন আমাকে এই সকল কথা বলেন, তাহার পর তিন দিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই, তিন দিন পরে পুনর্ব্বার দেখা; সেই দিন তিনি অন্য কথা উপস্থিত করেন। সেই কথাগুলি এই:—

কুমারি বল্লেন, আমার নাম অলিভিয়া, আমার পিতা একজন ধর্ম্মযাজক, মাতা পক্ষাঘাত রোগে শয্যাগত, আমরা অতি দরিদ্র, এই পর্য্যন্ত বলেছি, বিশেষ পরিচয় দেওয়া হয় নাই, আজ বিশেষ পরিচয় শ্রবণ করুন।

ইংলণ্ডের রাজধানী লণ্ডন, রাজধানীতে আমাদের বাস নয়, নগরের সীমার বাহিরে একখানি গ্রামে আমরা বাস করি, সেই গ্রামের অদূরে রকিংহাম পরিবারের বাস, রকিংহাম খুব বড় লোক। আমার পিতার নাম বিলিয়ম ল্যাম্বার্ট। রকিংহামের সহিত আমার পিতার বন্ধুত্ব ছিল, পিতা যখন নানা বিষয়ে অপব্যয় করে দেনদার হয়ে পড়েন, দরিদ্রতা রাক্ষসী যখন তাঁকে আক্রমণ করে, সেই সময় রকিংহাম তাঁকে গ্রাম্য যাজকের পদে ভর্ত্তি করবার সুপারিস করেন, সেই সুপারিসে পিতা সেই কর্ম্মটি পান, মাসিক বেতন দশ পাউণ্ড মাত্র। পিতা, মাতা, আমার একটি ভ্রাতা, আর আমি, এই চারি জন, তা ছাড়া বাড়িতে একজন দাসী আছে; মাসিক দশ পাউণ্ডে স্বচ্ছন্দে সংসার চলে না, সেই

দশ পাউণ্ড সমস্ত যদি সংসার খরচ করা হতো, তা হোলেও বরং এক রকমে চলতো, কিন্তু পিতার অনেক দেনা ছিল, সেই দশ পাউণ্ডের ভিতর থেকে সেই সব দেনার সুদ যোগাইতে হতো, সুদের পরিমাণ পাঁচ পাউণ্ড অপেক্ষাও বেশী, কাজে কাজে সংসারে আমাদের বড় কষ্ট হয়। তার উপর আমার মাতার ভয়ানক রোগ, উরুদেশ থেকে পদতল পর্য্যন্ত পক্ষাঘাতে অবশ,—অসাড়। তিনি প্রায় দিবারাত্রি শুয়ে থাকেন, এক একবার আমরা ধরাধরি করে একখানা বৃহৎ চেয়ারের উপর বসাই, তিনি যেন পুতুলের মতন বসে থাকেন, কথা কন, কিছু কিছু আহার করেন, উঠে হেঁটে বেড়াতে পারেন না। সংসারে একে অনাটন, তার উপর রোগের চিকিৎসার খরচ, কষ্টের উপর আরো কষ্ট।

আমার ভাইটি আমার চেয়ে পাঁচ বছরের বড়, তাঁর বয়স এখন বাইস বৎসর, নাম সিরিল। তিনি চাকরী ভাল বাসেন না, লণ্ডন সহরে গিয়ে কোন একটা কারবার করেন, এই তার ইচ্ছা, ইচ্ছা থাকলে কি হবে, টাকা নাই, কারবারে বেশী টাকা চাই, সে টাকা কে দিবে, পাঁচ সাতবার টাকা যোগাড় করবার চেষ্টা হয়েছিল, বৃথা চেষ্টা; কেহই গরিব লোককে টাকা ধার দিতে চায় না, কাজে কাজে সমস্ত চেষ্টা বিফল। দফা দফা হতাশ হয়ে সিরিল এক রকম জবুথবু হয়ে ঘরে বসে আছেন। ঘর কি আমাদের নিজের?—হায় হায়! গরিবের কি নিজের ঘর থাকে? যে বাড়িতে আমরা থাকি, সে বাড়িখানি একটি ভগ্ন মঠ, ভাড়া দিতে হয় না, কিন্তু মেরামত নাই, ভদ্রলোকের বাসের অযোগ্য। একটি ঘর সাজাবার জন্য পিতা আবার টাকা কর্জ্জ করেছিলেন,

সেই টাকাতে তিন চারিখানি চেয়ার, একটি টেবিল, খান কতক চিনের বাসন, একটি বিছানা আর পাঁচ খানি ছবি খরিদ করা হয়েছিল, সব জিনিষগুলি পুরাতন, অত্যন্ত জীর্ণ, টাকা দিয়ে সে সব জিনিষ ভদ্রলোকে নিতে চায় না ; সেই জীর্ণ জিনিষগুলি আমাদের সম্বল।

আগেকার দেনা পরিশোধ হয় না, মহাজনেরা কেহ কেহ সুদ পায়, কেহ কেহ কিছুই পায় না। তারপর আবার নূতন নূতন দেনা। অত্যন্ত কষ্টের সময় লোকের বুদ্ধি শুদ্ধি নষ্ট হয়। পূর্ব্বে কিছু সুখের অবস্থা ছিল, এখন সুখের সঙ্গে সম্পর্ক নাই, সুখের অবস্থা দুঃখের সময় মনে হলে বুকের ভিতর আগুন জ্বলে, সেই গুলি ভুলে থাকবার জন্য আমার পিতা এই মহাকষ্টের সময় বেজায় মদ খাওয়া আরম্ভ করেছেন ; ভাল অবস্থায় খুব অল্প অল্প মদ খেতেন, এই দুরাবস্থার সময় মদের মাত্রা একেবারে ছাপিয়ে উঠেছে, দিনেরেতে যখন তখন বোতল গেলাসের সঙ্গে খেলা হয়। মাতাল অবস্থায় ভাল কথা ভাল লাগে না ; আমরা যদি দুই একটা ভাল কথা বলি, তাহলে তিনি আমাদের গালাগালি দিয়ে মুখবন্ধ করে দেন, ভয়ে আমরা কিছু বলি না।

সৌভাগ্যের সময় পিতা পরম ধার্ম্মিক ছিলেন, দয়া মমতা স্নেহ সমস্ত গুণ তাঁর শরীরে ছিল, পরের দুঃখ দেখলে তিনি অত্যন্ত কাতর হতেন, সাধ্যমতে পরের উপকার কত্তেন, তাঁর সেই সকল সৎকার্য্য দেখে দেখে আমি আর সিরিল কতক কতক শিক্ষা পেয়েছিলাম, কিন্তু যাঁর দৃষ্টান্ত, তিনি এখন সমস্ত সৎগুণ বিসর্জ্জন দিয়েছেন, দুর্ভাগ্যের সময় অনেক লোকের সৎগুণ ঢাকা পড়ে ; আমার পিতার সে রকম নয়, ঢাকা পড়েনি, সমস্ত সৎগুণ মদের

হ্রদে ডুবে গেছে। দুর্ভাবনায় দুর্ভাবনায় আমরা বড়ই কষ্টে আছি। কখন কি হয়, মহাজনেরা কে কখন এসে ঘরের সামান্য জিনিষ গুলি বেচে লয়, সেই ভয় সর্ব্বক্ষণ। যদিও জিনিস বিক্রয় করে দেনার একটি সামান্য অংশও শোধ হবে না, তবুও আমাদের সেই ভয়।

হাঁ, সেই আমার মাতাপিতা, সেই আমার ভাইটি, সেই আমি অলিভিয়া রোজ। যাক্, সে সব দুঃখের কথা এখন থাকুক, সে দিন যে কথা বল্‌ছিলাম, তাই এখন বলি শুনুন।

হাঁ, হোরেসের সঙ্গে বাদানুবাদ করে সন্ধ্যাকালে আমি বাড়ি এলাম। যে ঘরটী সামান্য সামান্য আসবাবে সম্ভবতঃ সাজানো, সেই ঘরের দরজার ধারে আমি গিয়া দাঁড়ালেম। দেখলেম, অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বলছে, মা একখানি ইজি চেয়ারে সেই অগ্নিকুণ্ডের একধারে বসে আছেন, আর একধারে আর একখানি চেয়ারে বাবা। তিনি শুষ্ক বদনে ঘন ঘন মদের গেলাস ছোঁয়াচ্চেন, মুখের মধ্যে ধারা বর্ষণ করছেন, একটু তফাতে ছোট একখানি মার্কিন চেয়ারে ম্লানবদনে সিরিল; তিনজনের মুখ দেখে আমার উত্তপ্ত হৃদয় আরও উত্তপ্ত হোল, চক্ষে জল এসেছিল, তাড়াতাড়ি মার্জ্জনা করে নত বদনে গৃহমধ্যে প্রবেশ কল্লেম।

তারা তিন জনে চুপকরে বসেছিলেন না, কথা হচ্ছেল; যত দূর আমি শুনলেম, তাতে আমার হৃৎকম্প হোল। সংসারের অভাবের কথা, চতুর্দ্দিকে দেনার কথা, মহাজনগণের তাগাদার কথা, আর সেই সর্ব্বনেশে মদের কথা।

ঘরে প্রবেশ করেই তখনি তখনি বেরিয়ে আসা ভাল হয় না, মাথাটি হেঁট করে প্রায় দশ মিনিটকাল সেই খানে আমি দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম, কেহই আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কল্লেন না, আমিও কোন কথা বল্লেম না, শেষ-কালে মাথা ধরেছে বলে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেম, আমার শয়নের জন্য স্বতন্ত্র একটী ঘর ছিল; সে ঘরে আসবার পত্র বেশী কিছুই ছিল না, কেবল একদিকের দেয়ালে মাঝারি রকমের একখানা আয়না, তাকের উপর একটা আলো, আর দক্ষিণদিকে একখানা খাটিয়ার উপর ছোট একটি বিছানা; মশারি ছিল না, বিছানা আদুড়। সেই ঘরে আমি উপস্থিত হলেম; ক্ষুধা ছিল না, কিছুই আহার কল্লেম না; ঘরের দরজা বন্ধ করে শয়ন কল্লেম। সত্যই মাথা ধরেছিল; একটু নিদ্রা হলে আরাম হতে পারে, তাই ভেবে খানিকক্ষণ চক্ষু বুজে থাক্‌লেম, নিদ্রা এলনা। যার অন্তরে নানা ভাবনা, তার চক্ষে কি সহজে নিদ্রা আসে? নিদ্রা এল না। শুয়ে শুয়ে আকাশ পাতাল, মাথা-মুণ্ড, কত কি ভাব্‌তে লাগলেম।

তৃতীয় তরঙ্গ।

আমার চিন্তা।

ভাবছি, কি যে ভাবছি, কূল কিনারা পাচ্চিনা। বিবাহের কথা ইতিপূর্ব্বে আর কখনও আমি ভাবি নাই, সেই রাত্রে সেই ভাবনা উঠ্‌লো। আমি ভাবলেম, বিবাহ্ কি হবে না? লোকে বলে, আমি সুন্দরী, সত্য সত্য আমি সুন্দরী কি না, তা আমি বুঝি না; গরীবের মেয়ে সুন্দরী হতে পারে, কিন্তু লাবণ্য থাকে না; আহারের কষ্ট, বসনের কষ্ট, সংসারের কষ্ট, মনের কষ্ট, সকলগুলি একত্র হয়ে সুন্দরী গরীবের মেয়েকে দিন দিন মলিন করে ফেলে; আমারও সেই দশা। না না, হয়ত আমি সুন্দরী, কষ্টে থাকি, সেইজন্য সৌন্দর্য্য ফোটে না। আচ্ছা, ফোটে কি না দেখ্‌তে হবে।

বিছানা থেকে উঠ্‌লেম, দেয়ালের গায়ে যেখানে সেই দর্পণ, সেইখানে গিয়ে দাঁড়ালেম। ঘরে আলো জ্বলছেল, দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শন কল্লেম, তত কষ্টেও ওষ্ঠাগ্রে একটু হাঁসি দেখা দিল। প্রতিবিম্বের দিকে চেয়ে চেয়ে মনে মনে ভাবলেম, কেন ফুটবে না, এই যে আমার সৌন্দর্য্যটী বেশ ফুটে উঠেছে। বাঃ, সত্যই আমি সুন্দরী!

দর্পণকে চুম্বন করে আবার গিয়ে বিছানায় শুলেম। সেই সময় এক নূতন ভাব্‌না। যদি আমি সুন্দরী, তবে আমাকে বিয়ে করবার জন্য কোন রূপবান যুবাপুরুষ আমার খোসামোদ

কত্তে আসে না কেন? সুন্দরী সুন্দরী কুমারী যুবতীদের কাছে কত সুন্দর সুন্দর নব নাগর হাজির হয়, কত রকম খোসামোদ করে, আমার হও, আমার হও, বারম্বার এই প্রকার প্রেমোক্তি করে, পায়ে ধরে কাঁদে, একটু গা ঘেঁসা হলে নিত্য নিত্য করযোড়ে স্তব করে, আরো কিছু পাকা-পাকি হলে কোর্টশিপ্ খেলায়। আমিও ত সুন্দরী, আমার কাছে তবে সেরকম একটাও নাগর আসে না কেন? ওঃ! আমি গরীব, সেই জন্য হয়ত আমার দিকে কেহ ফিরে চায় না, সেই জন্যই হয়ত আমার কাছে উমেদারী কত্তে তারা ঘৃণা বোধ করে।

কেবল নাগরের কথাই বা কেন, এই যে সব বড় বড় অট্টালিকায় কত রকম আমোদ প্রমোদের মজ্‌লিস হয়, কত শত যুবতীর নিমন্ত্রণ হয়, আমার ভাগ্যে সে রকম একটা নিমন্ত্রণও জোটে না? নাচের মজলিসে, কনসার্টের মজলিসে, ভোজের মজলিসে, কেহই আমায় নিমন্ত্রণ করে না? ওঃ! আমি গরীব, সেই জন্যই বড়দরের সাহেব বিবিরা আমাকে গ্রাহ্যই করে না। আমার ভাল ভাল পোষাক নাই, ভাল ভাল জহরৎ নাই, মস্তকের কেশপাশে নব নব কুসুমের শোভা নাই, কেশ বিন্যাসের পারিপাট্য নাই, কপোল যুগলে লাল গোলাপি রং মাখা নাই, কোথায় আমি আদর পাবার আশা করি?

ভাবতে ভাবতে আবার বিবাহের কথা মনে এল। আজ বৈকালে আমি একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে বেড়াতে বেরিয়েছিলেম, তাই হয়ত দুটি উমেদার জুটে ছিল; পামর

আর হোরেস। পামর যখন ভালবাসার কথা বলে, তখন আমি ভেবেছিলাম, বিবাহের প্রস্তাব; হোরেস যখন প্রথম আড়ম্বরে বন্ধুত্বের কথা তুলে ভালবাসার ভাব জানায়, তখনও আমি ভেবেছিলাম, হয়ত বিবাহের প্রস্তাব; কিন্তু শেষকালে সে যখন নিজের পশুবৃত্তির প্রভাব জানালে, তখন আমার আশালতা একেবারে শুকিয়ে গেল। উঃ, গরীব হওয়া মহাপাপ। সংসারে কেহ যেন গরীব না হয়। বিশেষতঃ আমাদের দেশে গরীব হওয়া মহা বিড়ম্বনা। এ দেশের বড় বড় ধনবান মহাপুরুষেরা ভুলেও গরীবের দিকে নেক্‌নজর করেন না, গরীবের দুঃখে তাঁদের বড় আনন্দ হয়; উপবাসে শীর্ণকায়, বস্ত্রাভাবে উলঙ্গপ্রায়, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, যুবতী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বালক বালিকারা এ দেশের বড় লোকের কাছে কিছু ভিক্ষা চাইলে চাবুক পুরস্কার পায়। গরীব ধর্ম্ম যাজকের গরীব কন্যা আমি, সেই কারণে হোরেস আমাকে কলঙ্কিনী করবার চেষ্টা পাচ্চে; টাকার অহঙ্কারে তার বুকের পাটা অত্যন্ত বেড়ে উঠেছে, সে অহঙ্কার আর বড় বেশী দিন থাকবে না; অনেক আমি শুনেছি, অনেক রাজকুমারেরও ঐ রকম অহঙ্কার শীঘ্র শীঘ্র চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তাদের সঙ্গে তুলনায় হোরেস কোন ছার; শীঘ্রই তার পতন হবে। সংসারে কিছুই চির-স্থায়ী নয়।

আচ্ছা, হোরেসকে ত আমি চিনেছি, কিন্তু সেই পামর; হোরেসের সঙ্গে দেখা হবার পূর্ব্বে সেই পামর আমাকে সোহাগ করেছিল, বুঝেছি, আমার উপর তার লোভ আছে,

সে কি আমাকে বিবাহ করবার চেষ্টা পাবে? কিম্বা হোরেসের মতন বদ্‌মতলব? সত্য যদি তার বিবাহ করবার ইচ্ছা থাকে, তাতেই বা কি? আমি কি তাতে রাজি হব? রাজি হব না। যদিও বেশী জানাশুনা নাই, তথাপি আমি জান্‌তে পেরেছি, পামরের বেশী টাকা নাই, তাকে বিবাহ করে আমি মাতা পিতার দুঃখ ঘুচাতে পারব না, আমি নিজেও হয়ত সুখী হব না। এ দেশের পুরুষেরা যেমন ধনবতী কুমারী অন্বেষণ করে, কুমারীরাও তেমনি ধনবান বর চায়; আমিও ধনবান বরে আত্ম সমর্পণ কত্তে ইচ্ছা করি; বিবাহ যদি কত্তে হয়, গরীবকে কখনই বিবাহ কোর্ব্ব না।

এই সকল ভাবতে ভাবতে অল্প অল্প তন্দ্রা এল, সুখস্বপ্ন ভঙ্গ হয়ে গেল, প্রায় শেষ রাত্রে আমি ঘুমিয়ে পড়লেম। পরদিন প্রভাতে অনেক বেলায় আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল। পিতা, মাতা ও সিরিল আমার অপেক্ষায় হাজিরাখানার ঘরে চুপ করে বসেছিলেন, দাসীর মুখে সংবাদ পেয়ে আমি শীঘ্র শীঘ্র হাত মুখ ধুয়ে কাপড় ছেড়ে উপর থেকে নেবে যাই; একসঙ্গে হাজিরা খাই, খানার টেবিলেও হাঁসি খুসি কিছুই ছিল না, কেবল অভাবের কাহিনী, তাগাদার কাহিনী, আর জিনিস বন্দকের কাহিনী; ক্ষুধা থাকলেও আহারে আমার রুচি হোল না, যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ করে সম্ভবমত শিষ্টাচার রক্ষা কল্লেম।

চতুর্থ তরঙ্গ।

উপায় কি ?

পাঁচ সপ্তাহ অতীত। এই পাঁচ সপ্তাহের মধ্যে আর এক-বারও হোরেসের সঙ্গে আমার দেখা হয় নাই। এদিকে আমাদের সংসারের আরও কষ্ট বেড়েছে। গরীবের ঘরে সর্ব্বদা নগদ টাকা থাকে না, সুতরাং পল্লীর দোকানদারগণের নিকটে ধারে জিনিষ পত্র আনা হোত, খাদ্য সামগ্রীও ধার, বস্ত্রাদিও ধার, কেবল কর্ত্তার মদের বোতলগুলি নগদ। যে সকল দোকানদার, আমাদের জিনিষ পত্র ধার দিত, তারা সকলেই রকিংহামের প্রজা। রকিংহামের পুত্র হোরেস সেই সকল দোকানদারকে টিপে দিয়েছিল, জমিদারের কথায় তারা আমাদের ধার দেওয়া বন্ধ করিয়াছে, পাওনা টাকার জন্য ঘন ঘন তাগাদা আরম্ভ করিয়াছে, মহাবিভ্রাট! সংসার আর চলে না; দু একখানা জিনিস সম্বল ছিল, সেই গুলি বাঁধা দিয়ে এক রকমে অতি কষ্টে একমাস চলে গিয়েছে, আর চলে না। আমি বুঝতে পারলেম, হোরেস আমার সাক্ষাতে যে কথা বলে শাসিয়ে গিয়েছিল, সেটা কেবল কথার কথা নয়, কাজেও তাই করেছে, ভয়ানক শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমার মাতা পিতা সে সব কথা জানেন না, ভাইটিও জানে না, কেবল আমিই জানি। কাহাকেও সে সব কথা আমি বলি নাই।

এখন উপায় কি,—পরামর্শ করবার জন্য কর্ত্তার ঘরে আমরা সকলেই একত্র হয়েছি। রাত্রি প্রায় ১০টা।

সকলেই আমরা সেই ঘরে বসে আছি। বাবা আছেন, মা আছেন, সিরিল আছেন, আমি আছি; অগ্নিকুণ্ডের চার ধারে আমরা চারজন। শীতকাল,—আমাদের দেশে বার মাসই শীত, তবুও শীতকালে বেশী প্রকোপ।

বাবা আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে চুমুকে চুমুকে একটু একটু মদ খাচ্ছেন, আর এক একবার এক একটা বড় বড় নিশ্বাস ফেলছেন। মদ খেলে লোকের মুখ আরক্ত দেখায়; বাবার মুখখানি কিন্তু পাণ্ডুবর্ণ, বিষণ্ণ,—একটি পাত্র উজাড় কোরে, আবার একটি নিশ্বাস ফেলে, ম্লান বদনে তিনি বল্লেন, আর ত চলেনা, একটা কিছু উপায় করা চাই।

মা বল্লেন, তা ত চাই, কিন্তু উপায় ত দেখছি না। সব গেল, ঘরের জিনিস কখানা আছে, কোন দিন কোন পাওনা-দার এসে সেগুলি তুলে নিয়ে যাবে, তাই আমি ভাবছি। এ সকল জিনিষে এক জনেরও অর্দ্ধেক টাকা শোধ হবে না, আমরা কিন্তু ফকির হবো। সিরিল এত চেষ্টা কল্লে, টাকার অভাবে কিছুই ফল হলো না, দশদিক আমি অন্ধকার দেখছি।

মা যে কথাগুলি বল্লেন, সবগুলি ঠিক কথা। দশদিক অন্ধকার। বাবার একটী ঘড়ী ছিল, সেটি আজ বন্ধক পড়েছে, যা কিছু এসেছিল, তার বেশীর ভাগ মদের দোকানে চলে গিয়েছে, আর ত বাঁধা দিবার তেমন কোন জিনিষ নাই—মনে মনে আমি এই রকম ভাবছি, সিরিল হঠাৎ বলে উঠলেন, ভগবানের মনে কি আছে, কেহই বল্‌তে পারে না। একটা কিছু করা চাই, তা আমি

বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু কি যে করা যাবে, সেটা বুঝতে পাচ্ছি না। পাওনাদারেরা কিসে থামে? আমরা খাই না খাই, পাওনাদারদের থামাতেই হবে; তারা কখনই ছাড়বে না। রাত্রি প্রভাত হলেই কাপড়ওয়ালা রিজওয়ে তাগাদায় আসবে, রিজওয়ের পাওনা হয়েছে চল্লিশ পাউণ্ড, কোথা থেকে সে টাকা আসবে, তাই ভেবেই আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা হরে গিয়েছে। দুই একজন নয়, পাওনাদার অনেক; তারা একে একে আদালতে নালিশ রুজু কোরছে, সব মোকদ্দমায় নিশ্চয়ই ডিক্রী হবে, টাকা আদায় হবে না, ঘরের সামান্য জিনিষগুলি নিলাম হয়ে যাবে, আমরা পথের ভিখারী হবো। সরকারী কারাগার ভিন্ন আর কোথাও আমাদের স্থান থাকবে না। ওয়ার্ক হাউস্, সেটাও এক প্রকার কারাগার। যারা যারা সরকারী শ্রম-নিবাসে যায়, হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে তারা বেশী দিন বাঁচে না। আমাদের উপায় কি?

আর এক পাত্র মদ্য নিঃশেষ করে, আর একটি নিশ্বাস ফেলে বাবা বোল্লেন, তাই তো? উপায় কি? আর কোথাও কিছু ধার পাওয়া যাবে না, কেহই আর আমাকে বিশ্বাস করবে না, দুঃসময়ে সকল লোকেই বিমুখ হয়, অপরের কষ্ট দেখলে অনেক লোকে হাঁসে; কোথাও কিছু পাব না? মনে করেছি, রকিংহামের কাছে একবার যাব, তিনি আমার বন্ধুলোক, উপকারী বন্ধু, তার কাছ থেকে চল্লিশটি গিনি ধার করে আন্‌বো। খুব ভোরে উঠে যাব, এইরূপ স্থির করে রেখেছি।

বাবার কথা শুনে আমার ভয় হোল। রকিংহাম এ সময়ে টাকা ধার দিবে, কিছুতেই এমন বিশ্বাস হয় না। সে যদি নিজে কিছু দিতে ইচ্ছা করে, ছেলেটা নিশ্চয়ই বাধা দিবে, নিশ্চয়ই বারন কোর্‌বে। সেই হোরেস আজ কাল আমাদের এই সকল বিপদ ঘটাচ্চে। দোকানদারদের বারন করেছে, নালিস কর্ব্বার জন্য উস্কে দিয়েছে, মোকদ্দমায় সাহায্য কর্‌ছে, এই সব আমি শুনেছি; আরও যে কি কর্ব্বে, কি যে তার মনে আছে তাও বল্‌তে পারি না। এই সব কথা তোলাপাড়া করে, রকিংহামের কাছে যেতে পিতাকে নিষেধ কর্ব্বো, ভিতরের কথা বল্‌ব না, সাদা কথায় বারন করে দিব, এই রকম আমার সংকল্প।

বলি বলি মনে করছি, ঠোঁটের আগায় কথা এসেছে, কিন্তু আমাকে কিছু বল্‌তে হলো না। অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হয়ে সিরিল তৎক্ষণাৎ বল্লেন, না পিতা, তার কাছে আপনি যাবেন না। সে লোকটা আসলেই ভাল নয়, নিতান্ত স্বার্থপর, নিতান্ত পরশ্রীকাতর, নিতান্ত দাম্ভিক, সে কেবল নিজের মানগৌরব বাড়াবার জন্য ফন্দি ফিকির আঁটে, কৌশলে স্বার্থসিদ্ধি করে; সকল লোকে তার পায়ের তলে থাকে, নিত্য নিত্য খোসামোদ করে, সকল কাজে বাহাদুরী দেয়, এইটীই তার মতলব। আপনি তাকে বন্ধু বল্‌ছেন, হতে পারে বন্ধু, যখন আপনার সুসময় ছিল, তখন সে আপনার বন্ধু হয়েছিল; এখন আপনার দুঃসময় পড়েছে, কৈ, এখন কি সেই রকিংহাম পুরাতন বন্ধু বলে একদিনও একবার উঁকি মেরে দেখেছে? একদিন কি আপনার বাড়িতে এসে

কোন খবর নিয়েছে? একদিনও কি—আপনি কেমন আছেন, একদিনও কি সেকথা জিজ্ঞাসা করেছে? না পিতা, ধূর্ত্ত রকিংহাম সে রকমের লোক নয়, তার কাছে আপনি যাবেন না, অপমান হবেন। তবে যদি বলেন, রকিংহাম আপনাকে ধর্ম্মযাজকের পদে বাহাল করবার জন্য সুপারিস করেছিল, সেটা তার এক রকম ইষ্টসিদ্ধির মতলব; তাতে তার স্বার্থ ছিল। ঐ কাজের জন্য লোকে তাকে পরোপকারী বল্‌বে, বন্ধুবৎসল বল্‌বে, খবরের কাগজে খোসনাম উঠিবে, এই তার আসল মতলব; বন্ধুত্বের পরিচয় নয়। আরও ভাবুন, এই কষ্টের সময় আপনি আরও কতবার তার কাছে টাকা কর্জ্জ চাইতে গিয়েছিলেন, সে কি আপনাকে একবারও কিছু সাহায্য করেছিল? একবারও নয়,—দফা দফা রুক্ষহস্তে ফিরিয়ে দিয়েছিল। আবার কেন অপমান হবেন,—যাবেন না।

সিরিলের কথাগুলি শুনে বাবা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকলেন, মনে মনে কি ভাবলেন, আবার একটু মদ খেলেন; তারপর আমার জননীর মুখপানে চেয়ে চক্ষু ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা কল্লেন, কি গো? তোমাকে যে কাজটা করবার জন্য অনুরোধ করেছিলেম, তার তুমি কি কোল্লে?

মা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ ছিলেন, এইবার মস্তক সঞ্চালন করে ধীরে ধীরে বল্লেন, তা আমি পারব না; সেখানে কিছু হবে না। জানই ত, দুবার আমি দুখান চিঠি লিখেছিলেম, কোন ফল হয় নাই। প্রথম চিঠি খানার জবাব পর্য্যন্ত পাইনি, শেষ চিঠি খানার জবাব এসেছিল; তাতে যে কথা লেখা ছিল, এতদিন ত তোমাকে বলিনি, আজ বলি, ভগ্নী

লিখেছিল, তুমি আমাদের মা বাপের অমতে নিজে ইচ্ছা করে একজনকে বিয়ে করেছো, সেই রাগে তাঁরা তোমাকে পরিত্যাগ করেন, বিষয় আশয় কিছুই তোমাকে দিয়ে জান নাই, সমস্তই আমার নামে দানপত্র লিখে দিয়ে গিয়েছেন, বিয়ের পর অবধি তাঁরা তোমার খোঁজ খবর রাখেন নাই, খোঁজ খবর রাখতে আমাকেও নিষেধ করে গিয়েছেন। আমাকে তুমি পত্র লেখ কেন ? আমি তোমাকে কিছুই দিব না। তবে যদি তোমার সেই স্বামী মরে, যদি তুমি বিধবা হও, তখন যা আমার কর্ত্তব্য হবে, বিবেচনা কর্ব্বো। শুন্‌লে আমার কথা,—সে পত্রে ঐ রকম লেখা ছিল। তবে আর এখন তাকে পত্র লিখে কি ফল হবে ? কিছুই হবে না। বৃথা অনুরোধ।

বাবা এক দৃষ্টে আমার জননীর মুখপানে চেয়ে থাকলেন, চক্ষের পলক দেখা গেল না, সেই রকমে চেয়ে চেয়ে তিনি আর এক গেলাস মদ খেলেন, একটিও কথা কইলেন না। ঠিক সেই সময় সদর দরজায় ঘন ঘন জোরে জোরে করাঘাত ধ্বনি।

পঞ্চম তরঙ্গ।

মিষ্টার ওয়াট্‌সন।

লুসিয়া এসে সংবাদ দিল, মিষ্টার ওয়াট্‌সন। আমাদের দাসীটির নাম লুসিয়া।

মিষ্টার ওয়াট্‌সন আমাদের একজন প্রতিবাসী। তাঁর স্বভাব খুব ভাল। আমাদের এই দুঃসময়ে প্রায় কেহই একটিবার দেখা কত্তেও আসেন না, আমরা বেঁচে আছি কি মরে গেছি, প্রায় কেহই সেকথা জিজ্ঞাসা করেন না, কিন্তু এই ওয়াট্‌সন্ মধ্যে মধ্যে সংবাদ লন, সময়ে সময়ে কিছু কিছু সাহায্য করেন। সাহায্য বল্লেম, বস্তুতঃ তিনি কিছু দান করেন না, আমাদের টাকাই দফায় দফায় আমাদের দেন। পূর্ব্বেই বলেছি, আমার পিতার দয়ার শরীর, পিতার সময় যখন ভাল ছিল, কোন প্রতিবাসীর কষ্ট দেখলে, কিম্বা কেহ তাঁর কাছে কষ্ট জানালে, তিনি বিনা দলিলে বিনা স্থদে টাকা ধার দিতেন, অনেককেই দিয়েছিলেন; এই ওয়াট্‌সন্ তাদের মধ্যে এক জন। পিতা যখন বেশী মাত্রায় মদ খেতে আরম্ভ কল্লেন, যখন অসময়ের সূত্রপাত হয়ে এল, সেই সময় প্রায় সকলেই দেনার টাকা অস্বীকার কল্লে, কেহই কিছু দিল না, কেবল এই ওয়াট্‌সনটি ধর্ম্ম বজায় রেখেছেন। ওয়াট্‌সনের কাছে আমার পিতার ৩০০ গিনি পাওনা। একেবারে সব টাকা দিতে অক্ষম, সেই জন্য কিস্তিবন্দী হয়েছে, কিস্তি কিস্তি ৪০ গিনি দিবার কথা; ৪।৫ কিস্তি শোধ করেছেন, এখন অল্পেই ঠেকেছে।

ওয়াট্‌সন্‌ এসেছেন, লুসিয়ার মুখে সেই সংবাদ পেয়ে, পিতা একবার আমার জননীর মুখের দিকে চাইলেন, তখনই আবার সিরিলের দিকে আর আমার দিকে চক্ষু ফিরালেন। আমরা চুপ করে থাকলেম।

পিতার অনুমতি পেয়ে, লুসিয়া ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, একটু পরেই মিষ্টার ওয়াটসন্‌ সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ কল্লেন। পিতা সমাদরে অভ্যর্থনা করে একখানি চেয়ার দেখিয়ে দিলেন, ওয়াট্‌সন বস্‌লেন, বসেই আমার মাতাকে, সিরিলকে আর আমাকে নমস্কার কল্লেন, মিষ্ট সম্ভাষণ কত্তেও বাকি রাখলেন না। তারপর পিতার সঙ্গে নানা রকম কথোপকথন চল্‌তে লাগলো।

খানিকক্ষণ পরে পিতা জিজ্ঞাসা কল্লেন, তবে, মিষ্টার ওয়াট্‌সন্‌! হঠাৎ আজ এত রাত্রে কি মনে কোরে আসা?

ওয়াট্‌সন। সেই রসিদখানার জন্য।

পিতা। (সবিস্ময়ে) রসিদ?—কিসের রসিদ?

ওয়াট্‌সন। সেই যে গত কিস্তিতে ৪০টি গিনি আপনি নিয়ে আসেন, আমি সে টাকার রসিদ পাই নাই।

পিতা। (গম্ভীর বদনে) টাকা যদি আপনি দিয়ে থাকেন, তবে অবশ্যই রসিদ পেয়েছেন।

ওয়াট্‌সন। যদি কি মশাই? আমার কথার ভিতর যদি নাই। আমি ধর্ম্মত বলছি, টাকা আমি দিয়েছি, রসিদ আপনি দেন নাই। বলেছিলেন, এখন বড় ব্যস্ত, আর এক সময় রসিদ দেওয়া হবে।

পিতা। (গম্ভীর বদনে) কৈ, আমার ত কিছুই মনে হচ্ছে

না, টাকা যদি আমি নিতেম, তবে নিশ্চয়ই আমার স্মরণ থাক্‌ত।

ওয়াট্‌সন। তবে কি আমি মিথ্যাবাদী?

পিতা। তবে কি আমিই মিথ্যাবাদী?

ওয়াট্‌সন। আজ্ঞে না, তা আমি বল্‌ছি না, তবে কিনা, আপনার ভুল হতে পারে; স্মরণ নেই বলছেন, তবেই বোধ হচ্ছে ভুল।

পিতা। (বিরক্তভাবে) আমার ভুল?—টাকা পেয়ে আমি ভুলে গেছি, এমন কথা তুমি বলো? আমি কি তবে তোমার কাছ থেকে সেই কটি টাকা ঠকিয়ে লব? তাই কি তুমি মনে কর?

ওয়াট্‌সন। আজ্ঞে না, তা আমি মনে কচ্ছি না। আপনি বৃদ্ধ ধর্ম্মযাজক, নিয়ত ধর্ম্মের সেবা করেন, আপনি আমাকে ঠকাবেন, এরূপ মনে করা মহাপাপ।

পিতা। (রাগত হইয়া) এটা পাপ, ওটা পাপ, সেটা পাপ, তবে তোমার পুণ্য কোথা? পাকে প্রকারে তুমি আমাকে জুয়াচোর বল্‌চ্চো, একটু একটু ভদ্রতা দেখাবার জন্য কৌশল খাটাচ্চো; ভুল? কেন হে, আমার ভুল? কেন,—তোমার কি ভুল হতে পারে না?

রেগে রেগে ওয়াট্‌সনকে এই কথাগুলি বলে, তিনি তখন সিরিলের দিকে ফিরে একটু জোরে জোরে বল্লেন, সিরিল, আনতো আমার জমা খরচের খাতাখানা।

সিরিল তৎক্ষণাৎ তাকের উপর থেকে একখানি খাতা এনে পিতার হাতে দিল। পিতা তাড়াতাড়ি সেই খাতা

খানি উল্টে পাল্টে দেখে, তাচ্ছিল্যভাবে ওয়াট্‌সনের কোলের কাছে ছুড়ে ফেলে দিলেন, গর্জ্জন করে বল্লেন, এই দেখ, কোথাও নাই, কিছুই নাই, ৪০ গিনি দূরে থাক্ একটা গিনিও জমা নাই।

ধর্ম্ম যাজকের খাতা পরীক্ষা করা বড় দোষের কথা; ওয়াট্‌সন্ সেখানি পিতার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে, একটু খুন্ন-স্বরে বল্লেন, আজ্ঞে, আপনি যখন বলছেন, খাতায় জমা নাই, তখন আর আমি বেশী কথা বলতে পারি না, খাতাও দেখতে চাই না। সেটা হয়ত তবে আমারই ভুল। আচ্ছা, নূতন কিস্তির টাকা দিব বলে আরও ৪০ গিনি আজ আমি সঙ্গে করে এনেছি, এইগুলি গ্রহণ করুন; গত কিস্তির বাকী শোধ, এই রকম একখানি রসিদ দিন।

এই কথা বলিয়াই মিষ্টার ওয়াট্‌সন্ পকেট থেকে ৪০টি চক্‌চকে গিনি বাহির করে পিতার হাতে দিলেন। পিতা তখন ফুল্লবদনে মৃদু হেঁসে, গিনিগুলি আপন পকেটে রাখিলেন, সিরিলকে বল্লেন, দাও হে, গত কিস্তির ৪০টি গিনির একখানা রসিদ লিখে দাও।

সিরিল পিতৃ আজ্ঞা পালন কল্লেন, কিন্তু লেখবার সময় তার হাতখানি একটু একটু কাঁপলো, তা আমি বেশ দেখতে পেয়ে-ছিলাম। রসিদখানি গ্রহণ করে বিষণ্ণবদনে বিনা সম্ভাষণে মিষ্টার ওয়াট্‌সন বিদায় হলেন।

আমার মন কেমন হইল; আমি আর সেখানে বসে থাক্‌তে পারলেম না, আস্তে আস্তে উঠে ধীরে ধীরে হেঁটমুখে আপনার ঘরে চলে গেলেম। রাত্রি প্রায় বারটা।

আমি শয়ন কল্লেম। ইদানীং এক রাত্রেও আমার সুখের শয়ন হয় না;—যখন শয়ন করি, তখনই একটা না একটা দুশ্চিন্তা এসে আমার শান্তি নষ্ট করে। সে রাত্রে আমার চিন্তা ওয়াট্‌সন। অনেক দিন থেকে আমি দেখে আসছি, মিষ্টার ওয়াট্‌সনের সামাজিক ব্যবহার উত্তম, তিনি ধার্ম্মিক লোক; তিনি যে টাকা না দিয়ে মিছে কথা বল্‌তে এসেছিলেন, মিছে কথা বলে রসিদ চেয়েছিলেন, এমন ত আমার বিশ্বাস হোচ্চে না; তবে এ কাণ্ডটা হল কি? পিতা প্রবঞ্চনা করেছেন? একটি কিস্তির টাকা দুবার আদায় করেছেন, সেটাও ঠিক মনে কত্তে পাচ্চি না, ব্যাপার কি?

ঘরের দরজা বন্ধ করি নাই, ভেজানো ছিল, ঘরেও আলো ছিল, শুয়ে শুয়ে আমি ভাবছি, এমন সময় অকস্মাৎ দরজা খুলে গেল, কে যেন ঘরের ভিতর এল। মাথা তুলে চেয়ে দেখি, সিরিল।

আমি বিছানার উপর উঠে বসলেম। বিস্ময় প্রকাশ করে একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা কল্লেম, দাদা! আবার নূতন কি ঘটেছে না কি? এত রাত্রে এঘরে তুমি কেন?

সিরিল চিন্তাকুল বদনে আমার বিছানার উপর এক ধারে পা ঝুলিয়ে বসলেন, প্রায় ৫ মিনিট কাল নীরবে আমার মুখ পানে চেয়ে থাকলেন, কি জানি, আমার মুখ দেখে তার মনে কি ভাবের উদয় হল, যেন একটু চমকে উঠে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, ভগ্নি! তোমার মুখ এমন বিবর্ণ হয়েছে কেন? কাণ্ডটা কিছু বুঝেছ না কি?

সটান সিরিলের বদন নিরীক্ষণ করে আমি বল্লেম, কি বুঝবো দাদা? কোন্ কাণ্ডটা, কোন্ কথা তুমি বলছো?

সিরিল। ওয়াট্‌সনের কাণ্ড।

আমি। তিনিত আবার টাকা দিলেন, রসিদ নিয়ে গেলেন, তার ভিতরে যেন কিছু গোলমাল আছে, এই রকম আমার বোধ হয়েছিল। যখন তিনি যান, তখন তার চক্ষে যেন বিন্দু বিন্দু জল দেখেছিলেম, যাবার সময় আমাদের সঙ্গে বিদায়ী সম্ভাষণ না করেই অধোবদনে—

সিরিল। ঠিক কথা, অধোবদনেই প্রস্থান করেছেন। কথাটি কি জান?—এবারের টাকাগুলি তাঁর কাছ থেকে দোকর নেওয়া হয়েছে; টাকা তিনি পূর্ব্বে দিয়াছিলেন, পিতা নিজে তাঁর বাড়িতে গিয়ে ৪০টি গিনি এনেছিলেন, সেকথা আমার বেশ মনে আছে। যে দিন সেই গিনিগুলি তিনি আনেন, সেদিন খুব মাতাল। একটি গিনি তিনি পথেই খরচ করে এসেছিলেন; বাকি গিনিগুলি টেবিলের উপর ছড়িয়ে ফেলে দিয়েছিলেন, আমি তখন সেই ঘরে ছিলেম, মাও ছিলেন; মা জিজ্ঞাসা করেন, কোথাকার গিনি? পিতা বলেন, ওয়াট্‌সনের। আজ কিন্তু একেবারেই অস্বীকার কল্লেন। ভদ্রলোকের দোকর খরচ হল।

আমি। তবে সেটা সত্য কথা? গোড়ার কথা আমি জানতেম না, কিন্তু আজকের গতিক দেখে কতক কতক সন্দেহ করেছিলেম। হায় হায়! মদ খেয়ে খেয়ে পিতার বুদ্ধিশুদ্ধি একবারে লোপ পেয়েছে।

সিরিল। সব লোপ পেয়েছে, দিদি, সব লোপ পেয়েছে। ওয়াট্‌সনটি সাধুলোক, তাকে তিনি ঠকালেন, আর আমাদের মঙ্গলের আশা নাই। ভিতরে ভিতরে পিতা এখন অনেক রকম নীচকার্য্য আরম্ভ করেছেন, পূর্ব্বের সেই ধর্ম্মভাব একেবারেই

বিসর্জ্জন দিয়েছেন, ক্রমে ক্রমে সব আমি জানতে পাচ্ছি। আহা! ওয়াট্‌সনকে ঠকান বড়ই অন্যায় হয়েছে, মানুষকে ঠকান বিশেষতঃ সে রকম ভাল মানুষকে ঠকান বড়ই অধর্ম্ম।

আমি। আচ্ছা দাদা! মা যদি জানতেন, তবে কেন সে সময় সত্য কথা বল্লেন না।

সিরিল। (নিশ্বাস ফেলিয়া) মায়েরও আজ কাল কুপ্রবৃত্তি বলবতী হয়ে আসছে, তিনিও নীচ কার্য্যে যোগ দিচ্ছেন। একবার একবার ধর্ম্মভাব মনে আসে, পিতার পরামর্শ শুনে তখনই আবার সে ভাবটি ডুবে যায়। আচ্ছা, ভগবান যখন দিন দিবেন, আমার হাতে যখন টাকা আসবে, আমি তখন সঙ্গোপনে ক্ষমা প্রার্থনা করে ওয়াটসনের ঐ ৪০টি গিনি ফিরিয়ে দিব।

আমি। আচ্ছা দাদা! মা যে বলছিলেন তাঁর ভগ্নীকে চিঠি লেখা হয়েছিল, ভয়ানক জবাব এসেছিল, সেটা কি কথা?

সিরিল। পিতার অনুরোধ। যে যে কথা শুনেছো, ঠিক তাই। আমাদের মাসী অনেক টাকার বিষয় পেয়েছেন, পিতার অনুরোধে মা তাঁর কাছে টাকা ভিক্ষা চেয়েছিলেন, তিনি দেন নাই। তত অপমান সহ্য কোরেও পিতা আবার চিঠি লেখবার জন্যে অনুরোধ কোচ্ছেন। হায় হায়! টাকার অভাব হলে ভদ্রলোকের কি এই রকম দুর্ম্মতি ঘটে?

আমি। সকলের ঘটে না, কিন্তু আমি ত দেখছি, আমাদের পিতার বিলক্ষণ দুর্ম্মতি ঘটেছে। মান সম্ভ্রম কিছুই আর থাকছে না।

সিরিল। মান সম্ভ্রম, লজ্জা সম্ভ্রম, ধর্ম্ম কর্ম্ম, কিছুই আর থাকছে না। পিতার পরামর্শে মাতাও টোলে পড়েছেন।

ওয়াটসন বিদায় হবার পর তুমি চলে এলে, একটু পরে আমিও বেরিয়ে এলেম, পিতা দরজা বন্ধ করে দিলেন। যে অভ্যাস আমার কখনও নাই, সেই কাজ কত্তে এখন আমার ইচ্ছা হয়েছিল। পিতামাতা কি কি বলাবলি করেন, গোপনে দাঁড়িয়ে সেইগুলি শুনবার জন্য আমি কপাটের ছিদ্রে কাণ রেখে খানিকক্ষণ চুপটি করে অন্ধকারে লুকিয়ে ছিলেম। মা বল্লেন, কাজটা কি ভাল হল? পিতা বল্লেন, তাতে আর দোষ কি? অভাবের সময় ওরকম কাজ কল্লে অধর্ম্ম হয় না। ওয়াটসন পূর্ব্বে টাকা দিয়েছিল, সেটা আমি ভুলি নাই, তবে কি জান, রাত পোয়ালেই রিজওয়ের জোর তাগাদা আস্‌বে, হয়ত আদালতের পেয়াদাও সঙ্গে করে আনবে, হয়ত আমাকে ধরে নিয়ে যাবে, তাই ভেবে ঐ রকম কাজ কত্তে আমার মন হয়েছিল। উপস্থিত দায়টা ত রক্ষা হ'ক তারপর ভাগ্যে যা থাকে, তাই হবে। হাঁ, তুমি ভুলনা, তোমার ভগ্নিকে আর একখানা চিঠি লিখো, কল্যই লিখো, আমি সব যোগাড় যন্ত্র ঠিক করে দিব। মা সেই কথাতে রাজি হয়েছেন। তাতেই আমি বুঝতে পেরেছি, সংসার আর থাকে না, ধর্ম্মও আর বজায় থাকে না। আমরা এখন করি কি?

আমি। সমস্যা বড় শক্ত বটে, কিন্তু লুকিয়ে থেকে মা-বাপের গুহ্যকথা শুনা পুত্রকন্যার উচিত হয় না; তুমি দরজার ধারে দাঁড়িয়ে ঐসব কথা শুনেছিলে, সেটা ভাল করনি।

সিরিল। ভাল করিনি, তা আমি জানি; কিন্তু যে রকম সঙ্কট উপস্থিত, এ সময়ে সত্য কথাগুলি জেনে রাখা বড় দরকার। একটি ভদ্রলোক প্রতারিত হলেন, আরও কত লোক

প্রতারিত হবেন, তাই বা কে বল্‌তে পারে? অধর্ম্মের সংসার! জেনে শুনে এ সংসারে বাস কত্তে আমার আর ইচ্ছা হচ্ছে না; ইহাই তোমাকে আমি বল্‌তে এসেছি। যা থাকে কপালে, এক দিকে আমি ছুটে পালাব। মনে কচ্ছি, পালাব; কিন্তু তোমার জন্যই ভাবনা; তোমাকে ফেলে কেমন করে যাব?

কথা বল্‌তে বল্‌তে সিরিলের চক্ষু সজল হয়ে এল। বিছানার উপর থেকে তিনি নেবে দাঁড়ালেন, রুমালে নেত্র মার্জ্জন করে স্তম্ভিত স্বরে তিনি বল্লেন, তবে তুমি শয়ন কর, আমি এখন চল্লেম, আরও কোথায় কি হয়, জান্‌তে হবে, বলেই তিনি ত্রাস্তপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আমি খানিক-ক্ষণ অবাক্ হয়ে বসে থাক্‌লেম, তারপর একবার উঠে দরজা বন্ধ করে, আলো নিবিয়ে শয়ন কল্লেম। শয়ন ত শয়ন, একবারও চক্ষের পাতা বুজতে পারলেম না। প্রভাতে নীচে নেবে এসে দেখলেম, পিতা তাড়াতাড়ি হাজ্‌রে খেয়ে, ফর্শা ফর্শা কাপড় পোরে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলেন, প্রায় আধ ঘণ্টা পরে আমাদের বাড়ীর দরজার সম্মুখে রাস্তায় এক-খানা গাড়ী এসে দাঁড়াল। গাড়ীতে দুজন লোক, একজন আদালতের নাজীর, আর এক জন চাপরাসী। তারা গাড়ী থেকে নাব্‌লো, পিতা কোথায়, নাজীর সেই কথা জিজ্ঞাসা কল্লে, আরও বল্লে, ফরিয়াদী টমাশ জোন্সের ডিক্রীজারিতে আমরা এই বাড়ীর মাল ক্রোক কত্তে এসেছি। যখন শুন্‌লে, পিতা বাড়ীতে নাই, বেরিয়ে গিয়েছেন, কখন আস্‌বেন ঠিক বলা যায় না, নাজীর তখন গাড়ীতে উঠে প্রস্থান কল্লে, চাপরাসীরা দরজার ধারে বসে থাকলো। আমাদের মহা উদ্বিগ্ন,—মহা বিপদ!

ষষ্ঠ তরঙ্গ।

স্ত্রীলোকের কি এই কাজ ?

দরজায় পেয়াদা বসে আছে, এক ঘণ্টা পরে পিতা ফিরে এলেন, দিব্য গোলাপী নেশায় ভোর। পেয়াদাকে সম্মুখে দেখে, বৃত্তান্ত শুনে তিনি সেইখানে একটু থম্‌কে দাঁড়ালেন। রিজওয়ের পাওনা হিসাব করে কিছু কম হয়েছিল, ৪০ গিনি দিতে হয় নাই, কিছু বেচেছিল; সেই টাকা থেকে রাস্তার এক দোকানে বাবা কিঞ্চিৎ মদ খেয়েছেন, পকেটে করেও একটি বোতল এনেছেন; আরও কিছু নগদ ছিল, কিছু ঘুস দিয়ে মিষ্টকথা বলে, পেয়াদাকে বিদায় করে দিয়ে তিনি বাড়ীর ভিতর প্রবেশ কল্লেন, চঞ্চল পদে নিজের ঘরে গেলেন, আমি তখন সেই ঘরে ছিলেম, আর কেহ ছিল না। পিতা নিজের পকেট থেকে একতাড়া কাগজ বার করে ডেস্কোর মধ্যে রাখতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ হাত কেঁপে সেই তাড়াটি মেঝের উপর পড়ে গেল, ফিতেটা শক্ত করে বাঁধা ছিল না, খুলে গেল; কাগজ গুলি ছড়িয়ে পড়লো। আমি দেখলেম, সেই সব কাগজের ভিতর একখানা খাম,—চিঠির খাম,—চারিধারে মোটা মোটা কৃষ্ণবর্ণ রেখা।

ভাবার্থ বুঝ্‌তে পারলেম না, জিজ্ঞাসাও কল্লেম না, পাশ কাটিয়ে সে ঘর থেকে আমি বেরিয়ে এলেম; কৃষ্ণ রেখা আঁকা চিঠির খাম আমি দেখেছি, সিরিলকে সে কথা তখন

বল্লেম না, প্রতিদিন যেমন দিন যায়, সেই রকমেই দিন গেল, সেই রকমেই রাত কেটে গেল, তারপর ৫।৭ দিন নূতন ঘটনা আর কিছুই হ'ল না; নূতনের মধ্যে সংসারের কষ্ট বৃদ্ধি। লোকে জিজ্ঞাসা কত্তে পারেন, মাসে মাসে ধর্ম্ম-যাজকের কার্য্যে যখন ১০ গিনি আয় হয়, তখন সংসারে কষ্ট বাড়ে কেন?

সে কথার উত্তরে আমি এই কথা বলি, মাসে ১০ গিনি আয় আছে বটে, কিন্তু সেই ১০ গিনি কি ঘরে থাকে? যাজকের কার্য্যে ভর্ত্তি হবার আগে পিতার অনেক টাকা ঋণ হয়েছিল; ঐ দশ গিনির ভিতর থেকে সেই সব ঋণের মহাজনগণকে মাসে মাসে কিছু কিছু দিতে হয়। লেখাপড়া আছে, না দিলেই নয়, এক কিস্তী যদি বাকী পড়ে, তখনই নালিস হবে, সেইজন্যই দিতে হয়; তা ছাড়া কর্ত্তার মদের খরচ। যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাতেই আমাদের কথঞ্চিৎ প্রাণ-ধারণ আর লজ্জা নিবারণ হয়। সেই জন্যই সর্ব্বদা টানাটানি, সেই জন্যই আবার নূতন নূতন ঋণ।

যাঁরা যাঁরা সংসার করেন, তাঁরা সকলেই সংসারের দায় বুঝ্‌তে পারেন, বেশী পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। আসল কথা বলি, যে দিনের কথা, সেইদিন সন্ধ্যার পর পিতা আপনার ঘরে বসে বসে একটু একটু মদ খাচ্ছেন, আগুনের ধারে মা সেই ইজি চেয়ারে বসে আছেন, আমি অন্য ঘরে অন্য কাজে ব্যস্ত আছি, সিরিল বৈকাল বেলায় কোথায় বেড়াতে গিয়েছেন, সেকথা আমাকে বলে যান নাই।

রাত্রি আটটা। সদর দরজা খোলা ছিল, একটা স্ত্রীলোক

রক্তমুখি হয়ে ছুটে এসে বাবার ঘরে ঢুকে পড়লো, তাই দেখে আমি তাড়াতাড়ি তার সঙ্গে সঙ্গে সেই ঘরে গেলেম। মাগি যেন ডাকিনী; যেমন লম্বা, তেমনি মোটা, মাথার চুল-গুলা রুক্ষু রুক্ষু, খাটো খাটো, ঠিক যেন কটা কটা চামরের মতন পিটের দিকে ঝুলছিল, কপালের কাছে, কাণের কাছে, কতকগুলো এলো চুল উড়ে উড়ে কাঁধ পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে ছিল, মুখখানা রাঙা, নাকটা চ্যাপটা, চক্ষু দুটা গোল গোল, গলাটা হাঁসের গলার মতন খুব লম্বা। মুখখানা দেখে, আর তার অঙ্গভঙ্গী দেখে, আমি ঠিক ঠাওরালেম, মাগীটা মাতাল।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করেই কর্ত্তার চেয়ারের কাছে দাঁড়িয়ে সেই মাগী খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগলো, কেমন গো কর্ত্তা, আছ কেমন? এই যে দেখছি দিব্য ফুরতি করে মদ খাওয়া হচ্ছে। আমার কথাটী কি ভুলে গেছ না কি? টাকা-গুলি দাও।

কি জানি কিসের আহ্লাদে বাবা সে রাত্রে বেশ হেঁসে হেঁসে মার সঙ্গে গল্প করছিলেন, অন্য অন্য দিন মুখ যেমন বিষণ্ণ থাকে, মদ খেলেও ফূর্ত্তি আসে না, সে দিন সে রকম নয়, বেশ প্রাণ খুলে আমোদ আহ্লাদ করছিলেন। মাগীকে দেখে সে ভাবটা দূরে গেল, একটা গেলাস মুখের কাছে তুলছিলেন, বিরক্ত হয়ে নাবিয়ে রাখ্‌লেন; একটু উগ্রকণ্ঠে মাগীকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, কিসের টাকা?

হাত মুখ ঘুরিয়ে যেন লাফিয়ে লাফিয়ে নেচে নেচে মাগীটা বল্লে, জান না?—ন্যাকা নাকি? সেই যে আমার দোকানে এক-মাস ধরে মদ খেয়ে এসেছ; সেটা কি মনে নাই?

বাবা বল্লেন, খেয়েছি ত খেয়েছি, নগদ নগদ দাম দিয়েছি, তোর টাকা কি আমি বাকি রেখেছি? দূর হ! আমার কাছে মাতলামি দেখাতে এসেছিস্? তোর মতন কত মাতাল আমার পায়ের তলায় গড়াগড়ি যায়, দূর হ।

মাগী আরও অনেক রকম মুখভঙ্গী করে, ঈষৎ বক্রভাবে দাঁড়িয়ে, বাবার মুখের কাছে একটু ঝুঁকে, হাত নেড়ে নেড়ে আস্ফালন করে বল্লে, বটে? নগদ দিয়েছিস্?—ওরে আমার নগদ ওলারে? চার দিকের দেনায় দেনায় মাথার চুল বিকিয়ে আছে, তুই আবার নগদ টাকা দিয়ে মদ খেয়েছিস্? খাতা আছে, দিন দিন সেই খাতায় তোর দস্তখত আছে, ন্যাকা সাজলে চল্‌বে না। পাদ্‌রী!—ওরে আমার পাদরী রে!—জুয়াচোর—দাগাবাজ—বেইমান—দেউলে, তোকে আমি আচ্ছা শিখান শিখাব। আমাকে তুই তাড়িয়ে দিতে চাস্,—কিসের টাকা, সেই কথা আবার জিজ্ঞাসা করিস্? রোস্—রোস,—দেখাচ্ছি!—টাকা দিবি ত দে, তা' নইলে আজ তোর সঙ্গে আমার ফাইট্ হবে।

আমি একধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঐ সব কথা শুন্‌ছি, মনে মনে ভারি রাগ হচ্ছে, কিন্তু কিছু বলতে পাচ্ছি না; মা, হাঁ করে, অবাক্ হয়ে, অনিমেষ নেত্রে মাগীর মুখের দিকে চেয়ে আছেন। মাগীকে তিনি চেনেন, আমিও একদিন তাকে দেখেছিলেম, সে হয়ত মাতাল হয়ে তামাসা কত্তে এসেছে, এলো মেলো বোক্‌ছে, তাই ভেবে মাও কিছু বল্‌ছেন না, আমিও কিছু বল্‌ছি না, অবাক্ হয়ে রঙ্গ দেখ্‌ছি।

যে গেলাসটা বাবা একটু আগে নাবিয়ে রেখেছিলেন, এই

সময় সেই গেলাসটা তুলে নিয়ে এক চুমুকে সব মদ টুকু শেষ কল্লেন, যাচ্ছে তাই বলে মাগীকে গালাগালি দিলেন; মাথা নেড়ে নেড়ে মাগী যেন শীকারি বাঘিনীর মতন একটা লাফ ছাড়লে, কাপড়ের ভিতর থেকে এক খানা ছোরা বাহির করে বাবার বুকের কাছে নাচিয়ে নাচিয়ে, জোরে জোরে বল্‌তে লাগলো, আয়—আয়—আয়,—এইবার তোর পাদরীগিরি বার কর্‌ছি। তোর সঙ্গে আমার ফাইট। তোর ছোরা আছে? পিস্তল আছে? বন্দুক আছে? কি আছে, বাহির কর্। এই সব কথা বলতে বলতে মাগী সেই ছোরাখানা বাবার বুকে বসিয়ে দিবার উদ্যোগ কল্লে।

মা নড়তে পারেন না, মহা ভয় পেয়ে চীৎকার করে উঠ-লেন, আমিও চীৎকার করে মাগীর দিকে ছুটে যাচ্ছি, ঠিক সেই সময়—ধর্ম্মের কর্ম্ম,—ঠিক সেই সময় সিরিল উপস্থিত। বাহিরে দাঁড়িয়ে সিরিল হয়ত কতক কতক শুন্‌তে পেয়েছিলেন, ফাইট্ কর্‌বার ছোরা খানা দেখতে পেয়েছিলেন, একটিও বাক্য-ব্যয় না করে, এক নিশ্বাসে ছুটে গিয়ে, পিছন দিক থেকে মাগীটাকে জোড়িয়ে ধরলেন, ছোরাখানা কেড়ে নিলেন, সজোরে এক ধাক্কা।

মাগীটা চিৎপাত হয়ে পড়ে গেল। আমি সেই সময় এগিয়ে গিয়ে মাগীটার চুল ধরে টান্‌তে লাগলেম, হাত পা ছুড়ে ছুড়ে ছট্‌ফট্ কত্তে কত্তে মাগী একবার কেঁপে কেঁপে উঠে দাঁড়িয়ে ছিল, সিরিল আবার চৌ চাপটে আর এক ধাক্কা দিলেন, মাগীটা আবার ধুপ করে পড়ে গেল। সিরিল সেইবার একগাছা লম্বা দড়ি দিয়ে তার হাত পা বেধে ফেল্লেন; মাগী যেন রাক্ষসীর

মতন হাঁ করে সিরিলকে কামড়াতে এসেছিল। সিরিল হাঁসতে হাঁসতে পেছিয়ে দাঁড়ালেন; আমিও একটু তফাতে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে হো হো করে হাঁসতে লাগলেম।

মেঝের উপর মাগী যেন কুম্ভকারের চক্রের মতন ঘুরতে আরম্ভ কল্লে; খুব বড় বড় দাঁত, সেই দাঁতগুলো কড়মড় করে আমাদের সবাইকে অনবরত গালাগালি দিতে লাগলো।

বাবা আর এক পাত্র সুরা উদরস্থ করে সিরিলকে হুকুম দিলেন, মার বেটিকে,—মার—মেরে ফেল্,—ফাঁসি যেতে হয়, কুচপরওয়া নেই,—আমি ফাঁসি যাব,—মেরে ফেল্!

মেরে ফেলা ছোট কথা নয়, সিরিল সে হুকুমে কাণ দিলেন না, মাগীর দুটো পা ধরে হিড় হিড় করে টানতে লাগলেন, টেনে টেনে ঘরের বাহির করে ফেল্লেন; চৌকাটের ঘর্ষণে মাগীর হয়তো অঙ্গ ছিঁড়ে গিয়েছিল, সে তখন বিকট চীৎকার করে উঠ্‌লো। কৌতুক দেখে হেঁসে হেঁসে আমি সেইখানে দৌড়ে গিয়ে বসে পড়লেম, খুনে মাগীর সেই ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুলগুলো খুব জোরে জোরে দু হাত দিয়ে টান্‌তে লাগলেম; এক গোছা চুল আমার হাতে ছিঁড়ে এল।

হাঁসতে হাঁসতে সিরিল বল্লেন, ভগ্নি! তুমি ঘরের ভিতর যাও, আমি একাকী এই পাপটাকে বিদায় করে দিচ্ছি। আমি ঘরের ভিতর ফিরে গেলেম। "নরকে বাস হবে—নরকে বাস হবে!" যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে চ্যাঁচাতে চ্যাঁচাতে মাগীটা ঐ কথা বলে আমাদের অভিশাপ দিল। সিরিল আর বিলম্ব কল্লেন না, সেটাকে টেনে হিঁচ্‌ড়ে সদর দরজার বাহিরের রাস্তায় ফেলে দিয়ে, পুলিস পুলিস বলে ডাকতে ডাকতে দরজা বন্ধ করে দিয়ে এলেন।

পর দিন মাগীটা আমাদের নামে পুলিসে নালিস করেছিল, সিরিল হাজির হয়েছিলেন, জবাব দিয়েছিলেন, খুনে মেয়ে মানুষ, আমার পিতাকে খুন কত্তে গিয়েছিল, তাই আমি ওটার হাত পা বেঁধে রাস্তায় বার করে দিয়েছিলেম।

মাগী বলেছিল, মিথ্যা কথা। মেয়ে মানুষে কি খুন করে? —আমি কি অস্ত্র ধরতে জানি? আমি কি পিস্তল ছুঁড়তে জানি? ছোঁড়াটা আমাকে বলছে খুনে মেয়ে মানুষ। দেখ দেখি হুজুর! এটা কি সামান্য আস্পর্দ্ধা! আমি ওর নামে হুর্‌মতের দাবী আন্‌ব।

আদালতে যাবার সময় সিরিল সেই ছোরাখানা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন; হাকিমকে সেইখানা দেখিয়ে নির্ভয়ে বলেছিলেন, ধর্ম্মাবতার! ফরিয়াদিকে জিজ্ঞাসা করুন, এ ছোরাখানা কার?

হাকিম সেই প্রশ্ন কল্লেন, মাগী অস্বীকার কল্লে,—স্বচ্ছন্দে বল্লে, ও ছোরা আমার নয়, ও ছোরা কখন আমি চক্ষেও দেখি নাই।

যে সকল হাকিম ফৌজদারী বিচার করেন, তাঁদের দৃষ্টি বড় তীক্ষ্ণ হয়; পুলিসের ম্যাজিষ্ট্রেট গম্ভীরভাবে সেই ছোরাখানা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ভাল করে দেখলেন,—দেখে দেখে বল্লেন, ছোরার বাঁটে নাম খোদা আছে। দরখাস্তে যে নাম তুমি দস্তখত করেছ, ছোরার বাঁটে সেই নাম।

মাগীর মুখে আর বাক্য থাকৃল না। ম্যাজিষ্ট্রেট সেই ছোরাখানা তখন সিরিলের হাতে দিয়ে বল্লেন, দেখ দেখি, হাড়ের বাঁটের পেছন দিকে কি নাম খোদা?

সেই জায়গাটি দেখে সিরিল সর্ব্বসমক্ষে উচ্চকণ্ঠে বল্লেন, "হায়েনা"।

আমিও এইখানে বলে রাখি, যে মাগী আমার বাবাকে খুন কত্তে গিয়েছিল, সে মাগীর নাম হায়েনা। ধন্য তার মা বাপ! তারা বোধ হয় জ্যোতিষী বিদ্যা জানত। কন্যা-রত্নটি বয়সকালে মানুষ খুন কত্তে শিখবে, এটা বোধ হয় তারা গণনায় জান্তে পেরেই রত্নটির নাম রেখেছিল হায়েনা। বাঙ্গালী ভাষায় হায়েনা বাক্যের অর্থ বাঘিনী।

আমি বলেছি, ওর মা বাপ হয়ত জানিতে পেরেছিল, মেয়েটা বয়সকালে মানুষ খুন কত্তে শিখবে। বয়স কাল কথাটা কেন বলছি, তাও বলি। হায়েনার বয়স এখন বড় জোর ২৪।২৫ বছর।

মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ হয়ে গেল। হাকিম সিরিলকে হুকুম দিলেন, তোমার পিতাকে হাজির হতে বলো। তিনি পাদরী, তাঁকে খুন কত্তে গিয়েছিল, তজ্জন্য হায়েনার নামে তিনি নালিস করুন।

পাদরী ল্যাম্বার্ট (আমার পিতা) সেই দিনেই হাজির হয়েছিলেন, সেই দিনেই নালিস করেছিলেন, সেই দিনেই বিচার শেষ হয়েছিল। বিচারের ফল হায়েনার তিন বৎসর কারাবাস।

ও মাগো! স্ত্রীলোকের কি এই কাজ!

অনেক দিনের কথা, তবুও সে কথা মনে হলে এখনও আমার গা কাঁপে। এই দেখুন না, আপনার কাছে আমি গল্প কচ্ছি, তথাপি আমার গা কাঁপছে। আমি জানি বটে, আমাদের

দেশে অনেক স্ত্রীলোক অনেক লোককে খুন করে, মেয়ে মানুষ-কেও মারে, পুরুষ মানুষকেও মারে, কুমারি কালে গর্ভ হলে গরিবের মেয়েরা পেটের ছেলেকেও গলা টিপে মারে, কিন্তু আমার বাবা নিতান্ত ভাল মানুষ, আপনার ঘরে বসে পত্নীর সঙ্গে গল্প করছিলেন, সেখানে বাড়ি চড়াও হয়ে একটা মেয়ে মানুষ তাঁর বুকে ছোরা চালাতে গিয়েছিল, মেয়ে মানুষের এত বড় বুকের পাটা আমি আর কখনও দেখি নাই, লোকের মুখে শুনিও নাই। বাঘিনি হায়েনা সেই নূতন সৃষ্টি দেখিয়েছিল। সাবাস্ দুঃসাহস!

সপ্তম তরঙ্গ।

দাদা আর আমি।

যেদিন সেই খুনোখুনি ব্যাপার, তার দুদিন পরে আমি একাকিনী আমার ঘরটিতে বসে আছি, ঘড়ির ছোট কাঁটা আট্‌টার ঘরে এসে বড় কাঁটাটিকে কোলে করে নিয়েছে, রাত্রি নটা বাজ্‌বার ২০ মিনিট বাকি, এমন সময় সিরিল সেই খানে উপস্থিত হলেন। তার মুখখানি অত্যন্ত ম্লান, চক্ষু দুটি বাষ্পপূর্ণ, মাথার চুল উস্ক খুস্ক, জামার বোতাম ছিন্নভিন্ন, দুখানি হস্ত মুষ্টিবদ্ধ।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেই তিনি সর্ব্বাগ্রে দরজা বন্ধ করে দিলেন। আমি যেখানে বসেছিলেম, সেইখানে গিয়ে আমার সম্মুখে দাঁড়ালেন, আমি বস্‌তে বল্লেম, বস্‌লেন না; আমি ও উঠে দাঁড়ালেম।

সিরিলের তখনকার মূর্ত্তি দেখে আমার ভয় হয়েছিল, কম্পিত কণ্ঠে আমি জিজ্ঞাসা কল্লেম, তোমার আজ এমন মূর্ত্তি কেন দাদা! আবার কি কোন নূতন বিপদ ঘটেছে? আমি যদি—

আরও কিছু আমি জিজ্ঞাসা কত্তেম, তিনি কিন্তু বল্‌তে দিলেন না, আমাকে থামিয়ে দিয়ে কাঁদো কাঁদো স্বরে একটু চুপি চুপি বল্‌তে লাগলেন, রোজ অলিভিয়া! প্রিয় ভগ্নি! আমি আর এদেশে থাকব না, এই রাত্রেই আমি দেশ ছেড়ে পালাব।

রাক্ষসের পুরীতে থাকতে নাই। রোজ দিদি! তুমি কোথায় যাবে? তোমার এখানে থাকা হবে না। পালাও—পালাও—রাক্ষসের পুরী! রাক্ষসের পুরী!

পূর্ব্বেই ভয় হয়েছিল, সেই ভয় আবার আমার বেড়ে উঠল। নিশ্বাস রোধ করে দারুণ সংশয়ে ভয়ে ভয়ে আমি জিজ্ঞাসা কল্লেম, অমন কথা বল্‌ছ কেন দাদা? দুঃখের সংসার হলেও আমাদের এই মঠের পুরীখানি ধর্ম্মের পুরী,—ধর্ম্মের পুরীকে রাক্ষসের পুরী কেন বল্‌ছ? আমার বড় ভয় কচ্ছে। বল, বল, শীঘ্র বল,—হয়েছে কি?

আস্তে আস্তে চক্ষের জল মুছে, বদ্ধমুষ্টি শিথিল করে সিরিল তথন একটু গুঞ্জন স্বরে বল্লেন, শুনবে তবে সব কথা? শুনলে কিন্তু এক লহমাও এ পুরীতে থাকতে তোমার মন চাইবে না। শুনবে তবে? তবে আমাকে বস্তে হ'ল।

বস্তে হ'ল বলেই তিনি আমার বিছানায় গিয়ে বস্‌লেন, আমা-কেও নিকটে ডাক্‌লেন, আমিও গিয়ে একধারে পা ঝুলিয়ে তার পাশেই বস্‌লেম।

ভারী শীত। আমার ঘরে আগুন থাকে না, সিরিলের ঘরেও থাকে না, বাবার ঘরে রাতদিন আগুন জলে। শীতে আমরা থর থর করে কাঁপি, ধমক খাবার ভয়ে একদিনও আগুন চাই না। শীত আজ আমাদের দুজনকেই, বাতাসে তালপাতার মতন কাঁপাচ্ছে। একেত সিরিলের ভীষণ মূর্ত্তি দেখে ভয় পেয়েছি, সিরিলের কথা শুনে আরও ভয় বেড়েছে, তাতেই আমার বেশী কম্প। কাঁপতে কাঁপতে দুজনেরই কণ্ঠ-স্বর রুদ্ধ হয়ে আসচে। সেই রকম রুদ্ধ স্বরে সিরিল বল্লেন,

শুনবে তবে? শোন তবে, সেই সর্ব্বনাশের কথা। আজ কদিন পিতাকে একটু একটু প্রফুল্ল দেখছিলেম, কিসের আনন্দ, সেটা বুঝি নাই, কিন্তু আনন্দের লক্ষণ অনেকটা বুঝেছিলেম। আজ বেলা যখন ১০টা, সেই সময় একটী কাজের জন্য পিতার ঘরে আমি গিয়াছিলাম, দুটি একটি কথা হয়েছে, এমন সময় একজন ডাক হরকরা এল, পিতার হাতে একখানি পত্র দিলে,— রেজিষ্টারী করা পত্র। রসিদ নিয়ে হরকরা বিদায় হয়ে গেল। পিতা সেই পত্রখানির শিরোনাম দেখে এক রকম আহ্লাদে যেন একটু অন্যমনস্ক হলেন, মাতার মুখের দিকে একবার চেয়ে, শীঘ্র শীঘ্র খামখানি ছিড়ে ফেল্‌লেন, পত্র খানি খুলে দেখে অকস্মাৎ আনন্দে আপনা আপনি বলে উঠলেন, "ব্যাঙ্ক নোট, একশ গিনি!"

পিতা সেই নোটখানা বাহির করে নিয়ে, শশব্যস্তে ডেস্কের ভিতর রেখে দিলেন; চিঠি খানা চেয়ারের উপর পড়ে থাক্‌ল, সেদিকে ভ্রূক্ষেপ রইল না। আমি একবার মনে করেছিলেম, বেরিয়ে আসি, কিন্তু মনে একটা কৌতূহল এসেছিল, সেই জন্য খানিকক্ষণ ইতস্ততঃ কল্লেম, অবসর প্রতীক্ষা। পিতা দ্রুত-পদে মাতার চেয়ারের কাছে গিয়ে, তাঁর কাণে কাণে কি গুটি-কতক কথা বল্লেন, তখনি আবার ফিরে এসে ডেস্ক খুলে সেই নোটখানি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

উত্তম অবসর। মা তখন আগুনের দিকে চেয়েছিলেন, সেই অবসরে চুপি চুপি পিতার চেয়ারের উপর থেকে সেই চিঠি খানি তুলে নিয়ে চুপি চুপি আমি বেরিয়ে পড়্‌লেম; নিজের ঘরে গিয়ে চিঠিখানা আদ্যোপান্ত পাঠ কল্লেম; আমার সর্ব্বশরীরে

রক্ত যেন জমাট বেঁধে গেল; প্রাণ যেন ঠিক্‌রে বাহির হবার উপক্রম হল।

সিরিলের মুখপানে চেয়ে আমি জিজ্ঞাসা কল্লেম, কেন দাদা, চিঠি দেখে তোমার গায়ের রক্ত জমাট হয়েছিল কেন? সে চিঠিতে কি কথা লেখা ছিল?

সিরিল বল্লেন, আমাদের গোষ্ঠির মাথা? মা আমাদের মাসীমাকে চিঠি লিখেছিলেন, সেই চিঠির জবাব।

জবাবে কি কি কথা লেখা আছে, জান্‌বার জন্য ব্যগ্রতা করে সিরিলকে আমি বার বার অনুরোধ কল্লেম। সিরিল বল্লেন, 'মুখের কথায় যদি তোমার বিশ্বাস না হয়, তাই ভেবে সেই চিঠিখানি আমি সঙ্গে করে এনেছি। পোড়ে দেখ, সমস্তই বুঝ্‌তে পার্‌বে।' এই বলে তিনি সেই চিঠিখানি আমার হাতে দিচ্ছেলেন, বারণ করে আমি বল্লেম, তুমিই পড়।

দাদা পাঠ কত্তে লাগ্‌লেন, মন স্থির করে আমি শুন্‌তে লাগলেম। চিঠিতে লেখা ছিল :—

"ভগ্নি! তোমার পত্র পাইলাম। যাহা আমি মনে করিয়াছিলাম, তাহা ঠিক হওয়াতে এখন আমি খুসী হইয়াছি। পিতা মাতা বাঁচিয়া থাকিলে, তাঁহারা আরও বেশী খুসী হইতেন। তুমি লিখিয়াছ, তোমার স্বামী মরিয়াছে, বেশ হইয়াছে। কবর দিবার খরচা ছিল না, ধার করিয়াছ; শোকবস্ত্র খরিদ করিবার টাকা ছিল না, ধার করিয়াছ; দিন গুজরাণের সম্বল নাই, তোমার স্বামী যত টাকা কর্জ্জ করিয়াদিল, তাহার জন্য নালিশ হইতেছে, তোমার ছেলে মেয়েরা

না খাইয়া রোগা হইতেছে, এই সকল বিবরণ শুনিয়া আমার আনন্দ বাড়িয়াছে। যাহা হউক, আপাততঃ এক শত গিনির ব্যাঙ্কনোট এই পত্রের মধ্যে পাঠাইলাম, প্রাপ্তি সংবাদ লিখিও। ভবিষ্যতে যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, আমাকে জানাইলে আমি তাহা পাঠাইয়া দিব। তুমি যদি আবার বিবাহ করিতে ইচ্ছা কর, এখানে দিব্য একটী বর আছে। কে জান?—ল্যাম্বার্টকে বিবাহ করিবার পূর্ব্বে যে লোকটীকে তুমি অগ্রাহ্য করিয়াছিলে, পিতা মাতা যাহার সঙ্গে তোমার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই কুটীওয়ালা মাতব্বর ব্যবসায়ী মিষ্টার হেবারটন। সেই বরটী আজিও বিবাহ করেন নাই। মনে করিয়া দেখ, তাহার সঙ্গে তোমার কোর্টশিপ্ হইয়াছিল, সে তোমাকে খুব ভাল বাসিয়াছিল, তুমি নূতন মানুষকে বিবাহ করাতে মিষ্টার হেবারটন অত্যন্ত মনঃপীড়া পাইয়াছিল, তোমার বিরহে বড় দুঃখে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, এজন্মে আর বিবাহ করিবে না; আজিও সেই প্রতিজ্ঞা পালন করিতেছে। তুমি এখন বিধবা হইয়াছ, কষ্টে পড়িয়াছ, একথা তাহাকে আমি বলিয়াছি, সে ব্যক্তিও খুসী হইয়াছে। এখন যদি তোমার ইচ্ছা হয়, শীঘ্র আমাকে পত্র লিখিও, আমি আমোদিনী হইয়া ঘট্‌কালী করিব। হেবার-টনের অনেক টাকা আছে, তাহাকে বিবাহ করিলে তুমি সুখী হইতে পারিবে। এখনও তোমার বয়স অধিক হয় নাই। আমার মনে আছে, ল্যাম্বার্টকে যখন তুমি বিবাহ কর, তখন তোমার সাত মাস গর্ভ, তখন তোমার বয়স ছিল, ঠিক সপ্তদশ বর্ষ; তোমার সেই গর্ভের ছেলের বয়স এখন বাইশ

বৎসর, তবেই বুঝিয়া দেখ, এখনও তোমার বয়স ৪০ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। আমাদের দেশে অনেক বিধবা ৪০ বৎসর বয়সে বিবাহ করে; পঞ্চাশ, ষাট, সত্তর, এমন কি, আশী বৎসর বয়সেও এক একটা বিধবার বিবাহ হয়। কেবল বিধবাই বা কেন, অনেক ভাল ভাল ঘরে ৪০ বৎসরের অবিবাহিতা কুমারী কন্যা থাকে; ৪০ বৎসর বয়সে তুমি যদি বিবাহ কর, আবার তোমার অনেকগুলি পুত্র কন্যা জন্মিতে পারিবে। মিষ্টার হেবারটন এখনও তোমাকে বিবাহ করিতে রাজি আছে। আমি তোমার চেয়ে তিন বছরের ছোট; আমি তোমাকে বুদ্ধি দিতে পারি না, তুমি অনেক বুদ্ধি ধর; কিসে ভাল, কিসে মন্দ, সমস্তই বুঝিতে পার, আমার কথা রাখ; কেন বৃথা কষ্ট পাইবে, কেন বৃথা পাওনাদার লোকের তাগাদা সহিবে, কেন বৃথা দেনার দায়ে জেল খানায় যাইবে, কেন বৃথা এই বয়সে আমার গলগ্রহ হইয়া থাকিবে, সে সব ভাল নহে, আমার কথা রাখ, হেবারটনকে বিবাহ কর।”

আমার সর্ব্ব শরীর শিউরে উঠ্‌ল। আমি যেন জ্ঞানহারা হলেম, অত্যন্ত অধীরা হয়ে দাদাকে বল্লেম, ফেলে দাও, ফেলে দাও, আর পড়তে হবে না, আর আমি শুনতে পারি না, চিঠি খানা ছিড়ে ফেল, আগুন জ্বেলে ভস্ম কর।

সিরিল বল্লেন, ভস্ম করা হবে না, মাকে একবার এই খানা দেখাতে হবে। নোট খানা পেয়ে পিতার আহ্লাদ হয়েছিল, তিনিও পড়েন নাই, মাতাও দেখেন নাই, দুজনকেই দেখাতে হবে। কি সর্ব্বনাশ! স্বামী বর্ত্তমানে বিবাহিতা পত্নী

আপন স্বামীর মৃত্যু সংবাদ ঘোষণা কর্ত্তে পারে, আপনার ভগ্নিকে সেই মহাপাপজনক মিথ্যা কথা জানিয়ে টাকা আদায় কর্ত্তে পারে, এমন ভয়ঙ্কর দৃষ্টান্ত বোধ হয় জগতে নাই। কি আশ্চর্য্য! পক্ষাঘাত রোগে মরণাপন্ন, এমন অবস্থাতেও আমাদের গর্ভধারিণী এত বড় পাপকার্য্য করেছেন, ঘটনা-সূত্রে আমরা সেটা জানতে পারলেম, আমরাও পাপী হলেম। তিনি যদি গর্ভধারিণী না হতেন, তা'হলে হয়তো আমি তাকে স্বহস্তে নিপাত কত্তেম।

আমি কেঁদে ফেল্লেম। কাঁদিতে কাঁদিতে বল্লেম, দাদা! দোহাই পরমেশ্বর! অমন কথা মুখে এনো না, মাতৃ-হত্যার কল্পনা করাও মহাপাপ। যাহবার, হয়ে গিয়েছে, এখন আমা-দের চুপ্‌চাপ্‌ করে থাকাই ভাল। আরও কি জান—

আমার শেষ কথা না শুনেই মহা উত্তেজিত হয়ে দাদা বলে উঠলেন, চুপ্‌চাপ! বল কি তুমি—চুপচাপ করে বসে থাকব! কোথায় থাকব! এই বাড়িতে? এই রাক্ষসের পুরীতে? এই পিশাচের পুরীতে? এই মহাপাপের অগ্নিক্ষেত্রে? না অলিভিয়া,—না,—তা আমি পারব না, উঃ! চিঠিখানা যেন রক্তমাখা! পাপের রক্ত! রক্ত যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে! এই রক্তমাখা চিঠিখানা—জ্বলন্ত চিঠিখানা কর্ত্তার টেবিলের উপর ফেলে রেখে আজিই আমি এ পাপ-সংসার পরিত্যাগ কর্‌ব,—যেদিকে দুই চক্ষু যায়, সেই দিকেই চলে যাব। অলিভিয়া! তোমাকে আমি সঙ্গে নিতে পার্‌ব না। আমার টাকা নাই, বিশেষতঃ কোথায় যাব, তার একটা নির্দ্দিষ্ট জায়গাও নাই, তোমাকে এখন আমি সঙ্গে নিতে পার্‌ব

না, কিন্তু তুমি কদাচ এই পাপপুরীতে থেক না; কোন একজন ধার্ম্মিক লোকের আশ্রয়ে খুব সাবধানে নিরাপদে কিছুদিন বাস কর, তার পর—

বাধা দিয়ে আমি বল্লেম, দাদা! মন একটু শান্ত কর, পাগলের মতন অমন সংকল্প কর না। বাড়ি ছেড়ে যদি যেতে হয়, দেশ ছেড়ে যদি পালাতে হয়, পিতামাতাকে যদি পরিত্যাগ কত্তে হয়, অনেক বিবেচনা করে সে রকম কাজ করা উচিত। মাসীমার চিঠি এসেছে, সে চিঠি আমরা দেখেছি, পিতামাতাকে সেটা এখন জান্‌তে দেওয়া হবে না;—আমরা যেন কিছুই জানি না, সেই ভাবে দুদিন দশদিন মুখ বুজে থাকতে হবে, তারপর যেটা বিবেচনা সিদ্ধ হয়, সেই পন্থা অবলম্বন করা যাবে। আরও কি জান,—মা কিন্তু নিজের বুদ্ধিতে সে চিঠি লেখেন নাই। তোমার মনে থাকতে পারে, পিতা যে রাত্রে, রকিংহামের কাছে টাকা ধার কত্তে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তুমি নিষেধ কর, সেই রাত্রে তিনি ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে মাকে একটা অনুরোধ করেছিলেন, মা বলেছিলেন, পারবেন না, সেখানে কিছু হবে না,—কেন হবে না তারও হেতু দেখিয়ে ছিলেন। এখনকার গতিক দেখে বুঝতে পাচ্ছি, মা, শেষকালে পিতার অনুরোধে রাজি হয়েছিলেন। হাঁ, ভাল কথা,—ইতিমধ্যে সেই যে আমি একদিন পিতার ঘরে একটা কাণ্ড দেখেছিলেম, তাও তোমাকে বলেছি,—যে দিন সেরিফের পেয়াদা এসেছিল, সেই দিন পিতা এক তাড়া কাগজ এনে ডেস্কের মধ্যে রাখছিলেন, তাঁর হাত থেকে সেই কাগজগুলো পড়ে গিয়েছিল, সেই সকল কাগজের ভিতর আমি এক খানা চিঠির খাম দেখতে পেয়েছিলেম;

খামখানার চারি ধারে কৃষ্ণবর্ণ রেখা। এখন আমি বুঝতে পাচ্ছি, মাসীমাকে চিঠি লেখবার জন্যই পিতা সেই খামখানা এনেছিলেন। কৃষ্টবর্ণ রেখাযুক্ত খামের ভিতর মৃত্যু সংবাদের চিঠি লিখতে হয়, তাই।

সিরিল বল্লেন, ঠিক তাই। শোক সংবাদ জানাতে হলে কৃষ্ণরেখা দেওয়া চিঠির কাগজে লিখে দিতে হয়, খামের উপরেও কৃষ্ণরেখা থাকে। তুমি যেটা অনুমান করেছ, তাই ঠিক। মাসীমাকে পত্র লেখবার জন্যই পিতা সেই খামখানা এনেছিলেন। তিনি এখন এক রকম উন্মাদগ্রস্ত, কিন্তু মা তার কথা শুনে কি পাপকার্য্যই করে বসেছেন। পায়ে পক্ষাঘাত, মনে পক্ষাঘাত হয় নাই, তিনি কোন বিবেচনায় আপন পতির মিথ্যা মৃত্যুর সংবাদ চিঠিতে লিখে বিদেশে রওনা কল্লেন? মাসী মা কিন্তু সে কথাটা আপন মনেই চেপে রাখবেন না, নিশ্চয়ই দশজনকে জানাবেন, সেখানকার প্রায় সকল লোকেই জানবে, পাদরী ল্যাম্বার্ট ইহ সংসার পরিত্যাগ করে গিয়েছেন। তাতে যে কত কেলেঙ্কার হতে পারে, পিতা সেটা ভেবে উঠতে পারেন নাই। টাকার দায়ে, টাকার লোভে, তাঁর মতিচ্ছন্ন হয়েছে, মাতাও সেটা ভাবেন নাই। ভগ্নি! তুমি হয়ত বুঝতে পাচ্ছ, কতটা ঢলাঢলি হবার সম্ভাবনা। মনে কর, মাসীমা যেখানে আছেন, সেখানকার কোন্ লোক—যারা পাদরী ল্যাম্বার্টের মরা খবর শুনেছে, তাদের মধ্যে কোন লোক যদি লণ্ডনে আসে, লণ্ডনের সহরতলী যদি দেখেশুনে বেড়ায়, সেই সময় যদি পথে কিম্বা দোকানে, গির্জ্জাতে কিম্বা কোন লোকের বাড়ীতে পিতাকে দেখ্‌তে পায়, তা হলে কি একটা

ভয়ানক কাণ্ড হবে। সে লোকটাই বা কি মনে করবে! দেখা শুনা যদি নাও হয়, সেই রকম লোক লণ্ডনের লোকের মুখে যদি শুনে, গ্রাম্য-যাজক রেভারেণ্ড ল্যাম্বার্ট বেঁচে আছেন, তা হলেই বা তার মনে কি রকম ভাবের উদয় হবে,—না অলিভিয়া,—না,—আমি আর এ দেশে থাকব না। যে সব কথা তোমাকে বল্লেম, সব যেন মনে থাকে, খুব সাবধানে থেকো, ভাল লোকের আশ্রয়ে খুব গোপনে বাস করো; একাকিনী রাস্তায় বাহির হইও না, কোন বিশ্বাসী লোকের সহিত যদি বাহির হওয়া আবশ্যক হয়, তখনও মুখে যেন অবগুণ্ঠন থাকে। আমার সঙ্গে শীঘ্র আর তোমার দেখা হবে না।

আমার বুকের ভিতর কে যেন তখন বরফ ঢেলে দিলে; কম্পজ্বরে মানুষ যেমন কাঁপে, আমার সেই রকম ভীষণ কম্প এল। শীতের উপর শীত,—নিদারুণ শীত,—ছল ছল চক্ষে দাদার মুখপানে চেয়ে, কাঁপতে কাঁপতে কম্পিতকণ্ঠে আমি জিজ্ঞাসা কল্লেম, আমাকে ফেলে তুমি যাবে কোথা?

সিরিল উত্তর কোল্লেন, আমি লণ্ডনে যাব। সেখানে আমার একজন আলাপী লোক আছেন, সম্ভ্রান্ত সওদাগর, ব্যবহারে খুব ভাল লোক, অমায়িক স্বভাব। আমি যখন কারবারের চেষ্টায় কয়েকবার লণ্ডনে গিয়েছিলেম, সেই সময় তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি আমাকে যেন বহু দিনের পরিচিত বন্ধুর ন্যায় সমাদর করেছিলেন; যাতে আমার ভাল হয়, স্বতঃ পরতঃ সেইরূপ চেষ্টা পাবেন, স্বীকার করে রেখেছেন, তাঁরি কাছে আমি যাব। যদি চাকরী কত্তে হয়, বেতন যদি অল্প হয়, তাও স্বীকার কর্‌ব। তুমি যেখানে আশ্রয় পাবে, সেখানকার

ঠিকানা দিয়ে লণ্ডনে সেই সওদাগরের কুঠীতে আমার নামে পত্র লিখ। সওদাগরের নাম হেন্‌রী-রবিন্‌সন্‌; সহরে তিনি বিখ্যাত লোক, তাঁর কুঠীর ঠিকানায় পত্র লিখিলে কোন গোল-মাল হবে না। নামটি কিন্তু ভুল না, সর্ব্বক্ষণ মনে করে রেখ; না হয় ত কাগজ কলম আন, আমি লিখে রেখে যাচ্ছি। আর দেখ, যেখানে তুমি আশ্রয় পাবে, সেখানে যদি তোমার সত্য পরিচয় কাহারও জানা না থাকে, তবে তাদের কাছে আমাদের কলঙ্কী পিতার নাম বলে পরিচয় দিও না।

মর্ম্মে আঘাত পেয়ে, আবার আমি কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কল্লেম, মাতা পিতার কি হবে? কে তাঁদের দেখবে? মা অচলা, আমরা কাছে না থাকলে, কে তাঁর সেবা কর্‌বে?

তাচ্ছিল্যভাবে মুখ বেঁকিয়ে সিরিল উত্তর কল্লেন, যে কাজ তাঁরা করেছেন, সেই কাজ তাঁদের সেবা করবে। তোমার আমার মুখ পানে যদি তাঁরা চাইতেন, আমাদের উপর যদি তাঁদের সত্য সত্য স্নেহমমতা থাকৃত, তা' হলে তেমন কাজ তাঁরা কখনই কত্তে পারতেন না। পাকে প্রকারে তাঁরা আমাদের মায়া কাটিয়েছেন, আমাদের দুটীকে এখন একেবারে অকুল পাথারে ভাসিয়েছেন, এখন আর তাঁদের ভাবনা ভেবে আমরা কি কর্ব্বো? আমরা তাঁদের সেবা করবার জন্য এই পাপপুরীতে থাকতে পারব না। তোমাকে যা যা আমি বল্লেম, পুনঃপুন অনুরোধ করি, ধর্ম্মের দোহাই, সে সব কথার অব-হেলা কোর না। এখন আমি বিদায় হই। এই কথা বলে, সজল নয়নে আমার হস্ত চুম্বন করে, তাড়াতাড়ি তিনি বেরিয়ে

যাচ্ছিলেন, লণ্ডনের সওদাগরের নাম লেখার কথা ভুলে যাচ্ছি-লেন, আমি তাঁর হাত ধরে বসালেম, কথাটা মনে করে দিয়ে একখানি কাগজ, একটি কলম, আর একটি দোয়াত তাঁর সম্মুখে রেখে দিলেম।

চঞ্চল হস্তে নামটি লিখে দিয়ে, তৎক্ষণাৎ দরজা খুলে, দাদা আমার চঞ্চলপদে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন;—অতি দ্রুত প্রস্থান;—দেখলেম যেন ছুটে পালালেন,—চৌকাটের বাহিরেই আমি দাঁড়িয়ে ছিলেম, দেখলে পাছে মায়া হয়, সেই সন্দেহে একটিবার আমার দিকে আর ফিরেও চাইলেন না। দেখতে দেখতে তিনি আমার চোখের অগোচর হয়ে গেলেন। আমি তখন চক্ষের জলে ভেসে, ঘরের ভিতর গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেম; চোখের জলে ঝাপ্‌সা আস্‌ছিল, তথাপি আলোর কাছে গিয়ে সেই নাম লেখা কাগজখানি বার বার দেখলেম, স্কুলে যে রকমে পাঠ অভ্যাস কত্তেম, ব্যাকরণের সূত্রগুলি যে রকমে মুখস্থ কত্তেম, সেই রকমে সেই সওদাগরের নামটি মুখস্থ কর্‌বার চেষ্টা কল্লেম; বার বার বল্‌তে লাগলেম, হেনরি-রবিনসন্, লণ্ডন— হেনরি-রবিনসন্, লণ্ডন— হেনরি-রবিনসন্, লণ্ডন।

নামটি মুখস্থ করে, কাগজখানি তুলে রেখে, আলোটি নিবিয়ে, আমি বিছানায় গিয়ে শয়ন কল্লেম। কেনই বা শয়ন— তত যন্ত্রণার সময় নিদ্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার আশা ছিল না, তথাপি শয়ন। কত প্রকার চিন্তা-তরঙ্গ আমার অন্তর-সাগর তোলপাড় করেছিল, সে সব কথা এখন আমি স্মরণ করে বল্‌তে পারি না। চক্ষের জলে বালিশ বিছানা ভিজে গিয়েছিল।

শেষ রাত্রে বোধ হয় একটু নিদ্রা এসেছিল; যখন উঠলেম, বেলা তখন সাতটা।

সে দিন প্রভাতে আমার প্রথম কার্য্য সিরিলের অন্বেষণ। ঘরে ঘরে তত্ত্ব কল্লেম, দেখতে পেলেম না; মাতাকে জিজ্ঞাসা কল্লেম, তিনি কোন উত্তর দিতে পারলেন না, লুসিয়াকে জিজ্ঞাসা কল্লেম, সে বল্লে, ভোর থেকে তাকে দেখে নাই। পিতাকে জিজ্ঞাসা কত্তে আমার সাহস হল না। আপনার ঘরে ফিরে গিয়ে আমি ভাবিতে বস্‌লেম। ভেবে ভেবে আর কিছুই স্থির কত্তে পারলেম না, কেবল এই টুকু স্থির কল্লেম, অদৃষ্ট,—দাদা আমার গত রাত্রে যা বলেছিলেন, তাই করেছেন। রাতা-রাতি দাদা আমার বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছেন। তত আদ-রের দাদা আমার, আমায় ফেলে পালালেন; সেই দুঃখে আমি ব্যাকুলা।

অষ্টম তরঙ্গ।

অদৃষ্টের ফল।

দিনমান প্রায় কেটে গেল, সূর্য্যাস্তের বেশী বিলম্ব ছিল না। সেই সময় আমার ইচ্ছা হল, বাহিরে একটু বেড়িয়ে আসি, কয়েদির মতন একজায়গায় বসে বসে মন ক্রমশঃ খারাপ হচ্ছে, বাহিরের হাওয়া গায়ে লাগলে, স্বভাবের পাঁচ রকম খেলা দেখলে, হয়ত একটু সুস্থ হতে পারব; তাই ভেবে বেড়াতে যাওয়াই স্থির কল্লেম, পূর্ব্বদিন আমার টুপিটি আর শালখানি পিতার ঘরে ফেলে এসেছিলেম, আনিবার জন্য পিতার ঘরে প্রবেশ কল্লেম; দেখলেম, মাতাপিতা উভয়ে পাশাপাশি হয়ে বসে চুপি চুপি যেন কি পরামর্শ কচ্ছেন, উভয়েরই মুখ বিশুষ্ক, চক্ষু যেন বিষাদমাখা, ওষ্ঠ যেন ঘন ঘন বিকম্পিত। আমাকে দেখে তাঁদের সেই দুখানি শুষ্ক বদন সহসা কেমন এক রকম রক্তরাগে রঞ্জিত হল, বোধ হল যেন, ঘৃণা আর ক্রোধ এক সঙ্গে সেই মুখের উপর প্রবলপ্রতাপে প্রভুত্ব করচে।

প্রথমে আমি সে ভাবের ভাব কিছু ঠাওরাতে পারিনি; এদিক ওদিক চেয়ে দেখছি, হঠাৎ দেখলেম, পিতার চেয়ারের উপর বামদিকে একখানা কাগজ,—খানিকটা মোড়া, খানিকটা খোলা। যেটুকু খোলা, তাতে কয়েক ছত্র লেখা। অধিক দূরে আমি ছিলেম না, এক মনে দু একছত্র পাঠ কল্লেম,

ভঙ্গিতে দেখালেম যেন সে দিকে আদৌ আমার দৃষ্টি নাই,—কিছুই যেন দেখছি না। বাস্তবিক আমি দেখেছিলেম; দেখেই বুঝেছিলেম; সেই জন্যই তাঁদের রাগ, সেই জন্যই আমার উপর ঘৃণা, সেই জন্যই মুখ ভার ভার।

যে কাগজখানা আমি দেখলেম, সে খানা সেই কাগজ;—মাসীমার পত্র। দাদা বলেছিলেন, পত্রখানা কর্ত্তার ঘরে ফেলে রাখবেন; আমি বারণ করেছিলেম, তিনি তাতে কোন উত্তর দেন নাই; যা বলেছিলেন, তাই করে গিয়েছেন। ঘটনা চক্রে দাদা আর আমি, দুজনেই মাতাপিতার কাছে বিশ্বাসঘাতক হয়েছি।

পিতা কি মাতা কেহই আমাকে একটি কথাও জিজ্ঞাসা কল্লেন না। ভাবগতিক দেখে শাল টুপি নিয়ে, আস্তে আস্তে আমি বেরিয়ে এলেম; বেড়াতে বেরুলেম।

যারা অদৃষ্ট মানে না, তারা বরং এক রকমে প্রবোধ পায়; এক রকমে তারা সুখী; ঠিক হ'ক না হ'ক ভাগ্যের সঙ্গে তাদের যুদ্ধ কত্তে হয় না। আমি কিন্তু সে দলের নই; অদৃষ্টের উপর আমার অটল বিশ্বাস; অদৃষ্টে যা আছে, অবশ্যই তাই ফল্‌বে, কেহই খণ্ডাতে পারবে না, এই বিশ্বাসটি আমার মনের মূল মন্ত্র।

আমি বেড়াতে বেরুলেম। সেই এক দিন—যে দিন ময়দানের পথে পামরের সঙ্গে আর হোরেসের সঙ্গে যে পথে দেখা হয়েছিল; সে পথে না গিয়ে অন্য পথ ধরলেম, কত কি ভাবছি, মনের ভিতর কত কি তোলাপাড়া করছি, আশে পাশে যেন কত রকম বিভীষিকা দেখছি; ভাবচি আর

চলছি। খানিক দূর গিয়েছি, অকস্মাৎ এক অভাবনীয় দৃশ্য! যে পথটা ধরেছিলেম, সে পথেরও একদিকে জঙ্গল, অন্য দিকটা খোলা। জঙ্গলের ধার ঘেঁসেই আমি চলে যাচ্চি; একটু একটু গা ঢাকা হয়েই চলেছি; কোন চেনা লোকের চক্ষে না পড়ি, সেইটাই আমার মতলব। কিন্তু সর্ব্বত্রই অদৃষ্ট প্রবল। পথের যে দিকটা খোলা, সেই দিক্ দিয়ে তিনটি লোক হন্ হন্ করে চলে আস্‌ছেল; যখন তারা দূরে ছিল, তখনং আমি তাদের একজনকেও চিন্তে পারিনি, তথাপি একটা গাছের আড়ালে গিয়ে লুকালেম। যখন সেই ত্রিমূর্ত্তি একটু নিকটে এল, তখন অকস্মাৎ আমার গা কেঁপে উঠল। তাদের মধ্যে এক জন সেই হোরেস রকিংহাম।

তারা একটু তফাতে দাঁড়াল, তিন জনে কি পরামর্শ কল্লে, দুজন অন্যদিকে চলে গেল, হোরেস একলা থাক্‌ল।

আমি যে গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিলেম, হোরেস সেটা দেখ্‌তে পেয়েছিল কি না, ঠিক বল্‌তে পারি না, বোধ হয় পেয়েছিল; কেন না, যেখানে দাঁড়িয়ে পরামর্শ কল্লে, অতি অল্পক্ষণ সেইখানে দাঁড়িয়ে বনপথের দিকে চেয়ে থাকল। সঙ্গীরা চলে যাবার পর আস্তে আস্তে সেই জঙ্গলের দিকে আসতে লাগল। যেখানে আমি লুকিয়েছি, সেখান থেকে আন্দাজ আট দশ হাত দূরে একবার থমকে দাঁড়িয়ে, আপন মনে সে একটা গীত গাইল; ভাবে বুঝলেম, আমাকেই যেন লক্ষ্য। পূর্ব্ব কথা স্মরণ করে আমি ভয় পেলেম।

একবার আমার ইচ্ছা হয়েছিল, বনের ভিতর দিয়ে অন্য দিকে পালিয়ে যাই; কিন্তু সাহস কত্তে পারলেম না। সন্ধ্যা

যদি হোরেস আমাকে দেখে থাকে, তাহলে আমার পালাবার সময় অবশুই পাছু নেবে, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আমি বেশী দৌড়াতে পারব না, অল্প দূর যেতে না যেতেই সে আমাকে ধরে ফেলবে। পালাবার চেষ্টা কল্লেম না, সেই এক জায়গায় চুপ করে লুকিয়ে থাকলেম। বৃক্ষটা প্রকাণ্ড, বৃক্ষ আমাকে বেশ ঢাকা দিয়ে রেখেছিল। হোরেস সেই বৃক্ষের অপর দিকে এসে দাঁড়াল। এক বেষ্টনে একটু এগিয়ে এলেই আমাকে দেখতে পাবে, সেই ভয়ে আমার প্রাণ আকুল।

সিরিল আমাকে অসহায়িনী করে সরে গিয়েছেন, মাতা-পিতা আমার উপর চটে রয়েছেন, সে অবস্থায় বনের ভিতর হোরেস যদি আমাকে ধরে, তাহলে ত রক্ষা পাবার উপায় থাকবে না। কেন আমি শেষ বেলায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেম, তাই ভেবে আপনাকে আপনি তিরস্কার কল্লেম। একটু পরেই সন্ধ্যা হবে, তখন আর আমি হোরেসের হাত ছাড়িয়ে হয় ত ছুটে পালাতে পার্ব না। পরমেশ্বর কি কল্লেন! পিশাচের হাতে আমি আট্‌কা পড়লেম! না জানি, অদৃষ্টে কি আছে!

ভাবছি, আপনার বুদ্ধিকে ধিক্কার দিচ্ছি, ঈশ্বরকে ধ্যান কর্‌বার অভিপ্রায়ে বুকের কাছে হাত দুখানি জোড় করে চক্ষু দুটি মুদিত কল্লেম। প্রায় ৫ মিনিট পরে আন্দাজ দুই হস্ত দূরে খস্‌খস করে শুষ্ক পত্রের ঘর্ষণ শব্দ হল, চেয়ে দেখি, আমার সম্মুখে হোরেস।

আমার সর্ব্বশরীর একবার একটু কাঁপ্‌ল, সে ভাবটা তখনই সামলে নিলেম, সাহসে ভর করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে

থাক্‌লেম। ইষ্টসিদ্ধির আনন্দে, জয়লাভের অভিলাষে, অট্ট অট্ট হেঁসে, হোরেস বল্‌তে লাগ্‌ল, রোজ! অনেক দিনের পর আবার তোমাকে আমি পেয়েছি, আজ আমার বড়ই সৌভাগ্য; বিবেচনা কর্ব্বে বলেছিলে, অনেক দিন সময় পেয়েছ, মীমাংসাটা স্থির হয়েছে কি?

যেখানে আমি দাঁড়িয়ে ছিলেম, সেখান থেকে এক পা'ও নড়লেম না, মুখেও কোন প্রকার বিকৃতি দেখালেম না, অটলভাবে উত্তর কর্‌লেম, মীমাংসা স্থির করাই আছে।

হোরেস। কিরূপ?

আমি। তোমাকে বিবাহ কত্তে আমার—

হোরেস। সে কথা ছাড়, পূর্ব্বে আমি যে কথা বলেছিলেম, সেই নিয়মে রাজি হতে তুমি চাও কি না?

আমি। পূর্ব্বেই ত বলেছি, উপবাসে যদি প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হয়, তাতেই আমি রাজি, কিন্তু তোমার কথামত কলঙ্কের পথে দাঁড়াতে আমি রাজি নই।

হোরেস। প্রাণ বিসর্জ্জন! সেটা ত মুখের কথা; সে কথার উপর আমি বিশ্বাস রাখতে পারি না।

আমি। যদি না পার, তবে আমাকে বিবাহ কর।

হোরেস। আবার সেই কথা, বিবাহটা আমি গ্রাহ্যই করি না। তোমাতে আমাতে বিবাহ হতে পারে না। মিনতি করি, পায়ে ধরি, তুমি আমার প্রেমেশ্বরী হও, আমার মনবাসনা পূর্ণ কর।

আমি। তোমাকে আমি বেশী কথা কি বল্‌ব, দয়া কর, ঐরূপ পাপ-কথা উচ্চারণ করে আমার পবিত্র কুমারি-কর্ণ অপবিত্র কর না।

হোরেস। এখনও তোমার এত তেজ! এখনও তুমি পবিত্র কর্ণ ধারণ কর!—দরিদ্রতার চরমসীমায় দাঁড়িয়েছ, পিতামাতা তোমাকে প্রতিপালন কত্তে অক্ষম; তোমার মতন দরিদ্র কন্যাকে অন্য লোকে বিবাহ কত্তে চাইবে না। বুদ্ধি স্থির করে এই সব কথা ভেবে দেখ; আমার কথায় রাজি হও; আমি তোমাকে পরম সুখে রাখব, তোমার পিতার সমস্ত দেনা শোধ করে দিব, মাসে মাসে তাঁদের উপযুক্ত মাস-হারা বরাদ্দ করে দিব; আর তোমার সেই ভাই—কি নাম তার,—হাঁ,—সিরি—সিরি—তোমার সেই ভাই একটা কারবারের জন্য কত জায়গায় ঘুরেছে, কিছুই যোগাড় কত্তে পারিনি; আমি অঙ্গীকার কচ্ছি, কারবারের জন্য সে এখন যত টাকা পুঁজি চায়, সব আমি দিব, ভাল রকম অংশী সুপারিশ করে দিব; তুমি আমার হও। তোমাকে প্রেম-রাজ্যের ঈশ্বরী করে আমি তোমার গোলাম হয়ে থাকব।

মস্তক অবনত করে আমি তখন নীরব হয়ে থাকলেম, মনে কেমন বিজাতীয় ঘৃণার উদয় হল। শৈশবাবধি ধর্ম্মের পূজা করে আসছি, প্রলোভনের দাসী হয়ে সেই ধর্ম্মকে এখন জলাঞ্জলি দিতে হবে, পাপের সাগরে ডুব দিতে হবে, জীবনান্তে নরকবাসের যোগাড় কত্তে হবে, সেই সব কথা মনে করে খানিকক্ষণ আমি চুপ করে থাকলেম। হোরেস আমার মনের ভাব বুঝতে পাল্লে না; সে মনে কল্লে, তার কথায় আমি রাজি হয়েছি। অনেকেই মনে করে, মৌন থাকলেই সম্মতি বুঝায়। হোরেসও তাই মনে করে বাহুযুগলে আমাকে গাঢ় আলিঙ্গন কল্লে, বারম্বার উষ্ণ চুম্বনে আমার কপোল, ওষ্ঠ, নেত্র ও ললাট

কলঙ্কিত করে দিল। লজ্জায় ঘৃণায় আমি উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লেম, জোর করে তার আলিঙ্গন ছাড়িয়ে, বনপথের দিকে খানিক দূর ছুটে গেলেম ; হোরেসও আমার সঙ্গে সঙ্গে ছুট্‌ল।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, হোরেসের উপদ্রবে সেটা আমি জান্‌তে পারি নাই ; বনপথে অন্ধকারে বেশী দূর ছুটে যাওয়া আমার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠল। চাঁদ উঠে ছিল, কিন্তু সন্ধ্যাকালের চাঁদে প্রথম প্রথম বড় একটা পরিষ্কার আলো হয় না, ঠাঁই ঠাঁই অন্ধকারের ছায়া ছিল, বেশী দৌড়িতে পাল্লেম না, হোরেস আমাকে ধরে ফেল্লে। আদর কর্‌বার ছলে আবার সেই রকম লাঞ্ছনা কল্লে। আবার আমি তার হাত ছাড়িয়ে যত টুকু ক্ষমতা, তত টুকু দ্রুতবেগে বাড়ীর দিকে চল্লেম ; সঙ্গে সঙ্গে না গিয়ে হোরেস আমাকে তার কাছে ফিরে আস্‌তে বল্লে ; একটি কথা ছাড়া বেশী কথা বল্‌ব না, গাত্র স্পর্শ কর্‌ব না, এই রকম অঙ্গীকার করে, পরমেশ্বরের নামে শপথ কল্লে। আমি অনেক বিবেচনা কল্লেম, যা কত্তে হবে সেটাও মনে মনে স্থির করে রাখলেম ; হোরেস কেবল একটি মাত্র কথা বল্‌বে বল্‌ছে, শুনে আস্‌তে দোষ কি, এইরূপ বিবেচনা করে, ধীরে ধীরে হোরেসের কাছে আমি ফিরে গেলেম।

চাঁদের আলোতে আমার মুখখানি দর্শন করে, একটু নরম কথায় হোরেস বল্লে, কেন অমন করে পালাচ্ছ ? ছেলেবেলা থেকে দুজনে আমরা বন্ধু, সেই বন্ধুত্ব বজায় রাখা ভাল ; আমি তোমার শত্রু হব, সেটা ভাল নয়। যে কথা আমি বলছি তাতেই রাজি হও ; কোন কষ্ট থাকবে না, কেহই কিছু জান্‌বে না। তারপর যদি বিবাহের সুবিধা হয়, চেষ্টা করা যাবে।

আমার ঠোঁটের আগায় জবাব জুগিয়ে ছিল, মনে করে-ছিলাম, সাফ্ জবাব দিব। তুমি আমার শত্রু হও, কলঙ্কিণী হওয়া অপেক্ষা তোমার শত্রুতায় আমার উপকার হবে;—মনে করেছিলেম, এই কথাই বল্‌ব। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করে, সে কথাটা তখন ফুটালেম না, বুদ্ধি খাটিয়ে অন্যপ্রকারে বুঝিয়ে তারে আমি এই কথা বলে প্রবোধ দিলেম যে, তোমার সঙ্গে আমি তামাসা কচ্ছিলেম; তুমি আমার যে বন্ধু—সেই বন্ধুই আছ, চিরজীবন সেই রকম বন্ধুত্বই থাকবে। তবে কিনা,—কথাটা বড় শক্ত, রাজী হতে পারি কি না, কাল আমি তোমাকে নিশ্চয় করে উত্তর দিব।

আমার ঐ কথা শুনে, যেন উৎসাহ পেয়ে, মুখখানি প্রফুল্ল করে হোরেস আমার একখানি হাত ধোল্লে, সানুরাগে হাত-খানি চুম্বন কল্লে, মিষ্ট বচনে বল্লে, ঠিক কথা। তাড়াতাড়ি কোন কাজ করা ভাল নয়। আমি জানতে পেরেছি, তুমি আমাকে ভালবাস, আমি জানতে পেরেছি, স্বইচ্ছায় তুমি আমার হবে। হৃদয়ে তোমাকে স্থান দিয়ে আমি স্বর্গ-সুখের অধিকারী হব। এই কথা বলে সে আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে, মুখের কাছে মুখ আন্‌বার উপক্রম কল্লে; মুখখানি সরিয়ে নিয়ে, আধো আধো স্বরে মিনতি বচনে তারে আমি বল্লেম, আজ আমাকে ছেড়ে দাও, কাল আমি তোমাকে আমার মনের কথ ঠিক করে বলে যাব। আহ্লাদের সঙ্গে একটু সন্দেহ মিশিয়ে হোরেস আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লে,—কাল আমি কখন কোন্ ঠিকা-নায় তোমার দেখা পাব?

এদিক, ওদিক, চারিদিক চেয়ে চেয়ে মৃদুস্বরে আমি উত্তর

কল্লেম, যে দিন তুমি কুকুর সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়ে ছিলে, সেই দিন যেখানে আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেখান থেকে আট দশ হাত দূরে একটা লতাকুঞ্জ আছে, তা হয়ত তুমি জান, তা হয়ত তুমি দেখেছ, কাল রাত্রি নয়টার সময় সেই লতা-কুঞ্জের ভিতর আমি থাকৃব, সেইখানে গেলেই তুমি আমাকে দেখতে পাবে।

হোরেস জিজ্ঞাসা কল্লে, রাত্রিকালে একাকিনী সেখানে তুমি কেমন করে যাবে?

আমি উত্তর কল্লেম, বেশ পারব। জোৎস্না রাত্রি, ভয় কি! ঠিক আমি যাব; আমার কথার কদাচ অন্যথা হবে না,—ঠিক আমি যাব।

আহ্লাদ প্রকাশ করে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে অল্প উচ্চকণ্ঠে হোরেস বল্লে, দেখ—মনে রেখ, ঠিক রাত্রি নটা। সে সময় সেখানে যদি আমি তোমার দেখা না পাই, তা হলে ঠিক জেনে রেখ, আমি তোমার পরম শত্রু হয়ে থাকব। এখন চল, আমি তোমাকে খানিক দূর এগিয়ে দিয়ে আসি।

আমার ইচ্ছা ছিল না, হোরেসকে সঙ্গে লওয়া, কিন্তু তার আগ্রহ দেখে আমি চুপ করে থাকলেম। হোরেস আমার হাত ধরে ছিল, হাতখানি ছেড়ে দিল না, হাত ধরেই আমাকে আমাদের বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত রেখে এল। যাবার সময় চুপি চুপি বলে গেল, মনে রেখ, রাত্রি ঠিক নটা।

হোরেস চলে গেল। আমি তার দিকে চেয়ে চেয়ে প্রায় ৫ মিনিট সেই দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থাক্‌লেম; তার পর বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করে সুরাসর পিতার ঘরেই উপস্থিত

হলেম। পিতা তখন ঘরে ছিলেন না, মাতা একাকিনী। অগ্নি-সমীপে ইজি চেয়ারে বসে তিনি তখন একখানি পুস্তক পাঠ কচ্ছিলেন, আমাকে দেখে, পুস্তকখানি মুড়ে রেখে, গম্ভীর হয়ে বস্‌লেন; মুখে যেন ভয়ঙ্কর বিরাগ লক্ষণ দেখা গেল।

আমি বসলেম না, মাতার চেয়ারের তিন হাত তফাতে চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকলেম। দাঁড়িয়ে আছি, মুখে কথা নাই; যার কাছে আছি, তিনিও নির্ব্বাক্। প্রায় দশ মিনিট পরে মা হঠাৎ উগ্রস্বরে আমাকে বল্লেন, তোরা ভেবেছিস্ কি? ভাই বোন্ দুজনেই এক যোগ। ডাকে একখানা চিঠি এসেছিল, চিঠির ভিতর একখানা নোট ছিল; আমার ভগ্নীর দস্তখত করা চিঠি। কেন যে চিঠি লিখে ছিল,—কেন যে সে টাকা পাঠিয়েছিল, কেন যে সে চিঠিতে নানা রকম মিথ্যা কথা লিখেছিল, কিছুই আমি জানি না। ভাবে বুঝা যায়, একখানা চিঠির জবাব। কার চিঠির জবাব, তাই ভেবে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়েচে। আমি তাকে চিঠিও লিখি নাই, টাকাও ভিক্ষা করি নাই, কিছুই করি নাই। বোধ হয়, আমাদের শত্রু পক্ষের কোন লোক আমার নামটা জাল করে সেই সব মিথ্যা কথা লিখে পাঠিয়ে থাকবে। ধর্ম্ম প্রমাণ বল্‌ছি, সে চিঠির কিছুই আমি জানি না। যাই হউক, কর্ত্তা সেই চিঠিখানা পড়েন নাই। কোথায় ফেলে রেখেছিলেন, তাও তাঁর মনে ছিল না, আমি ত বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানতেম না, চিঠি এসেছে, তা পর্য্যন্ত শুনি নাই, কর্ত্তা কিন্তু কাল সন্ধ্যার পর সেই চিঠিখানা খুঁজে ছিলেন, পান নাই। রাত্রি যখন অনেক, সেই সময় সিরিল এসে আমার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে, চুপি চুপি বেরিয়ে

গিয়েছিল। কর্ত্তা তখন ঘরে ছিলেন না। চিঠিখানা আমি পাঠ করি। মহা বিস্ময়ে আমার সর্ব্বশরীর শিউরে উঠেছিল। কর্ত্তা যখন ঘরে এলেন, তখন আমি চিঠিখানা তাঁকে দেখালেম, তিনিও পাঠ কল্লেন। কোথায় পাওয়া গেল, সেই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করাতে আমি সত্য কথা বলেছিলেম। সত্য কথা শুনে কর্ত্তা ভারী রেগে উঠেছিলেন। সিরিল সে চিঠি কোথায় পেয়েছিল, রেগে রেগে বার বার সেই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি ত কিছুই বোলতে পারলেম না, কর্ত্তা শেষকালে নিজেই মনে মনে ধারণা কোরে, স্থির কোরেছেন, সিরিল আমাদের ঘর থেকে চিঠিখানা চুরি করেছিল, আগাগোড়া পাঠ করেছিল, তোকেও দেখিয়েছিল, তুইও হয়ত পড়ে দেখেছিলি। পাজি মেয়ে—নচ্ছার মেয়ে—বিশ্বাসঘাতিনী তোদের এই কাজ? শত্রু ত আমাদের অনেক, পেটের ছেলে তোরা,—তোরাও আমাদের শত্রু হয়েছিস? ঘরের শত্রু বড় বালাই! দুইজনেই এক যোগ? কর্ত্তা বলেছেন, তিনি আর তোদের মুখ দেখ্‌তে চান না। সিরিল হয়ত আগে ভাগেই পালিয়ে গিয়েছে, সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও বাড়ী আসে নাই। পালিয়েছে, বেশ হয়েছে। তেমন ছেলে না থাকাই ভাল। তুইও যা—তোর দাদা যে পথে গিয়েছে, তুইও সেই পথে চলে যা—দূর হ! মাবাপের গুহ্য কথা নিয়ে আমোদ করে, কলঙ্কের কথা নিয়ে ঘরের ভিতর হাসিখুসি করে, আসল কথা না জেনেও অপর লোকের কাছে মা-বাপের নূতন কলঙ্কের কথাও হয়ত রটনা করে। এমন সংসারের কি কখনও মঙ্গল হয়! দূর হ!

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমি গালাগাল খাচ্ছি, এমন সময় বাবা এলেন; তিনিও আমাকে যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা কল্লেন। কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে আমি বেরিয়ে এলেম; নিজের ঘরে গিয়ে আরও বেশী কাঁদলেম। এ রকম ফল হবে, আগেই আমি তা বুঝেছিলেম; হোরেসের সঙ্গে যতক্ষণ পথে চলেছি, ততক্ষণ ভেবেছি, কোথায় যাচ্ছি। মা বাপের কাছে আর আশ্রয় পাব না, আজ রাত্রেই হয় ত তাঁরা আমাকে তাড়িয়ে দিবেন। যা ভেবে গিয়েছিলেম ঠিক তাই মিল্লো; মা বাবা দুজনেই আমাকে তাড়িয়ে দিলেন। দাদা পালিয়েছেন, আমিও চলে যাব। সেই সময় মনে কল্লেম, হোরেসকে আশ্বাস দিয়ে আসা সত্য সত্যই সুবুদ্ধির কাজ হয়েছে; হোরেসের কাছেই আমি থাকব। অদৃষ্ট!—রাজার অট্টালিকায়, দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, ভিখারীর বৃক্ষতলে, উদাসীন সন্ন্যাসীর পর্ব্বতগহ্বরে, সর্ব্বত্রই সমভাবে অদৃষ্টের অখণ্ড আধিপত্য। হায় হায়! আমার অদৃষ্টে এই ছিল! ধর্ম্মযাজকের কন্যা হয়ে চিরজীবন কলঙ্কিনী হয়ে থাকতে হবে? নবযৌবনেই মহা কলঙ্কের এই প্রথম সূত্রপাত।

ভেবে আর কি হবে, যা আছে কপালে, তাই ফলবে। অদৃষ্টের ফল খণ্ডন হবার নয়, সে ফল আমাকে ভুগতেই হবে। বুঝলেম তাই; কিন্তু ভাবনা ত্যাগ কোত্তে পারলেম না,—ভাবনাকে সহচরী কোরে, পরিচিত বিছানায় গিয়ে শয়ন কল্লেম। বিছানাকে বল্লেম, অনেক দিনের আদরের বিছানা তুমি, কাল আমি তোমাকে জন্মের মতন পরিত্যাগ কোরে যাব। অনবরত চক্ষের জলে আমার সেই বিছানাটিকে মর্ম্মান্তিক যাতনায় অভিষেক কল্লেম।

নিদ্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার কথা নয়, তথাপি মধ্যরাত্রে একটু নিদ্রা হয়েছিল। যখন জাগলেম, রাত্রি তখন ভোর;— ভোরে প্রস্থান করাই সুপরামর্শ।

সজলনয়নে আবার বিছানার কাছে বিদায় নিলেম, ঘরের কাছে বিদায় নিলেম, বাড়ীর কাছে বিদায় নিলেম, পিতামাতার কাছে বিদায় নিতে পাল্লেম না, উদ্দেশে পরমেশ্বরকে প্রণাম করে, করপুটে প্রার্থনা কল্লেম, সর্ব্বেশ্বর! অপরাধ ক্ষমা কর; তুমি সর্ব্বান্তর্য্যামী, সকলই তুমি জানতে পারছো! আমি ইচ্ছা করে আরাধ্য পিতামাতাকে পরিত্যাগ কল্লেম না, তাঁরা আমাকে তাড়িয়ে দিলেন। আমার কোন অপরাধ নাই।

জিনিস পত্র আমার বেশী ছিল না। যা কিছু ছিল, তাও সঙ্গে নিলেম না, কেবল তিনখানি দরকারী চিঠি আর একটি আংটী আমার সঙ্গে থাকৃল।

বাড়িখানিকে নমস্কার করে, সেই শেষরাত্রে সদর দরজা খুলে আমি রাস্তায় বেরুলেম। চতুর্দ্দিকে ধোঁয়াকার, ভয়ানক কোয়াসা, নিবিড় অন্ধকার। আমাদের দেশে প্রায় বার মাস কোয়াসা হয়, প্রায় বার মাস বরফ পড়ে। আমি সেই কোয়াসার ভিতর দিয়ে হেঁট হয়ে চল্‌তে লাগলেম। কোয়াসার জল যেন বর্ষাকালের বৃষ্টির জল, সেই জলে আমার গাত্রবস্ত্র, মাথার টুপি, সমস্তই ভিজে গেল, মাথার চুল থেকে টস টস্ করে জল পড়তে লাগ্‌ল।

যাচ্ছি, কোন দিকে যাচ্ছি, ঠিক নাই; অন্ধকারে কোনও দিকে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। প্রায় এক মাইল অতিক্রম করে, এক জায়গায় একটু বস্‌লেম; তখন রাত্রি প্রভাত হয়েছিল, কোয়াসা

ঘুচে নাই, কিন্তু একটু একটু ফর্শা হয়েছিল। বসে বসে ভাবতে লাগলেম, যাই কোথা ?—রাত্রি নয়টার সময় হোরেসের সঙ্গে দেখা হবার কথা, দিনমানটি কোথায় থাকি ? ভাবতে ভাবতে মনে হলো, যেখানে এসে পৌঁছেছি, সেখান থেকে আর খানিক দূর গেলে একটি পল্লী পাব, সেই পল্লীতে আমার একটি বাল্যকালের সখি থাকে, সেটি আমার সমবয়স্কা এক স্কুলে পড়েছি। সখির নাম সিসিলিয়া, স্বভাব খুব ভাল। সঙ্কল্প কল্লেম, সিসিলিয়ার কাছেই যাব। যেমন সঙ্কল্প, তেমনই কার্য্য। অল্পক্ষণের মধ্যেই সিসিলিয়ার বাড়িতে উপস্থিত হলেম। সিসিলিয়া আমাকে তত প্রাতঃকালে তদবস্থায় দেখে, প্রথমে বিস্ময় প্রকাশ কল্লে, কিন্তু আদর অভ্যর্থনা কত্তে ত্রুটি কোল্লে না। কোয়াসার জলে আমার সমস্ত কাপড় ভিজে গিয়েছিল, সিসিলিয়া আমাকে দিব্য নূতন পোযাক পরালে, নূতন টুপি পরালে, আপনার ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে।

দুজনে আমরা অবস্থা মত অনেক কথা বলাবলি কল্লেম। হাজরে খাবার সময় হলো, একসঙ্গে হাজরে খেলেম। কেন আমি তত সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি, সিসিলিয়া সেই কথা আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লে। যে রকম উত্তর দিলে কোন রকম দোষ হতে পারেনা, আমি সেই রকম উত্তর দিলেম। সিসিলিয়া পিতৃহীনা, তার জননী তাকে পরম যত্নে প্রতিপালন করেছেন, সম্ভবমত বিদ্যাশিক্ষা দিয়েছেন, একজন যুবা পুরুষ সিসিলিয়াকে বিবাহ কর্‌বার অভিলাষে রোজ রোজ উমেদারি কচ্চে ; এই সকল আমি জান্‌তে পারলেম। সিসিলিয়ার জননী ধনবতী মহিলা, তাঁদের সংসারে সুখের অভাব

ছিল না, তিনি আমাকে আপন কন্যার মতন আদর যত্ন কল্লেন।

মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সিসিলিয়াতে আমাতে একটি নিভৃত কক্ষে গিয়ে বসলেম, কোন কার্য্যের অনুরোধে সেদিন আমি রাজধানীতে যাব, এখন আর বাড়িতে ফিরে যাব না, এই যাত্রাতেই শুভযাত্রা; শুভ কি অশুভ, ঈশ্বর জানেন; সখিকে বোল্লেম কিন্তু শুভযাত্রা।

বেলা শেষ হয়ে এল; আমি বিদায় হবার জন্য প্রস্তুত হলেম। সিসিলিয়া আমাকে যে নূতন পোষাকটি পরিয়ে দিয়ে ছিল, সেটি আর খুলে নিতে চাইলে না, আমি আমার পুরাতন পোষাক পরিধান করে যাবার জন্য জেদ করেছিলেম, সিসিলিয়া সে কথা শুনলে না, কাযেই আমাকে নূতন পোষাকে বাহির হতে স্বীকার কত্তে হলো; পুরাতন পোষাক সেই বাড়িতেই থাক্‌লো, কেবল ভিতরের জামার পকেটে সেই তিন খানি চিঠি আর সেই আংটী ছিল, ভিজে বস্ত্র শুষ্ক হবার পর সেই গুলি আমি বাহির করে নিলেম। আমার সঙ্গে টাকা ছিল না, সেই কথা শুনে সিসিলিয়ার জননী আমাকে কিছু টাকা দিতে চেয়ে ছিলেন, ধন্যবাদ দিয়ে আমি অস্বীকার করেছিলাম, গ্রহণ করি নাই।

সন্ধ্যা হবার একটু আগে তাঁদের কাছে বিদায় নিয়ে, আমি গন্তব্য পথে যাত্রা কল্লেম। যে পথে যেখানে সেই লতাকুঞ্জ, সেইখানে পৌঁছিতে অনেকটা বিলম্ব হল, রাত্রি প্রায় আটটা বাজে বাজে, ঠিক সেই সময় আমি সেই লতাকুঞ্জের মধ্যে গিয়ে লুকালেম। কেহ কোথাও ছিল না, কেহই আমাকে দেখতে পেলে না।

ঘরেই থাকি, বাহিরেই থাকি, অথবা বন মধ্যেই থাকি, যেখানেই থাকি না কেন, কোন লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার কথা থাক্‌লে মন কেমন চঞ্চল হয়ে থাকে। কেবল আমার নয়, সকলেরই ঐ রকম হয়। ক্ষণে ক্ষণে আমি হোরেসের আগমন প্রতীক্ষা কত্তে লাগলেম। সেই লতা কুঞ্জের অদূরে ময়দানের ধারে একটি গ্রাম্য ভজনালয়; সেই গিরজার ঘড়িতে ঢং ঢং করে আট্‌টা বাজ্‌ল, এক দুই তিন কোরে শব্দগুলি আমি গণনা কল্লেম, উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হলো ;—আরও এক ঘণ্টা বিলম্ব। বনপথে লোকজনের গতি বিধি কম, কেবল কম কেন, আমিত দেখলেম, কতকক্ষণের মধ্যে একটি প্রাণীও সে পথে এল না। মনের ভিতর কত ভাবের উদয় হচ্ছে, কত দুঃখের তুফান উঠ্‌ছে, কত সন্দেহের আশঙ্কা আস্‌ছে, সে সব কথা আর কি বল্‌ব? হোরেসের সঙ্গে দেখা হলে, তার কাছে কি রকম মনের ভাব জানাব, কি কি কথা উত্থাপন কর্‌ব, কি রকমে ভালবাসা দেখাব, তাই আমি মনে মনে আলোচনা কচ্ছি, হোরেস আমাকে কি রকমে আদর করবে, আদর করবে কি ঘৃণা করবে, আগে অস্বীকার করেছিলাম বোলে টিট্‌কারী দিয়ে কি রকমে আমার উপর জয়লাভ কর্‌বে, সেটাও কল্পনা পথে রচনা কচ্চি এমন সময় আবার সেই গিরজার ঘড়িতে নটা বাজা শব্দ শুনা গেল।

রাত্রি নটা। এই সময় দেখা হবার কথা। আকাশে চাঁদ উঠেছে, বনপথ বেশ দেখা যাচ্ছে, সেই দিকে আমি চেয়ে আছি, হোরেস হয়ত এখনি আস্‌বে, হয়ত আসছে, হয়ত

নিকটেই এসেছে, হয়ত এখনি তাকে দেখ্‌তে পাব, মনে মনে এই রকম আশা আস্‌ছে, আশা কিন্তু বিফল।

পাঁচ মিনিট অতীত, হোরেস এল না; আরও পাঁচ মিনিট, —হোরেস এল না। আশার পরিবর্ত্তে হতাশের উদয়। আশা বিফল হলে মনে যেরূপ কষ্ট হয়, প্রায় সকলেই সেটা বুঝতে পারেন। সেই রকম কষ্ট আমি ভোগ কচ্ছি। আরও পাঁচ মিনিট অতিক্রান্ত, তখনও হোরেসের দেখা নাই। আমি আর স্থির হয়ে থাক্‌তে পারলেম না, ধীরে ধীরে কুঞ্জ থেকে বেরিয়ে, পথের এধার ওধার যতদূর দেখা গেল, ততদূর চেয়ে চেয়ে দেখ্‌তে লাগলেম, কাহাকেও দেখতে পেলেম না। নিরাশাকে সম্মুখে রেখে,—বুকের ভিতর নিরাশার ছবি এঁকে, ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে, অত্যন্ত যাতনায় আপন মনে বলে উঠলেম, তবে বুঝি আস্‌বে না! বৃথা আমাকে কষ্ট দিলে! রাগ আছে কিনা, আমি তার মনে কষ্ট দিয়েছিলেম, সেই কষ্টের প্রতি-শোধ দিলে! ভাবতে ভাবতে আবার আমি কুঞ্জমধ্যে ফিরে গেলেম।

কি করি, তখন আমার সেই ভাবনাই প্রবল। জন্মাবধি যাঁরা আমাকে প্রতিপালন করেছন, তাঁদের আমি পরিত্যাগ করে এসেছি, সেই পাপেই আমার এই অবস্থা! পাপী আমি কিসে? তাঁরা আমাকে স্থান দিলেন না, সেই দুঃখেই আমি বেরিয়ে পড়েছি, তবে আমার পাপ হবে কেন?

খস্‌ খস্‌ কোরে বৃক্ষপত্রের শব্দ আমার কর্ণে প্রবেশ কল্লে, সেই দিকে কানপেতে থেকে বার বার সেই শব্দই শুন্‌তে লাগলেম, মনে কল্লেম এইবার বুঝি হোরেস আস্‌ছে। একটু পরে সে

শব্দ আর শুনা গেল না। তখন আবার মনে কল্লেম, তবে বুঝি শব্দটা সত্য নয়, মন আমার সেই দিকে ছিল কিনা, তাতেই হয়ত জেগে জেগে স্বপ্ন দেখছিলাম, কর্ণ আমার প্রতারিত হয়েছিল, কিম্বা হয়ত বনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশুরা এই দিক দিয়ে ছুটে গিয়ে থাক্‌বে। এই রকম নানাখানা চিন্তা কর্‌ছি, নটা বাজবার পর প্রায় আধ ঘণ্টা অতীত হয়ে গিয়েছে, এমন সময় হোরেস এসে আমার সম্মুখে দাঁড়াল।

দেখে আমার আহ্লাদ হল কি আতঙ্ক এল, তা এখন ঠিক করে বল্‌তে পারছি না, মুখে কিন্তু একটিও বাক্য নির্গত হল না। কলের পুতুল যেমন স্থির হয়ে চেয়ে থাকে, ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ চক্ষে আমিও তেমনি হোরেসের মুখ পানে চেয়ে রইলেম। একটু :এগিয়ে এসে আমার একখানি হাত ধরে, প্রেম সম্ভাষণে হোরেস আমাকে মধুর স্বরে বল্লে, রোজ! প্রিয়তমে এসেছ! আমার একটু দেরি হয়ে গিয়েছে; পথে একটী বন্ধুলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, সেই খানেই আট্‌কা পড়ে ছিলেম। না জানি, আমার আশায় আশায় এই বিজন স্থানে কত কষ্টই তুমি পেয়েছ? এখন আমি এসেছি, এখন ভাই, সে সব কষ্ট তুমি ভুলে যাও। একান্ত জেন, আমি তোমারিই। এই সব কথা বল্‌তে বল্‌তে হোরেস সাদরে আমার মুখ চুম্বন কল্লে।

আমি শিউরে উঠলেম। কি কথা বল্‌ব, স্থির করতে পারলেম না। অনেক কথা ভেবে দেখেছিলেম, সে সময় কিন্তু একটি কথাও মনে এল না, কাজে কাজেই আমি চুপ্‌ করে থাকলেম।

সেই রকম মধুর স্বরে হোরেস আবার বোল্লে, রোজ! এখন তুমি এমন মৌনবতী কি জন্য? তবে কি তুমি আমার আশা পূর্ণ কর্‌তে রাজি নও? আমার মন বড় উতলা হচ্ছে, প্রিয়তমে! আর আমাকে সংসারের আগুনে দগ্ধ করো না, যা তোমার মনের কথা,—হয় এদিক, নয় ওদিক, যা হয় একটা প্রকাশ করে বলে ফেল। তুমি এসেছ, সত্য পালন করেছ, তাতেই আমার ভর্‌সা হচ্ছে, তুমি আমাকে নিরাশা সাগরে ভাসাবে না, তথাপি তোমাকে মৌনবতী দেখে, আমার হৃদয় কম্পিত হচ্ছে। জীবিতেশ্বরী! আমার মনের সংশয় দূর কর, একটি মিষ্ট কথা বলে আমার তপ্ত হৃদয় শীতল কর, না হয়ত, কঠোর বাক্যবাণ সন্ধান করে, আমার কঠিন হৃদয়কে স্তরে স্তরে বিদ্ধ কর।

আমার সর্ব্বাঙ্গ বিকম্পিত। লজ্জা আসছিল, অন্যভাব আসছিল, বংশগৌবর মনে আসছিল, সময়ের গতিকে তৎসমস্ত বিসর্জ্জন দিয়ে, অস্ফুট কণ্ঠে আমি বল্লেম, তুমি আমার বাল্য-বন্ধু, তুমি আমার মঙ্গলাভিলাষী, তুমি আমার আদরের পাত্র। তোমার মনের ভাব পরীক্ষা কর্‌বার জন্য ইতিপূর্ব্বে আমি কিছু ঔদাস্য দেখিয়ে ছিলেম, সেটা আমার মনের ভাব ছিল না। আমি তোমাকে—

আমার কথা সমাপ্ত হবার আগেই, আমার সম্মতি বুঝতে পেরে, বাহুযুগলে আমার কণ্ঠ বেষ্টন করে, হোরেস আমাকে পুনর্ব্বার চুম্বন কল্লে, আমিও সেইবার প্রতিচুম্বন করে, মুখের কথায় বিস্তর সোহাগ জানালেম, মৃদু মৃদু হাস্য কল্লেম। সে হাস্য আমার হৃদয়ের পবিত্র স্থলের হাস্য নয়, কপটতার বাহ্

ক্রীড়া, একথাটা এই সময় আপনাকে জানিয়ে রাখা ভাল বলিয়া বোধ করিতেছি।

হোরেস বল্লে, চরিতার্থ হলেম, অনেক দিনের পোষিত বাসনা আজ পূর্ণ হল, আমি যেন আত্ম বিস্মৃত হয়ে স্বর্গের রথে আরোহণ কচ্ছি। প্রাণেশ্বরি! আজ আমার পরম সৌভাগ্য, তুমি আমার সঙ্গে চল, এখানে, বনের ভিতর আর বেশীক্ষণ বিলম্ব করা হবে না, আমার গাড়ি এসেছে, এখনি আমি তোমাকে লণ্ডন সহরে নিয়ে যাব,—সহরে যে বাড়িতে তোমাকে রাখব, পূর্ব্বাহ্ণেই তা আমি ঠিক্ করেছি।

আমি আর দ্বিরুক্তি কল্লেম না, মুখখানি অবনত কোরে নিস্তব্ধ হয়ে থাক্‌লেম। হোরেস আমার হস্তধারণ করে, লতা কুঞ্জের ভিতর থেকে বেরুল। সেই সঙ্কীর্ণ পথে গাড়ি আসে না, ময়দানের ধারে বড় রাস্তায় গাড়ি ছিল, পদব্রজে সেই পর্য্যন্ত আমরা অগ্রসর হলেম, হোরেস আমাকে অগ্রে গাড়িতে তুলে দিয়ে, সগৌরবে অগ্রাসনে বসালে, তারপর একলম্ফে সে নিজে আরোহণ করে আমার দক্ষিণ পাশে বস্‌ল; গাড়ির দরজা খড়খড়ি বন্ধ হয়ে গেল, বড় বড় অশ্বেরা ঠপাঠপ্ শব্দে রাস্তা কাঁপিয়ে গাড়ি নিয়ে যেন বায়ুবেগে ছুট্‌ল।

আমরা লণ্ডনে উপনীত হলেম। আমাকে রাখবার জন্য হোরেস যে বাড়ি খানি বন্দোবস্ত করেছিল, সে বাড়ি খানি দিব্য প্রশস্ত, সুন্দর সুন্দর আস্‌বাবে সুসজ্জিত, উজ্জ্বল আলোক মালায় বিভূষিত, যে ঘরে আমরা গিয়ে বস্‌লেম, সেই ঘরের একধারে লৌহ কটাহে অগ্নি প্রজ্বলিত; ঘরখানি মনোহর সুগন্ধে সুবাসিত।

সেই ঘরে আমরা থাকলেম। মহাকষ্টের মহাসাগরে ডুবে যাচ্ছিলেম, সে বিপদে একটা কূল পেলেম, এক রকমে সুখী হলেম,—অতি সুখে সুখী নয়, উপনায়কের সঙ্গে সুখ। কথাটা স্মরণ করে মন আমার কেমন এক রকম বিচলিত হয়ে উঠ্‌ল; তখন আমি পুনর্ব্বার হোরেসকে অনুরোধ কল্লেম, তুমি আমাকে বিবাহ কর;—গরীবের মেয়েকে বিবাহ কল্লে তোমার গৌরব খর্ব্ব হবে না, বরং ধর্ম্মের কৃপায় তোমার আরও গৌরব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মহাপুণ্য সঞ্চয় হবে।

হোরেস বল্লে, পূর্ব্বেই ত সে কথা বলে রেখেছি, এখন আবার সে কথার উত্থাপন কেন কর? এক সঙ্গে থাক্‌তে থাক্‌তে কিছু দিন পরে বিবাহ করা যদি উচিত বোধ হয়, অবশ্যই আমি সে বিষয় বিবেচনা করব। এখন আমি তোমাকে দেহ সমর্পণ, মন সমর্পণ, প্রাণ সমর্পণ করেছি, তুমি আমার মনঃপ্রাণের অধীশ্বরী হয়েছ; তোমাতে আমাতে পৃথিবীর প্রেমরাজ্যে কিছুদিন পরম সুখে রাজত্ব করি, তারপর—

আর আমি তার মুখে সে সব কথা শুনতে চাইলেম না, থামিয়ে দিয়ে ব্যগ্রকণ্ঠে বল্লেম, হোরেস! যা তোমার ইচ্ছা, তাই সিদ্ধ হোক, তোমার ইচ্ছাই বলবতী থাকুক, আমি তোমার বন্ধুত্বের বশীভূতা হয়ে থাক্‌লেম।

হোরেস প্রেমানন্দে আমাকে অনেক রকম মিষ্ট কথা বলে তুষ্ট কর্‌বার চেষ্টা কোল্লে, অনেক রকম সোহাগ কল্লে; আমি তাতেই যেন তুষ্ট হয়ে ভুলে থাক্‌লেম, তাকে এইরূপ ভাব জানালেম।

আমাকে লণ্ডনের বাড়িতে রেখে, হোরেস পাঁচদিন পাঁচ

রাত্রি আমার কাছেই থাকৃল,—বোধ হল যেন আমাকে চৌকি দিবার জন্যই অষ্ট প্রহর পাহারা থাক্‌ল। দাস, দাসী, বাবুর্চ্চি, খানসামা, সাকী, দরওয়ান, সহিস, কোচমান, সমস্তই নূতন নিযুক্ত হল। যাতে আমি সুখে থাকি, যাতে আমার মন ভাল থাকে, অশেষ বিশেষে হোরেস সেই রকম চেষ্টা কল্লে। আমার দেহ কলুষিত হল, কিন্তু মনের মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় কলুষ প্রবেশ করতে পারলে না।

লণ্ডনেই আমি থাকৃলেম। আমার দাদা যে রাত্রে বাড়ি থেকে পলায়ন করেন, সেই রাত্রে আমাকে যে সকল উপদেশ দিয়েছিলেন, দুজনে যে রকম পরামর্শ হয়েছিল, সব উল্টে গেল, আমি তখন অবৈধ প্রেমে একজন ধনী সন্তানের কিঙ্করী হয়ে, নিত্য নিত্য তার মনোরঞ্জন কত্তে লাগলেম। আমার অদৃষ্টে এই ছিল! অদৃষ্টকে অতিক্রম করা পৃথিবীর মানুষের একেবারেই অসাধ্য; স্বর্গের দেবতারাও হয়ত অদৃষ্টের চক্রে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। জন্মাবধি আমি কখনও সজ্ঞানে একটাও পাপকার্য্য করি নাই, দুঃখের অবস্থায় সংসারে অনেক কষ্ট সহ্য করেছি সত্য, কিন্তু মন কখনো পাপের পথে যায় নাই, হোরেসের কুহকে, হোরেসের প্রলোভনে, ঐ আমার প্রথম পাপ। তরুণ যৌবনে ঐ পাপ আমাকে কুলঙ্কিনী কল্লে, এটা নিশ্চয়ই আমার অদৃষ্টের ফল!

নবম তরঙ্গ।

আমার বিলাস।

পাঁচদিন পরে হোরেস তাদের নিজের বাড়িতে চলে গেল। সহরের সীমার বাহিরে এক পল্লীতে সেই বাড়ি, সেকথা আমি পূর্ব্বে বলে রেখেছি। হোরেস সকাল বেলা চলে গেল, রাত্রি দশটার সময় ফিরে এল।

সারাদিন আমি একাকিনী কি করেছিলেম, এরূপ প্রশ্ন উপস্থিত না হলেও, আমি বলে রাখ্‌ছি, আমি একাকিনী ছিলেম না, আমার জন্য একটি সহচরী নিযুক্ত হয়েছিল; দিব্য সুন্দরী সহচরী, বয়সে যুবতী, প্রায় আমার সমবয়স্কা, নাম সিল্‌ভিয়া।

সিলভিয়া আমাকে বেশ যত্ন কোর্‌ত, তার কথাগুলিও অতি মধুর। কে আমি, সে তা জান্‌তো না; হোরেস আমাকে বিয়ে করে এনেছে, এই টুকুই সে অনুমান করে নিয়েছিল। বাড়িতে যে সকল দাস-দাসী নিযুক্ত ছিল, তারাও তাই জান্‌ত। তাই জানাই ভাল। সিল্‌ভিয়ার সঙ্গে নানা রকম গল্পকরে, ওয়াল্‌টার স্কটের একখানি নভেল পাঠ করে, দিব্য আমোদে দিনটী আমি কাটিয়ে ছিলেম। সিলভিয়া আমাকে চুপি চুপি বলেছিল, হোরেসের রাত বেড়ানো রোগ আছে, হপ্তার মধ্যে তিন দিন হোরেস লণ্ডনে আসে, নূতন নূতন মন-মোহিনীর সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করে যায়, একরাত্রে যে

বাড়িতে হোরেস প্রবেশ করেছিল, সেই বাড়ির পাশেই এক খানা ক্ষুদ্র বাড়িতে সিলভিয়া থাকে; দুই বাড়ীর গবাক্ষ ঠিক রুজু রুজু; নিজের বাড়ীর গবাক্ষ দিয়ে সিলভিয়া পাশের বাড়ীর রঙ্গ ভঙ্গ দেখেছিল, অন্য লোকের মুখেও অনেকবার অনেক কথা শুনেছিল। কেন যে আমার কাছে সে পরিচয় দিলে, তা আমি তখন বুঝে উঠতে পাল্লেম না; মনে কিন্তু খট্‌কা লেগে গেল।

হোরেস যখন শয়ন ঘরে প্রবেশ করে, অন্যান্য কথার সঙ্গে তখন তাকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলেম, লণ্ডনে তুমি কখন এসেছ? কাপড়ের ভিতর থেকে হাতীর দাঁতের একটা বাক্স বাহির করে, আমাকে দেখিয়ে, হোরেস উত্তর করেছিল, বৈকালে আমি এসেছি, তোমাকে সাজাবার উপকরণ যোগাড় কত্তে রাত হয়ে গিয়েছে। সেই বাক্সের মধ্যে আমার শিরোভূষণ, কর্ণভূষণ, কণ্ঠভূষণ আর করভূষণ সাজান ছিল, সেই সকল রত্নালঙ্কারের সঙ্গে একটি সোণার ঘড়ি, একটী লকেট্ আর দুছড়া সোণার চেইন। সব জিনিসগুলিই দামি দামি, দেখতেও অতি সুন্দর। গহনাগুলি আমাকে পরিয়ে দিয়ে হাঁস্‌তে হাঁসতে হোরেস বল্লে, এই সকল রত্ন ভূষায় তোমাকে যেন স্বর্গের দেবীর মতন দেখাচ্ছে, তোমাকে আমার নমস্কার করবার ইচ্ছা হচ্ছে। নমস্কারটী আজ তোলা থাকল, আগামী কল্য মায়সুদ পরিশোধ করা যাবে; আগামী কল্য তোমাকে আমি আরও ভাল রকমে সাজাব; হরেক রকম সৌখিন পোষাক তৈয়ারি করবার হুকুম দিয়ে এসেছি, দুটী তিনটী পোষাকে কারুকার্য্য খোচিত থাক্‌বে; কল্য সন্ধ্যাকালেই

সেই সকল পোষাক আস্‌বে, একটী পোষাক তোমাকে পরিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে আমি তোমাকে নমস্কার কর্‌বো।

মৃদু মৃদু হেঁসে, অল্প কথায় আমি বল্লেম, তোমার নমস্কার আমি এখন গ্রহণ কর্‌বো না, যে অঙ্গীকার তুমি করে রেখেছ সেইটি যেদিন পালন করবে, সেই দিন তুমি আমাকে নমস্কার করো, আমি তোমাকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিব।—হেঁসে ছিলেম বটে, কিন্তু অলঙ্কারের আহ্লাদে, নূতন পোযাকের লোভে, মনে আমার একটুও সন্তোষ আসে নাই; হাসিতেও সন্তোষের সম্পর্ক ছিল না। সুপবিত্র কুমারি-ধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়েছি, আমার অপবিত্র অন্তরে পবিত্র সন্তোষ আস্‌তে পারে না, তথাপি আমি হেসে ছিলেম। হাঁসতে হয়, আনন্দ প্রকাশ কত্তে হয়, মিষ্ট মিষ্ট কথা বলে নায়কের চিত্ত রঞ্জন কত্তে হয়, সেই জন্যই আমি হাঁসি, আনন্দ দেখাই, সুমিষ্ট সম্ভাষণ করি, কিন্তু সকল গুলিই মৌখিক। যে পথে পদার্পণ করেছি, সে পথে মৌখিক আমোদের, মৌখিক শিষ্টাচারের, মৌখিক ভালবাসার অভিনয় দেখাতে হয়, না দেখালে কাজ পাওয়া যায় না। বিশেষতঃ সিলভিয়ার মুখে যে কথা শুনে ছিলেম, তাতে আমার নিত্য সন্তোষের উৎসাহ এক রকম উড়ে গিয়েছিল।

নূতন অলঙ্কার পরিধান কল্লেম, নূতন আমোদের গল্প কল্লেম, নূতন নূতন উপাদেয় জিনিস ভোজন কল্লেম, নূতন ভালবাসার ফোয়ারা ছুটালেম, প্রাণের ভিতর কিন্তু গুমে গুমে আগুন জ্বলতে লাগ্‌ল।

রজনী প্রভাতে হোরেস আমাকে সাবধান করে দিয়ে,

বাড়ি থেকে একবার বেরিয়ে গেল; বলে গেল, আজ আমার কাছে গুটি দুই বন্ধু আসবেন, দেখ যেন তাদের কাছে আমার মাথা হেঁট্ কর না; তাদের কাছে আমি তোমার রূপ-গুণের বিস্তর প্রশংসা করেছি, রূপত তারা চক্ষেই দেখতে পাবে, গুণের ভাণ্ডার তুমি নিজেই খুব ভাল রকমে দেখিয়ে দিও। তোমাতে আমাতে এখন যে সম্পর্ক, ঘুণাক্ষরেও তারা যেন সেটা জানতে না পারে।

কি রকম বন্ধু আসবে, অনুমানে তা আমি স্থির করতে পারলেম না। তিন ঘণ্টা পরে হোরেস ফিরে এল; এসেই প্রফুল্ল বদনে আমাকে বল্লে, সব ঠিক্ ঠাক্ করে এসেছি; রাত্রি আট্টার পর তারা আসবে। সময়টা হয়ত তুমি কিছু বেশী মনে কচ্ছ, কিন্তু আমি নিজেই ঐরূপ সময় অবধারণ করে এসেছি। কেন জান?—সাতটার সময় তোমার পোষাক গুলি আসবে, এক ঘণ্টার মধ্যে তোমাকে আমি সাজিয়ে গুজিয়ে সিংহাসনে বসিয়ে রাখব, তারা এসে তোমার সেই দেবীমূর্ত্তি দর্শন করবে, দেখে তাদের তাক্ লেগে যাবে। বুঝেছ আমার কথা?—সেই জন্যই সময় নিরূপণ করেছি, আট্টার পর।

যতক্ষণ সন্ধ্যা না হল, ততক্ষণ আমি একবার হোরেসের কাছে, একবার সিল্ভিয়ার কাছে, একবার আমার নিজের মনের কাছে, পাঁচ রকম সুখের কথা আলোচনা কল্লেম; মনের কাছে সুখের কথা কম, দুঃখের কথাই বেশী।

সন্ধ্যা হবার আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে আমার সেই নূতন পোষাক-গুলি এসে পৌঁছিল। সবগুলির মধ্যে যেটি খুব ভাল, ঘরে বাতি

জ্বালবার পরেই হোরেস আমাকে সেই পোষাকটি পরিয়ে দিল। নূতন পোষাকের উপর নূতন অলঙ্কারগুলি ঝক্‌মক্‌ করতে লাগল। বৃহৎ একখানা চিত্রকরা চেয়ারে হোরেস আমাকে বসিয়ে রাখ্‌লে। আমি যেন সে রাত্রের একটি রাণী, চেয়ার-খানি যেন আমার রাজ-সিংহাসন।

রাত্রি যখন সাড়ে আট্‌টা, সেই সময়ে ছুটি লোক এল; তারাই হোরেসের প্রিয় বন্ধু। একটি পুরুষ, একটী নারী; বোধ হল, দম্পতি। হোরেস তাদের কর মর্দ্দন করে বিশেষ সম্মানে তাদের অভ্যর্থনা কল্লে, আমিও চেয়ার থেকে উঠে যথোচিত সমাদর কল্লেম। আমার চেয়ারের পাশে বাম-দিকে ছুখানি ও দক্ষিণ দিকে ছুখানি ভাল ভাল চেয়ার পাতা ছিল, অভ্যাগত বন্ধুরা বাম দিকের চেয়ার ছুখানিতে উপবেশন কল্লেন; দক্ষিণের একখানি চেয়ারে হোরেস, একখানি চেয়ার খালি থাকলো।

বন্ধুরা হোরেসের পরিচিত, আমার চক্ষে নূতন। অপরিচিত ভদ্র দম্পতির সহিত যে রকমে আলাপ পরিচয় করতে হয়, যে রকমে তাঁদের আপ্যায়িত করতে হয়, সেটি আমার অজানা ছিল না, প্রিয় সম্ভাষণে আমি তাঁদের যথেষ্ট সমাদর কল্লেম; আমার ব্যবহারে তাঁরাও বিলক্ষণ খুসী হলেন। এক ঘণ্টা আমরা চারজনে নানারকম আমোদ প্রমোদের গল্প কল্লেম। মাঝে মাঝে সিল্‌ভিয়া এসে দেখেশুনে গেল; বেশীক্ষণ দাঁড়াল না, একটিও কথা বল্লে না, কেবল, আড়ে আড়ে এদিক ওদিক চেয়ে চেয়েই মুখ মুচ্‌কে হাঁসতে হাঁসতে বেরিয়ে গেল। রাত্রি সাড়ে নটা। সেই সময় সিল্‌ভিয়া এসে সংবাদ দিলে,

খানা প্রস্তত। আমরা চারি জনেই ভোজনাগারে উপস্থিত হলেম, সে ঘরটিও পরিপাটি রূপে সাজান। মধ্যস্থলে একটা সুপ্রশস্ত মার্‌বেল পাথরের টেবিল, চারিদিকে চারিখানি চেয়ার, টেবিলের উপর রজত পাত্রে বিবিধ সুস্বাদু খাদ্যদ্রব্য সজ্জিত; ধারে ধারে হরেক রকম সুগন্ধি কুসুম, তার মাঝখানে বড় একটি ফুলদানে নানাবর্ণের ফুলের তোড়া; কুসুমের সৌরভে সমস্ত ঘরখানি আমোদিত।

আমরা চারজনে চারিখানি চেয়ারে উপবেশন কল্লেম, ভোজনের সঙ্গে সঙ্গে দেশ বিদেশের গল্প আরম্ভ হল; পরিবেশনের আদেশ পালনের নিমিত্ত সর্দ্দার খানসামা টেবিলের কাছে হাজির থাক্‌ল।

ভোজনাবসানে টেবিলের উচ্ছিষ্ট বাসনপত্র স্থানান্তরিত হবার পর বিবিধ সুমিষ্ট ফল, একটি রূপার ডিক্যান্‌টার, আর চারিটি বিচিত্র পানপাত্র সেস্থান অধিকার কল্লে। ভাল ভাল খানার মজ্‌লিসে সকলের আহারের পর পুরুষেরা যখন মদ খান, রমণীরা তখন উঠে যান; ডিক্যাণ্টারে মদ ছিল, সেকথা না বল্লেও বুঝে নিতে হবে। মদখাবার সময় স্ত্রীলোকেরা উঠে যান, ভদ্র সমাজের সেই যে বিশুদ্ধ পদ্ধতি, আমাদের খানার মজলিসে কিন্তু সে পদ্ধতির আদর হল না; আমি উঠে যাচ্ছিলেম, হোরেস আর তার বন্ধুটীর বিশেষ আনুরোধে, নিতান্ত অনিচ্ছায়, কাজে কাজেই আমাকে বস্‌তে হল। বন্ধুর বিবিটী সমভাবেই নিজের চেয়ারে বসে থাকলেন।

আমি মদ খাই না,—খাই না বলা হবে না,—তখন আমি মদ খেতেম না, কখনও খাই নাই, সে রাত্রেও খাব না, তবে

শুধু শুধু বসে থেকে কি করি,—দুটী একটী ফুল তুলে নিয়ে নিয়ে, অন্য মনে ছোট ছোট মেয়েদের মতন খেলা করতে লাগ্‌লেম। হোরেসের বন্ধু এক গ্লাস পান করবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেছিলেন, ধন্যবাদ দিয়ে আমি অস্বীকার করেছিলেম।

তাঁরা তিনজনে চুমুকে চুমুকে সুরাপান কল্লেন; আনন্দময়ী সুরাদেবীর প্রভাবে তিনজনের বদন মণ্ডলে আরক্ত রাগ দেখা দিল, তিন জনের মুখেই রসিকতার তুফান ছুট্‌ল; হোরেসের বন্ধু নেশার প্রমোদে আমার রূপের বিস্তর প্রশংসা কল্লেন; আমি লজ্জা পেলেম।

মজলিস যখন ভঙ্গ হল, রাত্রি তখন প্রায় দুই প্রহর। বন্ধু-দম্পতি বিদায় হলেন, আমরা শয়নাগারে প্রবেশ কোল্লেম। হাস্য করে হোরেস আমাকে বল্লে, ছিঃ? তুমি বড় বদ্‌রসিক, বন্ধুলোকে তত অনুরোধ কল্লেন, একপাত্র মুখে দিলে তোমার কি কোন ধর্ম্মহানি হ'ত? প্রথমাবধি সব কাজগুলি ভাল হয়ে এসেছিল, কেবল ঐ একটা কাজে মজলিসটী তুমি মাটী করে ফেলেছ। তাঁরা হয়ত ঘরে গিয়ে তোমার সেই অভদ্রতার প্রসঙ্গ তুলে কত রকম নিন্দা কর্‌বেন।

মুখ ভারি করে তৎক্ষণাৎ আমি বল্লেম, মাতালের নিন্দাকে আমি তুচ্ছ জ্ঞান করি। রাগ করো না, তোমাকে আমি মাতাল বল্‌ছি না, তুমি আমাকে মদ খেতে অনুরোধ করনি, তোমার সেই বন্ধুটিকেই আমি লক্ষ্য করেছি।

হোরেসের একটু খোসামোদ কল্লেম। কি জানি, প্রেম-

সাগরে সেই সবে নূতন সন্তরণ, পাছে একটা কলহ উপস্থিত হয়, পাছে আমি সাঁতার দিতে দিতে অকস্মাৎ ডুবে যাই, সেই সন্দেহেই খোসামোদ। রাত্রিকালে সে প্রসঙ্গে আর অন্য কথা উঠল না, নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা শয়ন কল্লেম।

দিনে দিনে দিন গত হতে লাগ্‌ল, দেখ্‌তে দেখ্‌তে একমাস। সেই এক মাসের মধ্যে আমি ঘোরতর বিলাসিনী হয়ে পড়লেম। বিলাস দ্রব্যের অভাব ছিল না, আমি চাই-তেম না, হোরেস আপনা হোতেই নানারকম সৌখিন জিনিস আমাকে এনে উপহার দিত। কৌতূহল সকলেরই আছে, কোনটিতে কি সুখ, আস্বাদন কর্‌বার কৌতূহলে আমি ক্রমে ক্রমে অনেক রকম বিলাসের সেবা কত্তে শিখেছিলেম। যে দিন আমাকে লণ্ডনে আনে, তার পাঁচ দিন পরে হোরেস একবার বাড়ী গিয়েছিল, এক পক্ষ পরে আর একবার গিয়ে-ছিল, তারপর এই এক মাসের মধ্যে আর একবারও যায় নাই; এক রাত্রে আমাকে বলেছিল, তোমাকে চক্ষে না দেখ্‌লে আমি জগৎ-সংসার অন্ধকার দেখি; আর আমি ঘন ঘন বাড়ী যাব না। পিতার কাছে একটা মিথ্যা কথা বলে এসেছি। বলেছি, লণ্ডন নগরে একজন অংশী যোগাড় করে, মস্ত একটা কারবার খোলা হয়েছে, বেশী দিন আমাকে লণ্ডনেই থাকৃতে হবে। পিতা সেই কথাতেই বিশ্বাস কোরে-ছেন। কেমন,—কেমন ফিকির?—বুঝ্‌লে রোজেশ্বরি? দেখ্‌লেতো?—শুন্‌লেতো?—তোমাকে আমি কতখানি ভাল-বাসি, বুঝ্‌তে পার্‌লে তো?—ধর্ম্মকে সাক্ষী করে বল্‌ছি, পলকের জন্যও তোমাকে চক্ষের আড় কত্তে আমার প্রাণ চায় না।

হোরেসের সেই সব কথায় আমি কেবল একটি "হুঁ" দিয়ে দুই তিনবার অল্প অল্প মাথা নেড়েছিলেম, মুখ ফুটে একটিও কথা বলি নাই; হোরেস কিন্তু তাহাতেই সন্তুষ্ট হয়েছিল।

সুখে আছি—কি কষ্টে আছি, তা আমি ভাব্‌ছি না, সময় কিন্তু শীঘ্র শীঘ্র চলে যাচ্ছেলো। এক মাসের পর আরও একমাস অতিবাহিত। যতই দিন যায়, ততই আমার বিলাস বাসনা বাড়ে। জানিনা, সে রকম প্রণয়ের পথে কি রকম মনোমোহন পুষ্প বৃক্ষ আছে; মন মোহিত করবার কি রকম যাদুমন্ত্র আছে, পূর্ব্বেই বলিছি, দিন দিন আমি ঘোরতর বিলাসিনী হয়ে পড়েছি। সে সকল বিলাসে আমার ততটা অপকার কর্‌তে পারেনি; যাতে অপকার হয়, হোরেস আমাকে তাই ধরালে।

কোন কাজেই হোরেসের মিতাচার ছিল না, সকল বিষয়েই স্বেচ্ছাচার ছিল। মদিরা পানে তার বিশেষ কোনরূপ নিয়ম ছিল না, যে দিন যে দিন পাঁচ জনে এক সঙ্গে জুট্‌তো, যে দিন যে দিন কোন প্রকার আনন্দ উৎসব থাকতো, সেই সেই দিন তার মদের মাত্রা খুব বেশী চড়ে উঠতো। নিকটেই আমি থাকৃতেম, এই দুই মাসের মধ্যে সে আমাকে একদিনও মদ খেতে বলেনি। দুই মাসের পর প্রভু যীশুর জন্মোৎসব; সেই দিন রাত্রে হোরেস জন দশেক বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করেছিল; পুরুষ মানুষ তিন জন, মেয়ে মানুষ সাতজন। রাত্রিকালে আমোদ আহ্লাদ চলছিল, বোতল গেলাসের ঠন্ ঠন্ শব্দ হচ্ছিল, সে ঘরে আমি ছিলাম না; অন্য ঘর

থেকে হাসির হররা, করতালির ধ্বনি, আর স্ফটিক পাত্রের ঝনৎকার আমি শুনতে পাচ্ছিলেম; জানতেম, মদের ঢলাঢলি বেশী হবে, সেই জন্য দাঁতের গোড়ার অসুখের ভাণ করে মজলিসে আমি যাই নাই; বন্ধুলোকের পীড়াপীড়িতে একটু বেশী রাত্রে হোরেস আমাকে সেই ঘরে ঠেলে নিয়ে যায়; তারা সকলেই তখন নেশার ঝোঁকে অনবরত চেঁচাচেঁচী কচ্ছিল; একটী বিবি আমার হাতে একটা মদিরাপূর্ণ গেলাস দিলেন, ধন্যবাদ দিয়ে, খাই না বলে, গেলাসটী আমি তারি হাতে ফিরিয়ে দিলেম; সকলেই আমাকে অসভ্য বলে ঠাট্টা কল্লে, সে রকম ঠাট্টা সহ্য করতে না পেরে, হোরেস আমাকে সভ্য করবার চেষ্টা পেলে, সে নিজেই আমার হাতে দিব্য একটী বিচিত্র পাত্র অর্পণ কল্লে; পাত্রটীর কানায় কানায় পরিষ্কৃত ফেনপুঞ্জ, আমার শুনাছিল, সামপিন নামক সরাপ যখন গেলাসে ঢালা হয়, তখন এক রকম ফেনা ফুট্‌তে থাকে; স্থির কল্লেম, আমার হাতে তবে সেই রকম সামপিন সরাপের গেলাস। ইতিপূর্ব্বে একবার গেলাস ফিরিয়ে দিয়ে অসভ্য হয়েছিলেম, আবার ফিরিয়ে দিতে ইতস্ততঃ করতে লাগলেম, শেষকালে সকলের দিকে চেয়ে, মিনতি বচনে বল্লেম, আমি পুরোহিতের কন্যা, এসব জিনিসের সেবা করা আমার অভ্যাস নয়, অধিকন্তু আজ আমার বড় অসুখ, আপনারা আমাকে অনুগ্রহ করে মাপ করুন।

সকলেই পরস্পর মুখ চাহাচাহি করে, আমার মিনতি বচনে যেন এক রকম নরম হলো, আমি সে ক্ষেত্রে ক্ষমা প্রাপ্ত হলেম, মদ খেতে হল না। সে রাত্রে ক্ষমা প্রাপ্ত হয়ে-

ছিলাম বটে, কিন্তু বরাবর জেদ বজায় রাখতে পারিনি। সাত দিন পরে নববর্ষের উৎসব; সে রাত্রেও কয়েকটীর বন্ধুর নিমন্ত্রণ হয়েছিল, সেরাত্রে আর দাঁতের গোড়ার অসুখের ওজর খাটে না, অন্য কোন ওজরও রচনা কত্তে পারিনি, কাজেই আমাকে মজলিসে গিয়ে বসতে হয়েছিল। আমাদের দেশে যত কিছু উৎসব হয়, জন্ম বলুন, বিবাহ বলুন, অভিষেক বলুন, ধর্ম্মোৎসব বলুন, পর্ব্বোৎসব বলুন, সকল উৎসবেই মদের ঘটা বেশী হয়ে থাকে। যে দেশের লোক রোজ রোজ মদ খায়, স্ত্রীপুরুষ উভয় দলেই নিত্য নিত্য মদ চলে, সে দেশে পার্ব্বণে পার্ব্বণে, উৎসবে উৎসবে আড়ম্বরটা অধিক হয়ে দাঁড়াবে, সেটা কিছু বিচিত্র কথা নয়। নিমন্ত্রিত বন্ধুরা সে রাত্রেও আমাকে মদ খাওয়াবার জন্য চেষ্টা পেয়েছিলেন, লওয়াতে পারেন নাই, চেষ্টা বিফল হয়েছিল। মদ খাওয়া, খানা খাওয়া, গীত গাওয়া, নৃত্য করা, সব রকম আমোদ চল্লো, আমি ফাঁকে ফাঁকে এড়ালেম, ঈশ্বরের কৃপায় সে রাত্রেও মদ খাওয়ার দায় থেকে অব্যাহতি পেলেম। অনেক রাত্রে মজলিস্ ভঙ্গ হল, নিমন্ত্রিতেরা টল্‌তে টলতে বাড়ি গেলেন, আমরা শয়ন কল্লেম। হোরেস সেরাত্রে বেএকতার হয়েছিল, প্রায়ই হুঁস্ ছিল না, সুতরাং সে আমাকে তিরস্কার করবার ক্ষমতা হারিয়ে ছিল, আমাকে তিরস্কার সহ্য করতে হয় নাই।

দশম তরঙ্গ।

আমি মজ্‌লিসী।

সপ্তাহ অতীত। নব বর্ষের প্রথম রজনীতে যাহা ঘটেছিল, এই সাত দিনের মধ্যে হোরেস একদিনও আমাকে সে প্রসঙ্গে কোন কথা জিজ্ঞাসা করে নাই; সপ্তাহের শেষ দিন রজনীতে, গোলাপি নেশায় প্রমোদিত হয়ে, আমাকে বলেছিল, তুমি আমার মান সম্ভ্রম সব নষ্ট করবে দেখছি; আমরা মানি লোক, লণ্ডন সহরের বড় বড় লর্ড, বড় বড় ডিউক, বড় বড় মার্কুইস, আমাদের বন্ধু, তাঁদের পরিবারস্থ মহিলারাও আমাদের যথেষ্ট খাতির করেন, দুই রাত্রে যাঁরা যাঁরা এখানে এসেছিলেন তাঁরা সকলেই বড় লোক। নববর্ষ রজনীতে যাঁরা উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে চারিজন ডিউক, ডাচেস্, মার্কুইস মার্শনেস। তাঁদের অনুরোধ তুমি অবহেলা করেছিলে, তাতে আমি বড়ই লজ্জা পেয়েছি। তাঁরা জানেন, তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়েছে, ব্যবহারেও আমি দেখাই সেই রকম, বন্ধু লোকের কাছে বলিও সেই রকম, এ অবস্থায় তুমি যদি তাঁদের কাছে ঐ রকম অভদ্রতা দেখাও, তা হলে তাঁরা আমাকে হত-শ্রদ্ধা করবেন, সে রাত্রে হয়তো করেও থাকবেন। দেখ অলিভিয়া, অসভ্যতা পরিত্যাগ কর, বড় লোকের কাছে অসভ্যতা দেখান বড় দোষ।

আমি উত্তর করেছিলেম, আমার দোষ কি? আমি কি

কর্‌ব। মদ খাই না, খেলেম না; তাতে যদি অসভ্যতা হয়, তবে আমি তোমাদের সভ্যতাকে তফাৎ থেকে সেলাম করি। যত দিন আমি বাঁচব, তত দিন অসভ্য হোয়ে থাক্‌ব, তাও আমার পক্ষে মঙ্গল, মদ খেয়ে ঢলাঢলি করা সভ্যতা আমাকে যেন স্পর্শ করতে না পারে; আমার এই স্পষ্ট কথা। এ কথার উপর তোমার যা ইচ্ছা, তাই তুমি বলতে পার, সে সব কথা আমি আমলেই আন্‌ব না।

কথাগুলি যখন আমি বলেছিলেম, কণ্ঠ স্বরে ও মুখের ভাবে তখন যেন একটু রাগ রাগ লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। হোরেস স্বস্নেহে আমার হাত ধরে, প্রবোধ দিয়ে, বিনীত বচনে বলেছিল, চটো না, চটো না, যা আমি বলি, স্থির হয়ে শুন। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সমস্ত সভ্য রাজ্যে সভ্যতার বড় আদর; আমরা ইংরাজ, ইয়োরোপ খণ্ডের মধ্যে আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা বড়, আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সভ্য, আমরাই জগতে সর্ব্ব সভ্যতার প্রধান আদর্শ; ইংলণ্ডের সভ্যতা সকল দেশেই বিস্তার হচ্ছে, তোমার মতন গুণবতী সুন্দরী যুবতী যদি সেই সভ্যতায় অনাদর করে, তা হলে আমার প্রাণে বড়ই বেদনা লাগবে। ঐ রকমের অনেক কথা—সব কথা শুনে শুনে আমার বিরক্তি জন্মাল; ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা কল্লেম, তুমি আমাকে কি কত্তে বল?

হোরেস বোল্লে, তুমি সভ্য হও। আর তোমাকে কিছুই কত্তে হবে না, কেবল সভ্যতার আশ্রয় গ্রহণ কল্লেই আমি চরিতার্থ হব।

আবার আমি জিজ্ঞাসা কল্লেম, কি রকমে সভ্য হব?—

কি রকম কাজ কল্লে তোমার মনের মতন সভ্য হওয়া যায়, স্পষ্ট করে উপদেশ দাও।

সটান আমার মুখ পানে চেয়ে, মুখরাঙা করে, হোরেস তৎক্ষণাৎ বলেছিল, তুমি একটু একটু মদ খাও। তেজস্কর মদ খেতে হবে না, ব্রাণ্ডির বোতল ছুঁতে হবে না, আমি তোমার জন্য ভাল ভাল ঠাণ্ডা মদ এনে দিব, দিব্য সুস্বাদু, দিব্য তৃপ্তিকর, দিব্য আনন্দপ্রদ, অতি চমৎকার।

ঘৃণা প্রকাশ করে আমি বলেছিলেম, তুমিও চমৎকার, তোমার সভ্যতাও চমৎকার, তোমার ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা মদ্যও চমৎকার, আমি কিন্তু সে সকল চমৎকার জিনিস চাই না। এই অপরাধে যদি তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর, তাতেও আমি ক্ষুণ্ণ হব না; স্নেহের বন্ধন ছিন্নকরে যখন আমি বেঁচে রয়েছি, তখন আর আমার বেঁচে থাকবার ভাবনা থাকবে না।

বার কতক মস্তক সঞ্চালন করে, একটু জোরে জোরে হোরেস বলেছিল, আচ্ছা, দেখা যাবে, কার পণ বজায় থাকে, পণের খেলায় কার জিত হয়। তোমার পণ থাকল মদ খাবে না, আমার পণ থাকল, খাওয়াবই খাওয়াবো; কে হারে কে জিতে, শীঘ্রই জানতে পারা যাবে।

সে কথায় আমি আর কোন উত্তর দিই নাই। এক মাস গত হয়ে গেল, আমার পণ বাজায় থাকল, বার বার অনুরোধ করেও হোরেস আমাকে মদ খাওয়াতে পাল্লে না। লোকে কথায় বলে, সুখের সময় শীঘ্র শীঘ্র চলে যায়, লণ্ডন সহরে আমার সুখের সময় উপস্থিত হয়েছিল কি না, তা আমি বলতে পারি না, সময় কিন্তু খুব শীঘ্র শীঘ্র চলে গিয়েছিল।

এক বৎসর অতিক্রান্ত। এক বৎসরের মধ্যেও হোরেস আমাকে নিজের মতে নিয়ে যেতে পারে নাই। সেই এক বৎসরের মধ্যে হোরেসের অনেকগুলি নর-নারী বন্ধু সেই বাড়িতে এসেছিলেন, তাঁদের কাছে আসি বসেছিলাম, গল্প করেছিলেম, হাস্য করেছিলাম, এক সঙ্গে খানা খেয়ে ছিলেম, কিন্তু পণ আমার বজায় ছিল। এক বৎসর পরে আমি ঠক্‌লেম।

পূর্ব্বে বলে রেখেছি, একটা মিথ্যা কারবারের ওজর করে, হোরেস সর্ব্বদাই লণ্ডনে থাকে, ঘন ঘন বাড়ি যায় না, কখনও সপ্তাহ অন্তর, কখনও এক পক্ষ অন্তর, কখনও এক মাস অন্তর দেশে যায়, দুই একদিন থেকেই চলে আসে। এক একবার এক দিনের বেশী দেরী করে না।

হোরেস যখন লণ্ডনে থাকে না, তখন আমি সিলভিয়াকে সঙ্গে করে হাইড পার্কে বেড়াতে যাই, বেলা পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত হাওয়া খেয়ে আসি, একটিও চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয় না।

মাঝে মাঝে যে সকল বন্ধুলোক আমাদের বাড়িতে আসতেন, তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ হোরেসের অনুপস্থিতি কালেও আমার সঙ্গে দেখা করতে ক্রটী করত না। একদিন সন্ধ্যার পর আমি একাকিনী আপনার ঘরে বসে আছি, এমন সময় একটি বন্ধু এলেন, তাঁর সঙ্গে রমণী ছিল না, তিনি একাকী। তাঁকে আমি চিনে রেখেছিলেম; হোরেস যে রকম পরিচয় দিয়েছিল, সেই পরিচয় স্মরণ করে, তাকে আমি বহুমানে অভ্যর্থনা কর্‌লেম, যথোচিত সম্ভ্রমে সমাদর কল্লেম। তিনি

একজন সম্ভ্রান্ত ডিউক্। দিব্য সুপুরুষ, দিব্য আলাপি, দিব্য অমায়িক, দিব্য চতুর, বয়স অনুমান ত্রিশ বৎসর।

রাত্রি প্রায় সাড়ে আট্টা। ডিউকের সঙ্গে আমি বাক্যালাপ কর্‌ছি, কথা কইতে কইতে, দেয়ালের ঘড়ির দিকে চেয়ে, তিনি দুই তিনবার হাই তুল্‌লেন, ভাব আমি বুঝতে পাল্লেম না। আবার বলে রাখি, হোরেস সে দিন লণ্ডনে ছিল না। ডিউকের পাশে আমি একাকিনী।

গল্প চলছে;—তিনিও গল্প করছেন, আমিও গল্প কর্‌ছি; আড়ে আড়ে এক একবার চেয়ে দেখছি, তিনি যেন কিছু অন্য মনস্ক। নটা বাজে বাজে, সেই সময় সুন্দর ইঙ্গিত-কৌশলে তিনি একটু সুরাপানের অভিলাষ জানালেন। হোরেসের ভাণ্ডারে সর্ব্বদাই হরেক রকম মদ্য সঞ্চিত থাকত, আমি ঘণ্টা বাজালেম, সিল্‌ভিয়া দেখা দিল। সিল্‌ভিয়াকে আমি সঙ্কেত কল্লেম, চতুরা সিল্‌ভিয়া তৎক্ষণাৎ আলমারি খুলে স্যাম্‌পিনের বোতল, ব্রাণ্ডির ডিক্যাণ্টার্, জিন সরাপের চোপল, তিন রকমের গেলাস, আর কতকগুলি সুস্বাদু বিস্কুট্ বাহির করে, টেবিলের উপর রেখে, অল্পক্ষণ আমার চেয়ারের ধারে দাঁড়িয়ে থাক্‌ল, ডিউক্ একবার কুটিল নয়নে তার মুখের দিকে চাইলেন; অভিপ্রায় বুঝতে পেরে বুদ্ধিমতী সিল্‌ভিয়া যেন বিদ্যুৎগতিতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল; বাহির থেকে ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গেল।

ঘরে আমরা দুজন ;—ডিউক্ আর আমি। কোথাকার ডিউক্, অগ্রে আমি সে পরিচয়ও পেয়েছিলেম; তাঁর উপাধি ছিল—ডিউক্ অব্ ফেশিংটন্।

প্রথমে যখন আমাদের সেই বাড়িতে নূতন নূতন দাসি চাকর নিযুক্ত হয় তখন আমি বলে রেখেছি, তাদের মধ্যে এক জন ছিল সাকী। সাকী কি, তখন আমি সেটা জান্‌তেম না, অন্য অবসরে হোরেসের মুখে সাকী শব্দের ব্যাখ্যা শুনে ছিলেম। বড় বড় ইংরাজের ঘরে যারা টেবিলে মদ্য সর-বরাহ করে, ইংরাজি ভাষায় তাঁদের নাম বট্‌লার; এসিয়া-খণ্ডের পারস্য ভাষায় সেই বট্‌লারের অর্থ সাকী। মদিরা পাত্র সম্মুখে দেখে, ডিউক ফেশিংটন্ সতৃষ্ণ নয়নে আমার মুখের দিকে তাকালেন, সে ঘরে তখন সাকী উপস্থিত ছিল না, আমি নিজেই সাকী হলেম। অগ্রে কোন জিনিসের সমাদর কত্তে হবে, সকৌতুকে সেইটি জেনে নিয়ে, বৃহৎ একটি চতুষ্কোণ গেলাশে পূর্ণ মাত্রায় স্যাম্পিন ঢেলে দিলেম; তাজা তাজা ফেনা উঠতে লাগলো, ডিউক ফেশিংটন্ সেই গেলাসটি হাতে করে তুলে, সর্ব্বাগ্রে আমার হাতের কাছে ধরলেন, বক্রভাবে চেয়ারের গায়ে হেলে পড়ে অগ্রে আমি সবিনয়ে মাপ চাইলেম, তার পর সসম্ভ্রমে ধন্যবাদ দিয়ে মৃদুস্বরে বল্লেম, পান করা আমার অভ্যাস নাই।

ভদ্রলোকে সেরূপ স্থলে বেশী অনুরোধ করেন না, ডিউক অগত্যা নিজেই অল্প অল্প পরিমাণে শ্যাম্পিন-সুধা পান কত্তে আরম্ভ করলেন; সহাস্য বদনে আমি তাঁর পরিচর্য্যা কর্‌তে লাগলেম। মনে আমার কোন প্রকার সংশয় থাকলো না।

ডিউক ফেশিংটন্ পর্য্যায়ে পর্য্যায়ে শ্যাম্পিন পান করছেন, মজার মজার গল্প করছেন, এক একবার দুই একখানি বিস্কুট চর্ব্বণ করছেন, মাঝে মাঝে সুগন্ধি সিগারেটের ধুঁয়া উড়াচ্ছেন,

গল্প শুন্‌তে শুন্‌তে আমি তাঁর সেই সকল রঙ্গ দর্শন কর্‌ছি। ঘড়ির ছোট কাঁটা দশের ঘরে, বড় কাঁটাটী একাদশের পারে, দশটা বাজবার পাঁচ মিনিট বিলম্ব। অভাবনীয় সংঘটন! হঠাৎ গৃহের দ্বার উদ্ঘাটিত, একটি লোকের দ্রুত প্রবেশ। কে সে? —হোরেস রকিংহাম। অভ্যাগত বন্ধুকে অভিবাদন করে, ফুল্ল নয়নে আমার দিকে চেয়ে, ফুল্ল বদনে হোরেস বলে উঠ্‌ল, বাঃ! বেশ মজা হচ্ছে! এই রকম মজা হবে, তা আমি জান্‌তেম, হওয়াই আমার ইচ্ছা; এই বারত তোমার পণ ভঙ্গ হয়েছে, বেশ হয়েছে! আমি বড় খুসী হলেম।

হাস্‌তে হাস্‌তে এই কথাগুলি বলে, সম্মুখের এক খানি চেয়ারে হোরেস উপবেশন কল্লে। ডিউক সেই সময় একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করে, আমাদের অভিনয়ের সত্য তাৎপর্য্যটি হোরেসকে বুঝিয়ে দিলেন।

হোরেসের ফুল্ল বদন অকস্মাৎ ম্লান হলো; ম্লান বদনে কিন্তু অল্প অল্প আরক্ত রেখা দেখা দিল। ডিউক ফেশিংটন তখন তার সম্মুখে বোতল, গেলাস সরিয়ে দিলেন; সে বোতলে হস্তার্পণ না করে, ক্ষিপ্র হস্তে ডিক্যাণ্টারের ব্রাণ্ডিতে একটি গেলাস পরিপূর্ণ কল্লে; এ দিক ও দিক চাইলে, গেলাসটি মুখের কাছে না তুলে, জোরে জোরে ঘণ্টা বাজালে; একজন খানসামা এল। বড় লোকের বাড়ীর খানসামারা বিলক্ষণ চালাক হয়, বিলক্ষণ হুঁসিয়ার; টেবিলের উপর দৃষ্টিপাত করে খানসামা একবার ধাঁ করে বেরিয়ে গেল। একটু পরেই একটা ডিক্যাণ্টার আর এক জোড়া সোডাওয়াটার এনে টেবিলের উপর রাখলে; প্রভুর ইঙ্গীত বুঝে একটি সোডাওয়াটারের

ছিপি খুলে ফেল্লে, হোরেস তখন ব্রাণ্ডির গেলাসে সেই জল মিশিয়ে ডিউকের দিকে মাথা নেড়ে, আমার দিকে চক্ষু তুলে আমাদের উভয়কেই থ্যাঙ্ক দিয়ে তিন বার হেলথ্‌ হেলথ্‌ বলে গেলাসটি ঠোঁটের কাছে নিয়ে গেল; এক নিশ্বাসেই উজাড়। ডিউকও সেই অবসরে আর এক গেলাস শ্যাম্পিন পান কল্লেন। উভয়ের ওষ্ঠপুটে প্রজ্বলিত সিগারেট্‌ শোভিত হলো।

সময়োচিত কথাবার্ত্তা চল্‌ছে, এক বার সেটা বন্ধ হয়ে, আমাকে লক্ষ্য করে হোরেস বল্লে, অলিভিয়া! রোজ! বড় দুঃখিত হলেম, তুমি বন্ধু লোকের খাতির জান না; ভদ্রলোকের মজলিসে বস্‌তে জান্‌না; আমার এই বন্ধুটির প্রকৃত পরিচয় হয় ত তুমি জান না, সেই জন্যই যেন একঘরে হয়ে বসে আছ। তোমার পণ যেন আমারই সঙ্গে, কিন্তু—

হঠাৎ তাকে থামিয়ে দিয়ে, সতেজে অথচ সসম্ভ্রমে তখনই আমি বলেছিলেম; কেন জানব না?—প্রকৃত পরিচয় আমি বেশ জানি; দেখবা মাত্রই চিনেছি। যত দূর আমার সাধ্য, তত দূর খাতির করেছি; যেটা আমার সাধ্য নয়, কেবল সেই টুকুই বাকি।

আর এক গ্ল্যাস ব্রাণ্ডি কণ্ঠস্থ করে, ত্বরিত স্বরে হোরেস বলেছিল, তাকে খাতির বলে না গো, তাকে খাতির বলে না; বড় বড় সম্ভ্রান্ত বন্ধুর সঙ্গে একত্রে পান পাত্রের মর্য্যাদা রাখতে হয়। ঠিক সময়ে আমি এসে পড়েছি, আজ আমি তোমার পণ ভঙ্গের গুরু হব।

ডিউক ফেশিংটন অট্ট অট্ট হাস্য কর্‌লেন, আর এক পাত্র

স্যাম্পিন খেলেন, বড় বড় চক্ষু ঘুরিয়ে আমার দিকে চাইলেন; হোরেসও আর এক পাত্র ব্রাণ্ডি উদরস্থ কল্লে। মনে কি ভাবলে, আমার মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে, যেন বিজয়োল্লাসে বার দুই তিন ঘাড় নাড়্‌লে। সোডাওয়াটারের বোতলের ছিপি খুলে দিয়ে খানসামা বেরিয়ে গিয়েছিল, তাকে ডাকবার জন্য হোরেস আবার ঘণ্টা বাজালে, খানসামা পুনঃ প্রবেশ কল্লে।

ডিউকের দিকে, আমার দিকে, আর খানসামার দিকে হোরেসের তিনবার নেত্র নিক্ষেপ; তারপর খানসামাকে লক্ষ্য করে গম্ভীরস্বরে হুকুম দিলে, বীয়ার—

অবিলম্বে টেবিলের উপর বীয়ারের বোতল গেলাস হাজির। হোরেস বুঝেছিল, সে রাত্রে আমি হব নূতন ব্রতী; স্যাম্পিন খাব না, আর কিছু খাব না, ব্রাণ্ডিত ছোঁবই না। সেই জন্যই বীয়ার আনালে;—আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দম্ভ করে বল্লে, রাখ দেখি—এইবার তোমার পণ? এক বৎসর আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে রেখেছ, এক বৎসর তোমাকে জপিয়ে জপিয়ে আমি হার মেনেছি, আজ কিন্তু পণ রক্ষা কত্তে পারবে না।

আমাকে ঐ কথা বলেই বাড়ীর কর্ত্তা আবার খানসামার দিকে কটাক্ষ নিক্ষেপ কল্লে; খানসামা ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে মর্ম্ম বুঝে অতি সত্বর প্রভুর আজ্ঞা পালন কল্লে; বীয়ারের গেলাস পরিপূর্ণ। নিজে হাতে করে হোরেস সেই পূর্ণ পাত্রটি আমার হাতে দিলে; হাসতে হাসতে বল্লে, এই পাত্রটির মর্য্যাদা রক্ষা কর, জিনিসের প্রতি সুবিচার কর।

ডিউক বাহাদুরও উৎসাহ পেয়ে, সানন্দে সমস্বরে হোরেসের বাক্যের প্রতিধ্বনি কল্লেন। আমি তখন মহা বিভ্রাটে পড়লেম।

এক জোড়া অনুরোধ, দুই জনেই বড় লোক; সে অনুরোধ আমি এড়াতে পারলেম না। কম্পিত হস্তে পাত্রটি গ্রহণ করে এক চুমুক বীয়ার সরাপ পান কল্লেম। ডিউক আর হোরেস উভয়েই হো হো করে হেসে মহাকৌতুকে করতালি দিলেন। খানসামা ছুটে পালাল।

আমি এক চুমুক বীয়ার খেলেম, কিন্তু সেই এক বার বই আর না। অনুরোধ হয়েছিল, কিন্তু সে অনুরোধ বৃথা; আমাকে তাঁরা দ্বিতীয় পাত্র গ্রহণে বাধ্য কোত্তে পারেন নি। ডিউক উপস্থিত হবার পরক্ষণে আমি তাঁর অগোচরে খানা প্রস্তুত করবার হুকুম দিয়ে রেখেছিলেন, একবার উঠে গিয়ে বাবুর্চ্চি খানায় তদারক করে এলেম। আমাদের দেশের দস্তর এই যে, ভদ্রলোকেরা আগে খানা খান, তারপর মদ খান, আমাদের বাড়ীতে সে রাত্রে উল্টা হয়ে গেল,—আগে মদ, তার পর খানা।

তিনজনে আমরা একসঙ্গে খানা খেলেম। খানার মজলিসে ডিউক বাহাদুরকে সম্বোধন করে হোরেস বলেছিল, মিলর্ড! তুমি আমার প্রতি যেরূপ কৃপা কর, তাতে আমি মনে মনে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করি। আমি উপস্থিত ছিলেম না, তথাপি তুমি স্বাভাবিক উদারতায় আমার কুটীরে আতিথ্য গ্রহণ করেছ। এই রকম আমি ভাল বাসি। আমার ঘর আর তোমার ঘর এক রকম মনে করাই ঠিক, তাতেই যথার্থ বন্ধুত্বের পরিচয় হয়। ডিউক বাহাদুর হোরেসের ঐ রকম শিষ্টাচারে সমুচিত উত্তর দিয়ে, উজ্জ্বল নয়নে আমার বদনে দৃষ্টিপাত কল্লেন; আমি সসম্ভ্রমে অভিবাদন কল্লেম।

রাত্রি বারটা বাজবার দশ মিনিট থাকতে ডিউকের বিদায়। হোরেসের কর মর্দ্দন করে, আমার করচুম্বন করে, তিনি বিদায় গ্রহণ কল্লেন। সদর দরজার বাহিরেই তাঁর গাড়ি ছিল, গাড়ি তাঁকে চক্ষের নিমিষে যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল।

এই অভিনয়ের পর এক মাস অতীত। ধীর সরাপে আমি অভিষিক্ত হয়েছিলেম, তৎপরে সে কার্য্যে আমার আর আপত্তি চল্লো না, হোরেস আমাকে নিত্য রাত্রে একটু একটু বীয়ার খাওয়াতো, প্রথমে বীয়ার, তার পর সেরী, তারপর ক্লারেট, তারপর স্যাম্পীন। ক্রমে ক্রমে সুরাপানে আমি পরিপক্ক হয়ে উঠলেম। এক মাসের পর এক রাত্রে পান ভোজনের সময় হোরেস আমাকে বলেছিল, দেখলে তো, যা আমি বলে ছিলেম, তাই আমি করেছি, পণে তোমাকে হারিয়েছি। আমার পণ বজায় হয়েছে, তোমার পণ ভেঙ্গে গিয়েছে। ও রকম পণ ভেঙ্গে যাওয়াই ভাল। জিনিসটি আমাদের স্বর্গ ধামের সুপবিত্র সুধা, এই সুধাপানে পরম তৃপ্তি পাওয়া যায়, দেহ মন প্রফুল্ল হয়, ভদ্রলোকের মজলিসে লজ্জা পেতে হয় না, একাগ্র মনে জগদীশ্বরে ভক্তি আসে, উচ্চ অনুষ্ঠানে মতি হয়, সর্ব্বাংশেই মানব জীবনের কর্ত্তব্য পালনে উৎসাহের পূর্ণতা লাভ হয়, মনের ভিতর ময়লা থাকে না, সর্ব্বক্ষণ স্ফূর্ত্তির উদয়। আরও কি জান,—কি স্ত্রী, কি পুরুষ, কাহারও পক্ষে একা-একা এ সুধার সেবা করায় সুখ হয় না, সভ্যতা-শাস্ত্রের নিষেধ, যুগলে যুগলে কিম্বা পাঁচজনে এক মজলিসে এই অঙ্গের আনন্দে জগতের অনেক রকম পুণ্য সঞ্চয় হয়ে থাকে, জগতেও আনন্দ, স্বর্গেও আনন্দ। আগে আগে তুমি বন্ধুলোকের

মজলিসে বস্‌তে, এখনও বস্‌তেছো, ভেবে দেখ দেখি, তখন-কার আমোদে আর এখনকার আমোদে কত প্রভেদ। এখন তুমি মজলিস্‌ রাখতে শিখেছ, এখন তুমি মজলিসি হয়েছ, আমার মন বাসনা পূর্ণ হয়েছে।

সত্য কথা। তখন আমি মজলিসি হয়েছিলেম। আমার অভিষেকের পর যে রজনীতে আমাদের বাড়িতে বন্ধুলোকের মজলিস্‌ হয়েছিল, সকল মজলিসেই সেই সেই রজনীতে আমি অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করেছি। সুধাপানের পর রাত্রিকালে এক একবার আমার মনে দুর্লভ কবিত্বের ভাব আসে, ঘরে বসে আমি যেন স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রকৃতির শোভা দর্শন করি, অন্তরে অন্তরে পবিত্র ভাবের ক্রীড়া হয়, বাইবেল শাস্ত্রে যে সকল মন্ত্র লেখা নাই, সুরাদেবীর প্রসাদে আমি মনে মনে সেই সকল মন্ত্র সৃষ্টি করি, নূতন নূতন মন্ত্রে মনে মনে জগৎপতির স্তব করি, কি যে বিমল আনন্দ লাভ হয়, সে আনন্দের স্বরূপ ভাব মুখে ব্যক্ত করা যায় না। উপাদেয় জিনিস,—যথার্থই স্বর্গের সুধা।

আরও ছয় মাস। স্বর্গ সুধার আস্বাদনে, নিত্য বস্তুর আরা-ধনে, হোরেসের সোহাগ যত্নে নিত্য নিত্য আমি নূতন নূতন আনন্দ প্রাপ্ত হই, পূর্ব্বে পূর্ব্বে যতটা দুর্ভাবনা মনে আস্‌তো, এখন আর ততটা ভাবনা আমার মনে স্থান পায় না। সুখে সুখে, স্ফূর্ত্তিতে স্ফূর্ত্তিতে, আনন্দে আনন্দেই আমার দিন যেতো, রাত্রিকালেই অধিক আনন্দ অনুভব কত্তেম।

আমি মজলিসি হয়েছিলেম। লণ্ডনের সভ্য সমাজে আমার আদর হয়েছিল। পিতা মাতার সংসারের কষ্ট, বিষয় কার্য্যে

সিরিলের বিফলতা, আমার নীজের শূন্য জীবনে উদাসীনতা, আমাকে সর্ব্বদা কাতর করে রাখ্তো, পল্লী নিবাসে সেই ভগ্ন মঠে যখন আমি থাকৃতেম, তখন আমার মনে একটুও শান্তি থাক্তো না, সর্ব্বক্ষণ দুশ্চিন্তা, সর্ব্বক্ষণ অভাবের উৎ-পীড়ন, সর্ব্বক্ষণ নিজের অদৃষ্ট ভাবনা আমাকে অতিশয় যন্ত্রণা দিত। লণ্ডনের বিলাস নিকেতনে নানাবিধ বিলাসের মাঝখানে থেকে সে সকল যন্ত্রণার হাত আমি এড়িয়ে ছিলেম, তথাপি মনের কথা বলে রাখতে হয়,—অন্যান্য বিষয়ে সম্ভবমত সুখ থাক্-লেও, হোরেসের বিধিবিরুদ্ধ ভাল বাসায় আমার মনে প্রকৃত সন্তোষের স্থান ছিল না। আরও একটি অভাব—প্রধান অভাব আমি অহঃরহ অনুভব কত্তেম, দরিদ্রতার অন্ধকার গভীর কূপে যখন আমি ডুবেছিলেম, পরমেশ্বরের প্রতি তখন আমার যে রকম অচলা ভক্তি ছিল, বিলাসের রাজ্যে প্রবেশ করে সেই ভক্তি অনেক পরিমাণে কম হয়ে এসেছিল।

আমি মদ খেতে শিখলেম, পিয়ানো বাজাতে শিখলেম, ঘোড়া চোড়তে শিখলেম, বেরাল কুকুর নিয়ে খেলা কত্তে শিখলেম, হোরেস একজন ওস্তাদ রেখে আমাকে নাচ্তে শেখালে, দিন দিন আমি বিলক্ষণ মজলিসি হয়ে উঠলেম।

এইখানে একটা কথা মনে পড়ে গেল। পিতার বাসস্থানে যখন আমি থাকতেম, সেইখানে তখন মস্ত একটা বিড়ালী ছিল, মুখখানি সাদা, পেট্টি সাদা, আর সব কাল, লেজটি খুব ঝাড়ালো, সেই বিড়ালী আমার পিতার ঘরের পাপোষের উপর শুয়ে থাকৃতো। সংসারের তত দুর্দ্দশার সময় যদি কোন নূতন লোক আমাদের বাড়িতে যেত, বিড়ালীকে দেখে সে

মনে কত্তো, এরা খুব বড় মানুষ, খুব ভাল ভাল জিনিস খায়, বেড়ালটাকেও খুব ভাল জিনিস খাওয়ায়, তাইতেই বেড়ালটা এমন মোটা সোটা। বেড়ালের কথা ছেড়ে দিয়ে, আমি আর একটা মজার কথা বলি,—মজার কথাও বটে, দুঃখের কথাও বটে, লজ্জার কথাও বটে—এক দিন দুটি মেয়ে মানুষ আমাদের বাটিতে গিয়েছিল, আমার পিতা যে ঘরে বসতেন, সেই ঘরেই তারা বসেছিল। ঘরের তাকে তাকে, গবাক্ষে গবাক্ষে অনেক রকমের অনেক বোতল সাজান ছিল, মা তখন সে ঘরে ছিলেন না, কর্ত্তাও বেরিয়ে গিয়েছিলেন, কেবল আমিই সেই ঘরে তাদের কাছে বসেছিলেম, যারা গিয়েছিল, তারা নূতন; পূর্ব্বে আর কখনও আমাদের বাড়ীতে যাই নাই, তারা আমাদের ঘরের সামান্য সামান্য আস্‌বাবগুলি চেয়ে চেয়ে দেখেছিল, আমি একবার কি একটা কাজের জন্য ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছি, সেই সময় তারা দুজনে সেই সকল বোতলের কথা নিয়ে বড় মজার কথা বলাবলি করেছিল। আমি বেশী দূরে যাই নাই, সেই ঘরের একটা জানালার কাছেই দাড়িয়ে ছিলেম, তাদের কথাগুলি আমার কানে গিয়েছিল। এক জন বলেছিল, এত মদ যারা খায়, তারা নিশ্চয়ই খুব বড় মানুষ। তাদের কথা শুনে আমার হাসি পেয়েছিল, আমি মৃদু মৃদু হেসে ছিলেম, কিন্তু পিতার দুর্দ্দশার কথা ভেবে, হাসির সঙ্গে আমার চক্ষে জল এসেছিল। যাক্,—পুরাতন কথা থাকুক, নূতন কথা বলি।

আমি বিলক্ষণ মজলিসি হয়ে উঠ্‌লেম। হোরেসের সঙ্গে যখন আমার ঐ রকম ভাবে মিলন হয় নাই, তখন মনে

আমার একটী বড় আপ্‌শোস ছিল; প্রায় সর্ব্বদাই আমি ভাবতেম, আমি গরীব, সেই জন্যে আমাকে বিয়ে করবার অভিলাষে একটাও উমেদার আমার পায়ে ধর্‌তে আসে না, ভাগ্যবান লোকেরাও তাদের বল্ পার্টিতে, কন্‌সার্ট পার্টিতে, অপেরা পার্টিতে, গার্ডেন্ পার্টিতে, ডিনার পার্টিতে, সাপার পার্টিতে আমাকে নিমন্ত্রণ করে না, গরীব বলেই অবহেলা,—গরীবের মান কোথাও নাই,—প্রায় সর্ব্বদাই ঐ রকম আপ্‌শোস হতো; এখন আর সে আপ্‌শোস্ থাক্‌লো না; আমি মজলিসি হয়ে উঠেছিলেম, ভোগবিলাসের কোলে নূতন নূতন খেলা করেছিলেম, সহরের ভাল ভাল সাহেব বিবির সকল মজলিসেই আমার নিমন্ত্রণ হতে লাগলো, হোরেস এক জন বড় লোকের সন্তান, সে আমাকে বিয়ে করেছে বলেছিল, সেই খাতিরেই নিমন্ত্রণ।

মনে আমার পবিত্র সন্তোষ ছিল না, সে কথা আমি বার বার বলে আসছি, আপ্‌শোসের কথাটাও পূর্ব্বে একবার সংক্ষেপে একটু বলে রেখেছি, এই সময় আরও খোলসা করে বল্লেম। মনে আমার পবিত্র সন্তোষ ছিল না, তথাপি হোরেসের সোহাগে, সুখসামগ্রীর বাহ্য আড়ম্বরে, ভাগ্যবতী বিবি লোকের সঙ্গে সমান সম্ভাষণে একটু একটু সন্তোষ দেখাতেম। আমি যখন সভ্যতা শিখ্‌তে পারি-নাই, মদ খেতে শিখি নাই, মজলিসি হোতে পারি নাই, তখনও যেমন হোরেসের বড় বড় বন্ধুরা আমাদের বাড়িতে বেড়াতে আস্‌তেন, আমি মজলিসি হবার পরেও তাঁদের সেই রকম গতিবিধি ছিল, বরং পূর্ব্বাপেক্ষা ঘন ঘন। এই সময় আমার সভ্যতার

নিদর্শন দর্শন করে, তাঁরা সকলেই আমাকে বাহাদুরী দিতেন, উচ্চ প্রশংসা করতেন, আমি হোরেসের উপযুক্ত বিবি, এই-রূপ গৌরব বাড়িয়ে, আমোদিনি বিবিরা আমার মুখে এক একটি চুম্ব দিতেন।

আরও তিন মাস। এক দিন বৈকালে আমি অশ্বারোহণে ময়দানে বেড়াতে গিয়েছি, অনেক সাহেব বিবি প্রতিদিন শেষ বেলায় সেই ময়দানে হাওয়া খান, তাঁরাও বেড়াচ্ছেন, আমিও বেড়াচ্ছি, কেহ কেহ অশ্বারোহণে, কেহ কেহ পদব্রজে। অশ্বারোহণেই বেড়াতে বেড়াতে আমি দলের লোকের সঙ্গ ছাড়া হয়ে, উত্তরদিকে খানিক দূর এগিয়ে পড়লেম, সেই দিকে সারি সারি অনেকগুলি বড় বড় বৃক্ষ, শেষ বেলায় ছায়া পড়াতে সেই দিক্‌টি দিব্য রমণীয় বোধ হ'ল, অঙ্গে মুহুর্মুহু ঠাণ্ডা হাওয়া লাগতে লাগলো, সর্ব্ব শরীর শীতল হ'ল। বেড়াচ্চি, হঠাৎ দেখি, আমার সম্মুখ দিক থেকে একটি বিবি মৃদু কদমে আমার দিকে এগিয়ে আস্‌ছেন। তিনিও অশ্বারোহণে।

বিবিটি যুবতী, পরমা সুন্দরী, মুখখানি বেশ পুরন্ত, চক্ষু দুটি টানা, ঠোঁট্ দুখানি গোলাপী, ললাট উন্নত, দুইকাণে দুটি নীলমণি দুল, বিবিটি এলোকেশী। মৃদু বাতাসে সেই স্বর্ণ-বর্ণ চুলগুলি ফুর ফুর করে উড়্‌ছিল, বুকের দিকে কতক কতক লোতিয়ে পড়েছিল, দিব্য কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ; সুন্দর অবয়বে সুন্দর কেশের মৃদু কম্পনে, সেই সুন্দর মুখখানির চমৎকার শোভা হয়েছিল।

মৃদু গতিতে অশ্বচালনা করে, সেই বিবিটি অল্প ক্ষণের মধ্যে আমার নিকটে এসে উপস্থিত হলেন। দুটি অশ্বের

মুখে মুখে প্রায় ঠেকাঠেকি হ'ল; দুটি অশ্বই গতিশূন্য হয়ে সেই খানে দাঁড়াল। নূতন বিবিটি এক দৃষ্টে খানিকক্ষণ আমার মুখপানে চেয়ে থাক্‌লেন, তারপর মৃদুস্বরে বল্লেন, পূর্ব্বে যেন তোমাকে আমি কোথায় দেখেছি, দিব্য চেহারা তোমার, মুখের লাবণ্য অতি সুন্দর; দেখলেই ভালবাস্‌তে ইচ্ছা হয়, তোমার সঙ্গে আলাপ কত্তে ইচ্ছা হচ্চে। যদি তোমার কার্য্য হানি না হয়, তা'হলে ঘোড়া থেকে নেবে, তোমার সঙ্গে কিয়ৎক্ষণ ঐ বৃক্ষতলে আমি বস্‌তে চাই।

দুজনেই আমরা নাব্‌লেম, একটী বৃক্ষতলে বস্‌লেম; দুটী ঘোড়াই শান্ত, একটু দূরে তারা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক্‌ল। বিবি আমার একখানি হাত ধরে, পুনর্ব্বার বল্লেন, পূর্ব্বে যেন তোমাকে আমি কোথায় দেখেছি।

আমি উত্তর করলেম, বিচিত্র কি। প্রায়ই আমি এই ময়দানের দিকে আসি, এইখানেই হয়তো দেখে থাক্‌বে।

বিবি। তাই যেন আমার বোধ হচ্চে। এখানে তুমি থাক কোথায়?

আমি। গ্রস্ ষ্ট্রীটের সাত নম্বর বাড়িতে একটী ভদ্রলোক থাকেন, তাঁরই কাছে সেই বাড়িতে আমি থাকি।

বিবি। কত দিন আছ?

আমি। প্রায় দুই বৎসর।

বিবি। সেই ভদ্রলোকটীর নাম কি?

আমি। হোরেস রকিংহাম।

বিবি। (মহা বিস্ময়ে) হোরেস?—ওঃ!—হোরেস রকিং-হাম?—তার সঙ্গে তোমার সম্বন্ধ কি?

আমি। সম্বন্ধ—সম্বন্ধ—সম্বন্ধ এখন—

বিবি। তার সঙ্গে কি তোমার বিয়ে হয়েছে?

আমি। না,—বিয়ে হয় নাই, সে আমাকে বিয়ে কর্‌বে বলেছে।

বিবি। (সবিস্ময়ে) কর্‌বে বলেছে? সাবধান—সাবধান! তার কথায় তুমি ভুল না, মহা বিপাকে ঠেক্‌বেঁ, শেষকালে পস্তাতে হবে।

আমি। (সকৌতূহলে) তুমি কি তাকে জান?

বিবি। (বিকৃত বদনে) জানি বলে জানি! খুব জানি।—ভয়ঙ্কর লোক! বিষম ধড়িবাজ, মিথ্যাবাদি, প্রবঞ্চক, বিশ্বাসঘাতক!

আমি। (উৎকণ্ঠিত হইয়া) এত কথা তুমি কি রকমে জানতে পেরেছ?

বিবি। শুনবে তবে?—না না, সে সব কথা তোমার শুনে কাজ নাই। সাবধান থেকো, এই পর্য্যন্ত আমার উপদেশ। তোমাকে দেখে আমার স্নেহ জন্মেছে, সেই জন্যই সাবধান করে দিচ্ছি। তোমার মুখখানি দেখে আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি, তুমি নিতান্ত ভাল মানুষ,—গোবেচারা, তোমাকে ঠকাতে তার বেশী বিলম্ব হবে না। বড় ভয়ানক লোক!

আমি। (আরও উৎকণ্ঠায়) কি রকম ভয়ানক? কি রকমে তুমি জান্‌লে?—বলছো, অথচ ভাঙ্‌চো না, কারণ কি?—বলছো, সে সব কথা শুনে কাজ নাই। না না, তা হবে না, সব কথা আমি শুন্‌ব,—সব কথা আমাকে জান্‌তে হবে। বল তুমি, হোরেস রকিংহাম কি রকম ভয়ানক? যতক্ষণ না শুন্‌ব,

ততক্ষণ আমার বুকের ভিতর ভীষণ হুতাশন জ্বল্‌বে! বল তুমি—দোহাই তোমার—দোহাই ধর্ম্মের—সব কথাগুলি বল তুমি।

বিবি। (আমার মুখপানে চাহিয়া কি যেন চিন্তা করিয়া) ধর্ম্মের নাম কর্‌ছ, তবে কাজে কাজেই আমায় বল্‌তে হ'ল, কিন্তু দেখ, কাহারও কাছে সে সব কথা গল্প কর না; গল্প নয়, ডাহা ডাহা সত্য কথা। নূতন আলাপে আলাপ নয়, নূতন দর্শনে তোমাকে আমি ভাল বেসেছি, তোমার উপকার কত্তে আমার ইচ্ছা হয়েছে, তোমাকে সৎ উপদেশ দিতে আমার মন চাইছে, তার উপর তুমি আবার ধর্ম্মের নামে দিব্য দিচ্ছো, সুতরাং—

আমি। কোন চিন্তা নাই, কারও কাছে আমি সে সব কথা প্রকাশ কর্‌বো না; ধর্ম্ম সাক্ষী, আমার মুখে সে সব কথার বিন্দু বিসর্গও কেহ শুনতে পাবে না। বল তুমি,—সন্দেহের আগুণে আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্ছে, মিনতি করি, আর দেরি করো না, আর ইতস্ততঃ করো না; শীঘ্র বল, শীঘ্র বল।

বিবি। (চারি দিক চাহিয়া মৃদুস্বরে) সেই হোরেস আমাকে বিবাহ কত্তে চেয়েছিল, অনেক উমেদারি করেছিল, প্রায় তিন মাস পায়ে ধরে কেঁদে ছিল, শেষকালে আমি এক রকম রাজি হয়েছিলাম। (নীরব)

আমি। (ব্যগ্রভাবে ব্যগ্রকণ্ঠে) তারপর—তারপর?

বিবি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) আমি এক রকম রাজি হয়েছিলেম। পিতামাতাকে কিছুই বলি নাই, তাঁদের মত হবে না, সেটা আমি জান্‌তেম, কিন্তু হোরেসকে আমি ভাল

বেসেছিলেম, স্বভাব চরিত্র জানা ছিল না, কেবল চেহারা দেখে আর মিষ্ট কথা শুনে আমার ভালবাসা জন্মেছিল, এক রাত্রে হোরেসের সঙ্গে আমি চুপি চুপি পালিয়ে এসেছিলাম। হোরেস আমাকে লণ্ডনে এনে রেখেছিল। লণ্ডনে আমাদের বাড়ি নয়, ফরাশী দেশে আমার মাতাপিতার বাস, হোরেস আমাকে লণ্ডনবাসিনী করে। কবে বিবাহ হবে, কবে আমায় গির্জ্জায় নিয়ে যাবে, আগ্রহে আগ্রহে রোজ রোজ আমি সেই কথা জিজ্ঞাসা কত্তেম, একটা না একটা ওজর করে, হোরেস ক্রমশঃ দিন গত কত্তে লাগলো, কোর্টসিপ চালাতে লাগলো, পাঁচ ছয় মাস সেই রকম। বিবাহের কথা উঠলেই পাঁচ কথা পেড়ে, হোরেস তখনি তখনি সে কথটা চাপা দিয়ে ফেলতো। এক বৎসর কেটে গেল, বিবাহের নাম গন্ধও শুন্‌তে পেলেম না। এক বৎসর পরে, লজ্জার মাথা খেয়ে, হোরেস হাস্য করে বলেছিল, বিবাহটা কেবল ভণ্ডামী, বিবাহ করা হবে না, নির্জ্জন বাড়িতে তুমি আমার ঘরণী হয়ে থাকবে, আমি তোমার সকল অভাব দূর করবো, প্রাণপণে তোমার মন যোগাব, তুমি আর বিবাহের কথা মুখে এনো না।—হায় হায় রাক্ষসের হাতে আমার কুমারী ধর্ম্মের বিসর্জ্জন হয়েছিল! রাক্ষসের মুখে শেষে সেই নির্ঘাত কথা শুনে, আমি একেবারে দমে গিয়েছিলেম। দুদিন পরে বেশী মাত্রায় মদ খেয়ে, হোরেসটা বেহুঁস হয়ে পড়েছিল, সেই সুযোগে রাতারাতি আমি পালিয়ে আসি। রাক্ষস আমার, পবিত্রতা কলঙ্কিত করেছিল! কেবল আমার নয়, আমার মতন আরও অনেকগুলি কুমারীর সর্ব্বনাশ করেছে! সেই রাক্ষস আজ

পর্য্যন্ত বিবাহ করে নাই; কেবল যুবতী যুবতী কুমারী অন্বেষণ করে বেড়ায়, হাতে পেলেই মাথা খায়। আমি এক বৎসর ছিলাম, কেহ কেহ সাত আট মাস ছিল, তুমি দুই বৎসর আছ, তোমার তারিফ আছে। কিন্তু সাবধান, খুব সাবধান!

আমি। খুব সাবধানেই আমি আছি; বিবাহ কর্‌বার কথা আছে, হোরেস এখনও সেই রকম আভাস জানায়, যখন দেখ্‌বো দমবাজি, তখনই আমি পালাব। হোরেসের স্বভাব চরিত্রের কথা তোমার মুখে আজ আমি যে রকম শুন্‌লেম, তাতে আরও আমার প্রাণে ভয় হ'ল।

বিবি। ভয় হবার কথাই তো বটে। লোক বড় সহজ নয়। যে রকমে আমি পালিয়ে এসেছি, সে রকমে তুমি পারবে কিনা, কেবল আমি তাই ভাবছি। যদি পালাও, পালাতে যদি পার, তবে একবার আমাকে মনে করে আমার তত্ত্ব নিও।

আমি। তুমি থাক কোথায়?

বিবি। লণ্ডনেই আছি।

আমি। এত দূর আলাপ যখন হ'ল, যখন আমি তোমার গুহ্য কথা শুন্‌লেম, তুমিও যখন আমার গুহ্য কথা শুন্‌লে, তখন পরিচয়টি জেনে রাখা দরকার। তোমার নামটি কি?

বিবি। বিবাহের পর স্বামীর নামেই স্ত্রীলোকের পরিচয় হয়, সেই রকম পরিচয়ে এখন আমার নাম মার্শনেস্ হংঙ্গার; বিবাহের পূর্ব্বে আমার নাম ছিল পিথারিন্।

আমি। তোমার বিবাহ হয়েছে নাকি?

বিবি। হাঁ,—হোরেসের চক্রজাল ছিন্ন করে পালিয়ে আস্‌বার পর আমি বিবাহ করেছি। আমার স্বামীর নাম মার্কুইস্

হংঙ্গার। লণ্ডনের মধ্যে তিনি একজন বিখ্যাত লোক, তাঁর পিতা বর্ত্তমান নাই; অনেক টাকার বিষয়।

সন্ধ্যা হয়ে এল। আর তখন বেশী কথা শুনা হ'ল না। লেডী হংঙ্গারকে আমার নামটি জানিয়ে দিয়ে, তাদের বাড়ীর ঠিকানাটি জেনে নিয়ে, তাঁর কাছে আমি বিদায় গ্রহণ কল্লেম। বিদায় কালে লেডী আমার মুখ চুম্বন কল্লেন, আমিও তাঁর মুখ চুম্বন কল্লেম। লেডী তখন তাঁর নিজের অশ্বে আরোহণ করে দক্ষিণ দিকে চলে গেলেন, আমিও আমার অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে শীঘ্র শীঘ্র বাড়ীর দিকে প্রস্থান কল্লেম।

একাদশ তরঙ্গ।

নূতন উমেদার।

দুই মাস অতীত। বাড়ীতে যেমন বন্ধুবান্ধবের আমদানি হয়ে আসছিল, বড় বড় মজ্‌লিসে ইদানীং যেমন আমার নিমন্ত্রণ হয়ে আস্‌ছিল, সেই রকম চল্‌তে লাগ্‌ল। লেডী হংঙ্গারের মুখে যে সব কথা শুনে এসেছিলেম, তার একটি কথাও হোরেসকে বল্লেম না; সব কথাগুলি আমার বুকের ভিতর যেন পাষাণ চাপা থাক্‌ল। এই দুই মাস হোরেসকে আমি বরং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসা দেখাতে লাগলেম। হোরেস আমাকে সঙ্গে করে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যায়, ঘোড়দৌড় দেখাতে নিয়ে যায়, অপেরা হাউসে নিয়ে যায়, হাইড্‌ পার্কে বেড়াতে নিয়ে যায়, বেশ আমোদ আহ্লাদ চলে। এক এক দিন আমরা শকটারোহণে যাই, এক এক দিন অশ্বারোহণে যাই, অনেক রাত্রে ফিরে আসি। নিত্য রাত্রেই আমি এক এক রকম ঠাণ্ডা মদিরা সেবন করি। কোন দিন বিয়ার, কোন দিন সেরী, কোন দিন ক্লারেট, কোন দিন শ্যাম্পীন। হোরেস কেবল ব্রাণ্ডী খায়; এক এক্‌ দিন আমার অনুরোধে শ্যাম্পীন চালায়।

ক্রমে ক্রমে আমার আরও অনেক রকম অলঙ্কার বস্ত্র আমদানি হ'ল, নিত্য নিত্য আমি এক এক রকম নূতন পোষাকে, নূতন জহরতে বাহার দিয়ে, বাড়ী থেকে বাহির হই;

অনেক বড় বড় পদস্থ মহিলা আমার সৌভাগ্য দেখে মনে মনে হিংসা করে, লক্ষণ দেখে সেটা আমি বেশ বুঝতে পারি, কিন্তু গ্রাহ্য করি না।

ঐ রকমে আরও এক মাস। এক দিন প্রাতঃকালে এক জন আর্দ্দালী এসে আমার হাতে দুখানি নিমন্ত্রণের কার্ড দিয়ে গেল। একখানি আমার নামে, আর একখানি হোরেসের নামে। পাঠ করে দেখ্‌লেম, ডিউক ফেসিংটনের বাড়ীতে নাচের মজলিস্, ভোজের মজলিস্, সেই মজলিসে আমাদের নিমন্ত্রণ। যে দিন কার্ড পেলেম, সেই দিন নিশা-কালেই মজলিস্। প্রভাত সমীরণ সেবনের উদ্দেশে হোরেস তখন বেরিয়ে গিয়েছিল, ফিরে আস্‌বার পর, হাজ্‌রে খাবার সময় তারে আমি সেই নিমন্ত্রণের কথা বল্লেম; কার্ড দুখানি আমার পকেটেই ছিল, বাহির করে দেখালেম; হাস্‌তে হাস্‌তে জিজ্ঞাসা কল্লেম, তুমি যাবে ত?

মুখ উঁচু করে আমার মুখে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, গুঞ্জন স্বরে হোরেস উত্তর কোল্লে, তাই ত—আজ রাত্রে আমার হাতে অনেক কাজ, নিমন্ত্রণে আমি যেতে পার্‌বো, এমন আমার বিশ্বাস হচ্চে না; বিশেষতঃ ডিউক ফেসিংটনের বিবাহ হয় নাই, অবি-বাহিত যুবাপুরুষের বাড়ীতে নাচের মজলিস, এ রকম দৃষ্টান্ত অল্পই দেখা যায়। সে রকম মজলিসে নারী সঙ্গে করে উপস্থিত হওয়া সকল বড়লোকে ভালবাসে না। তবে কি না, বড়লোকের ছেলেরা যা মনে করে তাই করে, ফেসিংটনের পিতা নাই, তিনিই স্বয়ং কর্ত্তা। তাঁর কথার উপর কথা কয়, তাঁর কাজের উপর টিপ্‌নি কাটে, তেমন সাহসী লোক অতি

অল্প। আমি বুঝতে পাচ্ছি, অনেক বড় বড় ঘরের মহিলারা সেই মজ্‌লিসে যাবেন, উচ্চ পদস্থ বড় বড় সৌখিন পুরুষেরাও উপস্থিত হবেন; নাচের মজলিসে নানা রকম মজার মজার অভিনয় হয়, সেই জন্যই সৌখিন সৌখিন যুবা পুরুষ আর সৌখিন সৌখিন যুবতী কামিনীরা দলে দলে জমা হয়ে থাকে। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তুমি যেতে পার! তুমি নাচ্‌তে শিখেছ; ডিউক যদি তোমাকে নাচ্‌তে বলেন, লজ্জা কর না— যার সঙ্গে নাচ্‌তে বলেন, সপ্রতিভ হয়ে তাঁরি সঙ্গে তুমি নেচো, আমার তাতে কোন আপত্তি নাই। তিনি আমার অনেক দিনের বন্ধুলোক, তুমি যদি তাঁর অনুরোধ অগ্রাহ্য কর, তা'হলে দোষ হবে,—তিনি অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হবেন। অনুরোধে তুমি অনাদর করো না, অন্যান্য সুন্দরীরা যেমন অপর পুরুষের সহ আলিঙ্গন করবেন তালে তালে নৃত্য করবেন, তুমিও সেই রকমে তাঁদের দৃষ্টান্তের অনুসরণ করো। আমি যেতে পার্‌বো না, আমার অবসর হবে না, সেই ভাবে একখানি পত্র লিখে, তাঁর কাছে আমি ক্ষমা চাইব।

পরিহাস কিম্বা সরল উক্তি, সেইটি পরীক্ষা কর্‌বার জন্য প্রায় পাঁচ মিনিট আমি নির্ণিমেষ নেত্রে হোরেসের মুখপানে চেয়ে থাক্‌লেম; কপটতা কি সরলতা, মুখের ভাব দেখে সেটা আমি ঠিক ঠাওরাতে পারলেম না; সংশয়ে সংশয়ে, কৌতুকে কৌতুকে, কৌতূহলে কৌতূহলে, মৃদুস্বরে আমি বলেছিলেম, তোমাদের সহরের বড় বড় লোকের নাচের মজলিস্ পূর্ব্বে আমি কখনও দেখি নাই। সম্প্রতি তোমার গৌরবে কয়েকটা মজলিসে আমার নিমন্ত্রণ হয়েছিল, আমি গিয়েছিলাম; ভদ্র-

লোকের মেয়েরা বাজারের নর্ত্তকীদের মতন হাব ভাব দেখিয়ে লম্ফে লম্ফে নৃত্য করে, তাই দেখে আমার কেমন লজ্জা এসেছিল; বাজারের নর্ত্তকীরা বরং একা একা নাচে, কিন্তু ভদ্রলোকের মেয়েরা পর পুরুষের বাহু অবলম্বনে হাঁসতে হাঁসতে নেচে যায়, এটা তোমাদের সভ্যতার অঙ্গ; তার উপর আমার টীকা চল্‌বে না; যে কয়েকটি নাচের মজলিসে আমি উপস্থিত ছিলেম, তার একটি মজলিসেও কেহ আমাকে নাচ্‌তে বলেনি; আজকের মজলিসে সে রকম অনুরোধ যদি পড়ে, তা'হলেও লজ্জার খাতিরে হয়তো আমি নাচতে পার্ব্বো না।

হাস্য করে হোরেস বলেছিল, বন্ধুলোকের উৎসবে, ভদ্রলোকের মজলিসে লজ্জা কল্লে চল্‌বে না; বিবিরা তোমাকে ঠাট্টা কর্‌বে, অসভ্য বলে ঘৃণা কর্‌বে, সেটা কি তোমার পক্ষে ভাল হবে? এত দিন ধরে তোমাকে যে আমি পাখীর মতন পড়ালেম, এত রকম শিক্ষা দিলেম, তাতে কি তোমার এই রকম বিদ্যা হ'ল? তাতে কি তুমি এই রকম সভ্যতা শিক্ষা করেছ? না না,—সে রকম কাজ করো না,—মাথা হেঁট হবে;—তোমারও হবে, আমারও হবে। সরল প্রাণে তোমাকে আমি বল্‌ছি, তুমি যেও, ডিউক্ যদি অনুরোধ করেন, মনে কোন প্রকার দ্বিধা না রেখে, চক্ষে কোন প্রকার লজ্জা না রেখে, স্বচ্ছন্দে তুমি নেচো। উৎসবের নৃত্য সভায় ভদ্র মহিলারা বাজারের নর্ত্তকীদের মতন নর্ত্তকী হন, সেটা আমাদের দেশের প্রথা; সে প্রথার সঙ্গে লজ্জার কোন প্রকার সম্বন্ধই নাই।

হাজ্‌রে খানা সাঙ্গ হ'ল, সে ঘর থেকে আমরা বেরিয়ে

এলেম; হোরেস আবার নূতন রকম পোষাক পোরে, হাতে একটা কৃষ্ণবর্ণ চামড়ার ব্যাগ্ নিয়ে, তাড়াতাড়ি বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল; আমাকে বলে গেল, যদি তোমার ইচ্ছা হয় স্বচ্ছন্দে তুমি নিমন্ত্রণ রক্ষা কত্তে যেও; আমার অনুমতি থাকলো; কুচ্ পরোয়া নেই। সিলভিয়াকে যদি সঙ্গে নিতে ইচ্ছা কর, তাও নিতে পার।

হোরেস বেরিয়ে গেল। আমি আমাদের শয়ন ঘরে একাকিনি বসে বসে মনে মনে সেই সব কথা আলোচনা কত্তে লাগ্লেম; আলোচনায় মীমাংসা দাঁড়ালো, যাওয়াই ভাল। অনেক রকমের বন্ধু আমাদের বাড়ীতে আসেন, কিন্তু সকলের চেয়ে ডিউক ফেসিংটনকে আমার পছন্দ হয়েছে; লক্ষণে বুঝেছি, তিনিও আমাকে ভালবাসেন, তাঁর নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করা হবে না। রাত্রি দশটার সময় মজলিস, এক ঘণ্টা পূর্ব্বেই আমি যাব।

মনে মনে এই সঙ্কল্প স্থির করে, সিলভিয়াকে আমি নিকটে ডাকৃলেম, কার্ড দেখিয়ে নিমন্ত্রণের কথা বল্লেম, তাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে, সেই রকম অনুরোধও জানালেম। ক্ষণকাল চুপ করে থেকে, সিলভিয়া জিজ্ঞাসা কল্লে, মাষ্টার যাবেন না?—প্রশ্নের ভাবে যেন একটু গূঢ়ত্ব বুঝা গেল, মাষ্টারের মুখে যে রকম ওজরের কথা আমি শুনেছিলেম, সংক্ষেপে সেই কথা বলে, সিলভিয়ার গূঢ় প্রশ্নের যথাযোগ্য সদুত্তর দিলেম। আবার কি একটু চিন্তা করে, সিলভিয়া অবশেষে আমার সঙ্গে যেতে স্বীকার কল্লে।

সমস্ত দিনের মধ্যে হোরেস আর বাড়ীতে এল না; রাত্রি আটটা বেজে গেল, তখনও এল না;—বেশী কাজ আছে বলে-

ছিল, আস্‌তে হয়তো বেশী রাত্রি হবে, কিম্বা হয়তো আস্‌বেই না; যেখানে গিয়েছে, সেইখান থেকেই হয়তো ক্ষমা প্রার্থনার চিঠিখানা ডিউকের বাড়ীতে পাঠাবে, এইরূপ আমি অনুমান কল্লেম। সিলভিয়াকে ডাকি ডাকি মনে কচ্ছি, ডাকৃতে হলো না;—সিলভিয়া নিজেই ঠিক সেই সময়ে সেই ঘরে এসে উপস্থিত। আমি তার মুখপানে চেয়ে জিজ্ঞাসা কুল্লেম, আমি নিমন্ত্রণে যাব, তুমি আমার সঙ্গে যাবে, বাড়ীর কিঙ্কর কিঙ্করীগণকে সে কথা জানানো হয়েছেতো?

সিল্‌ভিয়া উত্তর কল্লে, হয়েছে। আপনাকে পোষাক পরিয়ে দিই; একটু আগে থাকৃতে যাওয়াই ভাল। মাষ্টার আস্‌বেন না; নটার সময় গাড়ী প্রস্তুত কর্‌বার জন্য কোচ-মানকে আমি হুকুম দিয়ে রেখেছি, আমি প্রস্তুত হয়ে এসেছি, আপনি প্রস্তুত হউন।

সমস্ত পোষাকগুলির মধ্যে যে পোষাকটি খুব ভাল, যে গহনাগুলি খুব জম্‌কালো, সিলভিয়া আমাকে সেই পোষাকটি পরিয়ে, সেই বহুমূল্য অলঙ্কারগুলি দিয়ে ভাল করে সাজিয়ে দিলে। যথার্থই হোরেস এলো না; রাত্রি নটা বেজে গেল; সিলভিয়াকে সঙ্গে নিয়ে আমি উপর থেকে নেমে এলেম; গাড়ী প্রস্তুত হয়েছিল, গাড়ীতে আমরা আরোহণ কল্লেম; গাড়ী গড়গড় শব্দে ডিউক কেশিংটনের প্রাসাদাভিমুখে দ্রুত-বেগে চল্লো। দুখানি কার্ডের মধ্যে আমার নিজ নামের কার্ডখানি আমার সঙ্গে থাকৃলো।

ডুকাল অট্টালিকার গাড়ী বারণ্ডার নীচে আমাদের গাড়ী গিয়ে পৌঁছিল; গাড়ী থেকে নেমে, সিলভিয়ার হাত ধরে,

আমি বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কল্লেম। বাড়ীখানির ভিতর বাহির বিচিত্র আলোকমালায় সমুজ্জ্বল। আমরা উপরের সিঁড়ির সোপানাবলী অতিক্রম করে দোতলায় উঠতে লাগলেম; সোপানের শোভাও বড় সুন্দর;—একটি সোপানে লাল বনাত মোড়া, তার পরের সোপানটি নানাবর্ণের কার্পেট মণ্ডিত; এইরূপ একটি একটি অন্তর এক এক বর্ণে সজ্জিত; সিঁড়ির রেলের উপর সারি সারি চিনের পুঁতুল, মাঝে মাঝে এক একটি বিবিধ বর্ণের ফুলদান;—পুঁতুলগুলির মধ্যে কাহারও হস্তে প্রজ্জলিত বাতিযুক্ত বিচিত্র ফানোষ;—কোনটি শ্বেতবর্ণ, কোনটি পীতবর্ণ, কোনটি নীলবর্ণ, কোনটি সবুজবর্ণ, কোনটি লোহিত বর্ণ, কোন কোনটি গোলাপী;—এক একটি পুঁতুলের হস্তে বড় বড় ফুলের তোড়া; সকলের গলাতেই সুন্দর সুন্দর ফুলের মালা; ফুলদানগুলিতেও নানাপ্রকার সুগন্ধি কুসুম;—সৌরভে চতুর্দ্দিক আমোদিত।

শোভা দেখতে দেখতে আমরা উপরে গিয়ে উঠলেম; নরনারী কণ্ঠনিঃসৃত সরু মোটা অনেক রকম আওয়াজ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ কত্তে লাগল। যে ঘরে নৃত্য সভা, সেই ঘরের দরজার ধারে আমরা গিয়ে দাঁড়ালেম। সভাগৃহের সজ্জা ও রোসনাই অনির্ব্বচনীয়; বোধ হলো যেন, গৃহমধ্যে শত শত চন্দ্রের উদয়;—কেবল বাতীর আলোতেই চন্দ্রোদয় বোধ হয়েছিল, তা নয়, উপস্থিত কামিনীমণ্ডলীর সুন্দর সুন্দর মুখগুলিও যেন এক একটি পূর্ণচন্দ্র। শতাধিক সুসজ্জিত সৌখিন সৌখিন সাহেব-বিবি।

দরজার নিকটেই গৃহস্বামী ডিউক বাহাদুর দণ্ডায়মান

ছিলেন; আমাকে দেখতে পেয়েই অগ্রসর হয়ে, পরম সমাদরে তিনি অভ্যর্থনা কল্লেন; ঠিক আমার পাশেই ছিল সিলভিয়া, তার দিকে একবার কটাক্ষপাত করে, কৌতুকী নয়নে তখনি তিনি আমার দিকে চাইলেন। অভি-প্রায় বুঝতে পেরে তৎক্ষণাৎ আমি বল্লেম, আমার সহচরী।

সহাস্য বদনে আমার হস্তধারণ পূর্ব্বক ডিউক বাহাদুর আমাকে একটি পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। সে ঘরটিও বেশ সাজান;—কয়েকখানি চেয়ার, কয়েকখানি সোফা, দুখানি কৌচ, মাঝখানে শ্বেত পাথরের একটি গোলাকার টেবিল। ডিউক আমাকে একখানি সোফার উপর বসিয়ে, নিজেও একটু তফাতে উপবেশন কল্লেন; একটু দূরের একখানি চেয়ারে সিলভিয়া।

দুটি একটি ছোট ছোট কথা হবার পর, সহসা ডিউক একবার গাত্রোত্থান কল্লেন; পুষ্পাধার থেকে ছড়া কতক পুষ্পমাল্য গ্রহণ করে আমার কণ্ঠদেশে দুলিয়ে দিলেন, সিলভিয়াকেও দুই ছড়া অর্পণ কল্লেন, সুস্নিগ্ধ সুবাসিত গোলাপ জলে আমাদের মস্তক ও গাত্রবস্ত্র ভিজিয়ে দিলেন, আমার হস্তেও ছোট একটি ফুলের তোড়া প্রদান কল্লেন; এই সকল কার্য্য সমাধান করে, আবার তিনি আমার কাছে এসে বসলেন। সিলভিয়ারের দিকে একবার চেয়ে, মিষ্ট সম্ভাষণে আমাকে তিনি বল্লেন, মিষ্টার হোরেস আসতে পারবেন না, আমি তাঁর চিঠি পেয়েছি; কার্য্যান্তরে তিনি ব্যস্ত আছেন, অবকাশ হবে না। চিঠি পেয়ে আমি দুঃখিত

হয়েছিলেম, কিন্তু তুমি এসেছো, এখন আমার সে দুঃখ দূরে গিয়ে পরম সন্তোষের সঞ্চার হলো।

সে ঘরে তখন আর কেহ ছিল না, কেবল আমরা তিন জন;—প্রফুল্ল নয়নে আমার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করে, ডিউক একটু হাস্‌লেন; মিষ্ট বচনে সিল্‌ভিয়াকে বল্লেন, কিয়ৎক্ষণ তুমি এই ঘরে বসে থাকো, শীঘ্রই আমরা আস্‌ছি। যে ঘরে আমরা বসেছিলেম, সেই ঘরের পশ্চিমদিকে আর একটী ছোট ঘর; সিলভিয়াকে ঐকথা বলে, ডিউক আমাকে সেই ছোট ঘরে নিয়ে গেলেন, ঘরের দরজা ভেজিয়ে দিয়ে, আমার হস্ত-ধারণ করে, দুই মিনিট তিনি আমার মুখপানে চেয়ে থাক্‌লেন; ভাব কিছু আমি অনুভব কর্ত্তে পার্‌লেম না; দুজনে আমরা একখানি সোফার উপরে বসলেম। মৃদুহাস্য করে ডিউক তখন বল্লেন, নাচের মজ্‌লিস্, যে পোষাকে তুমি এসেছো, নাচের মজলিসের যোগ্য পোষাক এ রকম নয়; বুঝ্‌লে কিনা?—সভায় তোমাকে নাচ্‌তে হবে; আমি তোমাকে নাচের পোষাক পরিয়ে দিতে ইচ্ছা করি, কি বল?

মাথা হেঁট করে আমি নীরব হয়ে থাক্‌লেম। আমার জানা হয়েছিল, নৃত্য সময়ে নাচের পোষাক অন্য প্রকার; ফ্যান্সি ড্রেস্,—সে পোষাকে নারীজাতির লজ্জা সম্ভ্রমের ব্যাঘাত হয়, কিন্তু দেশের সামাজিক ব্যবহার,—যাহারা নাচে, তাহাদের লজ্জা হয় না; আমি কিন্তু লজ্জাবশে ডিউকের কথায় কোন উত্তর দিতে পারলেম না।

মৌনই সম্মতি জানায়, ডিউক বাহাদুর আমার মৌনকেই সম্মতি লক্ষণ স্থির কর্‌লেন। পকেটের ঘড়ি খুলে দেখে, আপন

মনে চুপি চুপি বল্লেন যথেষ্ট সময়,—এই সবে সাড়ে নটা,—এখনও আধ ঘণ্টা বাকী। এই কথা বলেই তিনি একবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, একটু পরেই সিলভিয়াকে সঙ্গে করে ফিরে এলেন; ডিউকের হাতে একটি রং করা বাক্স। তাঁরা উভয়েই ভিন্ন ভিন্ন আসনে বসলেন। বাক্সটি খুলে এক স্যুট নাচের পোষাক বাহির করে হাসতে হাসতে ডিউক বাহাদুর আমাকে বল্লেন, এই নাও, এই ধরো, এই কাপড় পরো। আমি তোমাকে পরিয়ে দিতে পাত্তেম, কিন্তু আমার হাতে পোষাক পত্তে হয়তো তুমি লজ্জা পাবে, তাই ভেবে তোমার সহচরীকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।

ডিউক বাহাদুর আমার হাতে সেই পোষাকটি দিয়ে, শিস্ দিতে দিতে সভাগৃহের দিকে চলে গেলেন; সিলভিয়া আমাকে নাচের পোষাক পরিয়ে দিল। সবে মাত্র আমার পোষাক পরা হয়েছে, এক মিনিট পরেই ডিউক আবার আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান; চেয়ে চেয়ে ফুল্লবদনে বল্লেন, বাঃ! বেশ মানিয়েছে! তোমার মতন সুন্দরীর অঙ্গে ফ্যান্সী ড্রেস বেশ মানায়! যাও দেখি, একবার ঐ দর্পণের কাছে দেখ দেখি, তোমার নূতন রূপখানি; আমি দেখছি যেন, চিত্র করা ছবিখানি। দর্পণে প্রতিবিম্ব দর্শন করে, তুমি এখন তোমার নিজের রূপের তারিফ কর।

লজ্জাকে মনের ভিতর রেখে, অনিচ্ছায় আমি ডিউকের অনুরোধ পালন কল্লেম। সেই ঘরের দেওয়ালে বৃহৎ একখানি দর্পণ ছিল, সেই দর্পণের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম, দর্পণের ভিতর আমার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত ছায়া দেখা গেল;

মুখ ফিরিয়ে মৃদু মৃদু হেসে, তখনি আমি সেই সোফায় এসে বসলেম। ডিউক আবার আমার নূতন রূপের তারিফ কল্লেন; তিনি তখন বসলেন না, দ্বারের দিকে মুখ ফিরিয়ে, যেন কোন লোকের প্রবেশ প্রতীক্ষা করে রইলেন; দুই মিনিট পরেই সত্য সত্য একজন লোক এল;—লোকের হস্তে একটি পেটিকা। টেবিলের উপর সেই পেটিকাটি রেখে, আমাদের তিন জনকে সেলাম দিয়ে, লোকটি খুব শীঘ্র বেরিয়ে গেল।

লোকটি বেরিয়ে যাবার পর ডিউক বাহাদুর টেবিলের সম্মুখে একখানি বৃহৎ চেয়ারে উপবেশন কল্লেন, সন্তর্পণে পেটিকাটি খুললেন, অনেকগুলি উপকরণ বাহির হলো। আমাকে আর সিলভিয়াকে তিনি কিঞ্চিৎ জলযোগ করবার আমন্ত্রণ কল্লেন, রজতপাত্রে নিজ হস্তে জলযোগের সামগ্রীগুলি সাজিয়ে দিয়ে, আমার সম্মুখে ধরে দিলেন। অনুরোধ এড়াতে না পেরে, আমরা সেই সকল উপাদেয় জিনিস কিছু কিছু উপযোগ কল্লেম, তিনি নিজে কিছুই গ্রহণ কল্লেন না। বড় ঘরের বিবিদের প্রধানা সহচরীরা সচরাচর লেডির মতন মান পায়; কর্ত্তা গৃহিণী কিম্বা বন্ধুলোকেরা সকলেই সেই সকল সহচরীর সহিত সমান ব্যবহার করেন; সিলভিয়ার সম্মুখে ডিউক বাহাদুর কোন রকম পুসিদা রাখলেন না, স্যাম্পীনের বোতল খুলে তিনটি গেলাস পরিপূর্ণ করলেন, দস্তুর মত শিষ্টাচারে আমাদের প্রতি গেলাসের সঙ্গে সদালাপ করবার অনুরোধ জানালেন; আমরা সে অনুরোধটিও রক্ষা করলেম; তিনি নিজেও তাঁর নিজের গেলাসের সমুচিত সমাদর করলেন।

সভাগৃহে ঠং ঠং করে তিনবার ঘণ্টা ধ্বনি হলো। চেয়ার থেকে উঠে, ডিউক বাহাদুর আমাকে বল্লেন, সত্বর হও, সময় হয়েছে, কার্য্য আরম্ভের ঐ ঘণ্টা ধ্বনি।

আমি তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেম, সিলভিয়াও দাঁড়াল। ডিউক বাহাদুরের বাহু অবলম্বন করে, ধীরে ধীরে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আমি নৃত্য সভায় প্রবেশ কল্লেম, সিলভিয়াও সঙ্গে সঙ্গে গেল, নিষেধ নাই। যারা যারা নাচে, তারাও যেমন যায়, যারা যারা দেখতে যায়, তারাও তেমনি যেতে পারে। সিলভিয়াও দর্শনের পিপাসিনী।

নৃত্য আরম্ভ হলো। জোড়া জোড়া নাচ। একটি সাহেব একটি বিবির একত্রে নাচ। যাঁরা যাঁরা নাচলেন, তাঁদের তিন জনকে আমি চিনলেম, সব জোড়াগুলিকে আমার জানা ছিল না। সকল গুলিকে চিনতে পারলেম না। শেষবারে আমার পালা। বাড়ীর কর্ত্তা ডিউক ফেশিংটন আমাকে বগলে করে নাচতে আরম্ভ করলেন; আমি বেশ তালে তালে পা ফেলে মজলিসের মান রক্ষা করলেম। আমাদের দেশের নাচ কিন্তু ভাল নয়,—লম্ফন, উল্লম্ফন, কুন্দন, এই রকম নাচের ঘটা। যা হ'ক, যতদূর আমি শিখেছিলেম, ততদূর নৈপুণ্য দেখিয়ে আমি বেশ নাচলেম। আমাদের নাচের কিন্তু নাম অনেক,—একটা নাম পল্‌কা;—সেই পল্‌কা নাচে আমি খুব পটু হয়েছিলেম, সেই নাচেই অনেকের মুখে আমি বাহাদুরী পেলেম।

আমার পালা সাঙ্গ হবার পর আর এক জোড়া সাহেব বিবি আসর গ্রহণ কল্লেন; তাঁরা নাচতেছেন, সেই দিকে

আমি চেয়ে আছি, সেই সময় আমার পশ্চাৎদিকে পাঁচ সাতটি বিবির পরস্পর কাণাকাণি কথা আমার কাণে গেল। একজন বলছিল, ঐ মেয়েটি কে?—মেয়েটি খুব ভাগ্যবতী; এত বড় একজন ডিউক ওকে বেশ সমাদর করে, এক সঙ্গে নৃত্য কল্লেন। আর একজন বলছিল, হয়তো কোন বড় লোকের কন্যা, হয়তো কোন বড় লোকের ঘরণী, তা না হলে কি এত দূর মান পেতে পারে? বিবিরা সকলেই এক এক রকম অনুমান কল্লে! তার পর তাদের খুব চুপি চুপি কথা; সে সব কথা আমি ভাল রকম বুঝতেই পারলেম না। বোধ হলো, যেন কেহ কেহ আমার কিছু পরিচয় প্রকাশ করে দিলে।

সে দিকে আমি আর বড় একটা মনযোগ রাখলেম না; মজলিস ভঙ্গ হয়ে গেল, নিশাভোজের আয়োজন; ভিন্ন ভিন্ন টেবিলে সকলেই ভোজন করলেন; মদের চলাচলি খুব চল্লো। সকলেরই যানবাহন ছিল, ভোজনান্তে কর্ম্মকর্ত্তাকে ধন্যবাদ দিয়ে সকলে বিদায় হলেন; আমি আর সিলভিয়া পেছিয়ে পড়লেম।

সিলভিয়া আগে যে ঘরে বসেছিল; সেই ঘরে তাকে বসিয়ে, ডিউক আমাকে অন্য ঘরে নিয়ে গেলেন। যেটা আমার সাজ ঘর হয়েছিল, সে ঘর নয়, বৈঠকখানার প্রান্তভাগে আর একটা নির্জ্জন ঘর। সে ঘরটিতেও উজ্জ্বল রোসনাই, চেয়ার টেবিল ছিল না, দুই তিন খানি সোফা ছিল; একখানি সোফায় ডিউক আমাকে বসালেন; এক সঙ্গে নেচেছি, আর তখন সমিহ করবার হেতু ছিল না, দিব্য ঘনিষ্ঠভাবে তিনি আমার ঠিক পার্শ্বেই বসলেন। আর একবার একটু

একটু স্যাম্পীন খাওয়া হলো। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাঁচ রকম কথা প্রসঙ্গে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লেন, মিসেস্ হোরেস! তোমার বিবাহ হয়েছে কত দিন? লজ্জায় আমি অধোমুখী। মনের মধ্যে কেমন এক রকম কষ্টের আবির্ভাব; কষ্টের উদয়ে আমার মুখখানি তখন হয়তো মলিন হয়ে থাকবে, তাই দেখে সন্দেহক্রমে ডিউক আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, কেন সুন্দরি? অকস্মাৎ কেন তোমার এমন ভাব? বিবাহের কথায় তোমার মুখখানি মলিন হলো কেন? আমার কথায় কোন উত্তর দিচ্ছ না কেন?

নতমুখেই মৃদুস্বরে আমি উত্তর করলেম, আপনি আমাকে মিসেস্ হোরেস বলে সম্বোধন করেছেন, সেই সম্বোধন শুনে আমার প্রাণে কেমন একটু আঘাত লেগেছে, এখনও আমি মিসেস্ হোরেস হই নাই; বিবাহের কথা আছে, কিন্তু এখনও বিবাহ—

বিস্ময় প্রকাশ করে ডিউক বলে উঠলেন, সে কি?—এখনও তোমার বিবাহ হয় নাই? হোরেস কিন্তু আমাকে বলেছিল, তুমি তার বিবাহ করা পত্নী।

কুণ্ঠিত না হয়ে পূর্ব্বরূপ মৃদুস্বরে আমি বলেছিলেম, লোকের কাছে সে ঐ রকম বলে বেড়ায়, কিন্তু সত্যকথা তা নয়; আমাকে কেবল স্তোক দিয়ে দিয়ে রাখে, কপটতা করে প্রবোধ দেয়, হবে হবে বলে আশ্বাস দিয়ে দিন গত করে। আপনার কাছে কোন কথা গোপন রাখা আমার কর্ত্তব্য হয় না, কারণ আপনার উপর আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জন্মেছে; হোরেসের কথা আমি গোপন রাখব না। ইতি-

মধ্যে একদিন আমি বিবাহের কথা উত্থাপন করেছিলেম, মুখ চক্ষু ঘুরিয়ে তাচ্ছিল্যভাবে সে বলেছিল, বিবাহটা ভণ্ডামি। বিবাহ করা বোধ হয় তার ইচ্ছা নয়?

পুনরায় বিস্ময় প্রকাশ করে, ডিউক বলেছিলেন, ইচ্ছা নয়, বল কি?—হোরেস তোমাকে বিবাহ কত্তে চায় না?—তবে তুমি তার কাছে কেন আছ?

ইচ্ছা না থাকলেও আমি উত্তর করেছিলেম, সে আমাকে লণ্ডনে এনেছে, যত্ন করে রেখেছে, মুখে মুখে ভালবাসা জানাচ্ছে, সুখ ভোগের নানা রকম সামগ্রী উপহার দিচ্ছে, মাঝে মাঝে বিবাহ করবারও আশ্বাস দিচ্ছে, সেই জন্যই—

শেষ কথা না শুনেই আমার মুখপানে চেয়ে ডিউক বলেছিলেন, ছি—ছি—ছি! হোরেসের এমন দুর্বুদ্ধি?—এমন রূপবতী তুমি, এমন রসিকা তুমি, এমন মজলিসী তুমি, এমন মধুর ভাষিণী তুমি, এমন সুশীলা শান্ত প্রকৃতি তুমি, হোরেস তোমাকে বিবাহ কত্তে চায় না?—এমন সরলা তুমি, তোমার সঙ্গে দমবাজি খেলাচ্ছে? ওঃ! ঠিক কথা! জানি আমি তার স্বভাব, সে কেবল সুন্দরী সুন্দরী যুবতী কুমারিদের সঙ্গে ফাঁকা ফাঁকা প্রেম করবার যোগাড় দেখে বেড়ায়, দম দিয়ে দিয়ে মজা করে;—তা করুক, এ সহরের অনেক ধনী লোকের সন্তানেরা ঐ রকম দমের খেলা খেলে থাকে, সেটাতে আমি বড় একটা দোষ ধরি না; কিন্তু তোমার মতন সুন্দরীকে তোমার মতন গুণবতী সরলাকে দম দিয়ে রাখছে, কপটতা খেলাচ্ছে, এই কথা শুনে তার উপর আমার ঘৃণা জন্মাল।

হঠাৎ আমার চক্ষে বিন্দু বিন্দু অশ্রু দেখা দিল; ডিউককে আমি সে অশ্রু দেখতে দিলেম না, সজলনয়নে অধোমুখে নিজের বুকের দিকে চেয়ে, একটু কম্পিতকণ্ঠে আমি বলেছিলেম, তাই ত হচ্ছে, সর্ব্বদা তাই ত আমি দেখছি; লক্ষণটা ভাল বোধ হচ্ছে না। সে যদি আমাকে ঐ রকমে আরও কিছুদিন মিথ্যা দমে ফেলে রাখে, যদি আমাকে আর বেশী দিন তার ভাল না লাগে, সে যদি আমায় পরিত্যাগ করে, তখন আমি কোথায় যাব? কার কাছে গিয়ে দাঁড়াব? কে আমাকে আশ্রয় দিবে? সর্ব্বক্ষণ তাই আমি ভাবি।

ডিউক কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন; মনে মনে কি যেন কল্পনা করে, আমার কাছে আর একটু ঘেঁসে বসে, আদরের স্বরে বল্লেন, তার জন্য ভাবনা কি? তুমি পরমা সুন্দরী, ভালবাসা কারে বলে, তা তুমি বেশ জান, তোমাকে আশ্রয় দিবার লোকের অভাব? না না,—আশ্রয়ের জন্য তুমি ভেব না।—এই পর্য্যন্ত বলে, আবার একটু থেমে, পুনরায় তিনি আরম্ভ করলেন, আচ্ছা আমারও বিবাহ হয় নাই, আমি যদি তোমাকে একটি কথা বলি, তাতে কি তুমি দোষ ধরবে? আমাকে বিবাহ কত্তে কি তোমার ইচ্ছা হয়?

আমার সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠলো, বুকের ভিতর যেন বিদ্যুৎ চমকে গেল, মুখ দিয়ে একটি কথাও বেরুল না; যেমন অধোমুখে ছিলেম, সেই রকমেই নীরব হয়ে বসে থাকলেম। কি জানি, আমাকে মৌনবতী দেখে, আমার দিকে আর একটু সরে এসে আস্তে আস্তে আমার গলা জড়িয়ে ধরে, ডিউক বাহাদুর আমার অধোবদনে সস্নেহে তিনটি চুম্বন কল্লেন।

আমি শিউরে উঠলেম। ডিউক বল্লেন, আমার কথাটা কি তোমার ভাল লাগলো না? আমার কথার উত্তর দিতে তোমার কি ইচ্ছা হচ্ছে না? আমাকে বিবাহ কত্তে কি তোমার কোন বিশেষ আপত্তি আছে? আমি একজন ডিউক, আমাকে যদি তুমি বিবাহ কর, তা হলে এই মহানগরী মধ্যে তুমি একটী মান্যবতী ডচেশ হবে, লোকে তোমাকে লেডি বলে সসম্ভ্রমে সম্ভাষণ করবে, তোমার সম্মুখে দাঁড়িয়ে সর্‌পট্ কথা কইতে অপর সাধারণের সাহস হবে না; প্রচুর ঐশ্বর্য্য তোমার অধিকারে আসবে। আমি তোমার আজ্ঞাকারী হয়ে থাকৃব। বেশ বুঝতে পাচ্ছি, হোরেস তোমাকে বিয়ে কত্তে রাজি হবে না, তার মৎলব সে রকম নয়। বৃথা তুমি হোরেসের আশায় আশায় তার অধীন হয়ে থেকে কেন আর ক্রমাগত কষ্ট পাবে? আমি তোমার রূপসাগরে ডুবে গেছি, আমি তোমার গুণ সাগরে মজে গেছি, দয়া করে আমাকে পরিত্রাণ কর।

সোহাগে সোহাগে এই সব কথা বলে, ডিউক আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে, পুনর্ব্বার প্রেমাদরে চুম্বন কল্লেন। আমার বুক কেঁপে উঠলো। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, অপর লোকের দেখবার সম্ভাবনা ছিল না, সেইটী স্থির জেনে, আমি তাঁর আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হবার চেষ্টা কল্লেম না; দিব্য স্থির হয়ে বসে থাকলেম।

উৎসাহ পেয়ে, আরও উত্তেজিত ভাবে, ডিউক অবশেষে বল্লেন, ধন্য পরমেশ্বর! বল—বল প্রিয়তমে! কি রকম তোমার ইচ্ছা, আমার প্রতি সদয় হয়ে, খোলসা কথায় সেইটি আমাকে বল। দয়া কত্তে পারবে কিনা, পরিত্রাণ কত্তে পারবে কিনা,

তোমার ঐ চন্দ্রবদনে আমি কেবল সেই নিশ্চিৎ কথাটি শুন্‌তে চাই।

খানিকক্ষণ আমি কোন উত্তর দিতে পার্‌লেম না, অনেক রকম ভাবলেম, মনের ভিতর অনেক কথা তোলাপাড়া করলেম, অবশেষে অবনতমুখে মৃদুবচনে বল্লেম, আজ আমি আপনার কথার চূড়ান্ত জবাব দিতে পাচ্ছিনা, প্রশ্ন বড় গুরুতর, অবসর কালে বিশেষ বিবেচনা করা আবশ্যক, অনুগ্রহ কোরে আপনি আমাকে সাতটি দিন সময় দিন; সাতদিন পরে এইখানে এসে, আমি আমার মনের কথা আপনাকে জানিয়ে যাবো। সিলভিয়া অনেকক্ষণ অপেক্ষা কোরে বসে রয়েছে, রাত্রিও অধিক হয়েছে, আজ আমি বিদায় হই।

তৃতীয়বার চুম্বন কোরে, বাহু বেষ্টন থেকে ডিউক আমাকে ছেড়ে দিলেন; দরজা খুলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে অন্য ঘরে প্রবেশ কোরলেন। সেই ঘরেই সিল্‌ভিয়া ছিল। পুনর্ব্বার বিদায় গ্রহণ কোরে, সিল্‌ভিয়ার সঙ্গে আমি উপর থেকে নামলেম। ডিউকটিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসে, আমাকে গাড়ীতে তুলে দিয়ে গেলেন। আমরা ত্বরান্বিত হোয়ে বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছিলেম। যখন পৌঁছিলেম, রাত্রি তখন প্রায় একটা।

দ্বাদশ তরঙ্গ।

আমি আর হোরেস।

হোরেস সে রাত্রে বাড়ীতে আসে নাই। আমি একাকিনী শয়ন কোরে, আদরে আদরে নিদ্রা দেবীকে আহ্বান কোরলেম; নিদ্রার সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না। তত রাত্রি পর্য্যন্ত জেগে এসেছিলেম, দুই তিনবার স্যাম্পীন খেয়েছিলেম, তথাপি নিদ্রা আমার প্রতি দয়া কোরলেন না। মনে যার অকপট সুখ নাই, নিদ্রা না হলেই অনেক প্রকার চিন্তা তার সঙ্গিনী হয়। আমার মনেও তখন অনেক প্রকার চিন্তা এলো। পিতামাতাকে মনে পড়লো, সহোদর সিরিলকে মনে পড়লো, যে বাড়ীতে মানুষ হয়েছি, সেই বাড়ীখানি মনে পড়লো, ভালবাসার বিড়ালিটিকেও মনে পড়লো,—যে রাত্রে সিরিল বাড়ী থেকে পালান, সেই রাত্রে আমাকে বলেছিলেন, তুমিও পালিও, যে কোন সাধু লোকের 'আশ্রমে আশ্রয় পাবে, সেই আশ্রমের ঠিকানা জানিয়ে, লণ্ডনের বিখ্যাত সওদাগর রবিনসনের কুটীতে আমার নামে পত্র লিখো, সে কথাগুলিও তখন মনে পড়লো। হায় হায়! এখন আমার কি দশা? সাধু লোকের আশ্রমে আশ্রয় লই নাই, বাধ্য হোয়ে অসাধুর আশ্রমে এক রকম বন্দিনী হয়ে আছি; একটু একটু স্বাধীনতা আছে,--একটু একটু কেন, বোলতে গেলে পূর্ণ

স্বাধীনতাই আছে, কিন্তু আমার মতন অবস্থায় সে স্বাধীনতাটা কোন কাজের নয়। সিরিলকে পত্র লিখিতে আমার ভরসা হয় না, হোরেসের বাড়ীর ঠিকানা দিতে হবে, তাই ভেবেই ভয় হয়। আহা! সিরিল হয়তো আমার জন্য কতই ভাবছেন, কতই দুঃশ্চিন্তা হয়তো তাঁর পবিত্র হৃদয়ে অবিরত বেদনা দিচ্ছে।

ভাবতে ভাবতে একবার দুটী চক্ষু বুজলেম, পূর্ব্বের ভাবনা খানিক ক্ষণের জন্য ভুলে থাকবো মনে কোরেই আমি তখন নয়ন মুদিত কোরেছিলেম, কিন্তু স্বভাবসম্ভূত সে সকল ভাবনা কি শীঘ্র শীঘ্র ভোলা যায়?—ভুলতে পারলেম না; তবুও অল্পক্ষণের জন্য ইচ্ছা কোরে একটু চাপা দিয়ে রাখলেম। পরক্ষণেই নূতন ভাবনার আবির্ভাব। ডিউক ফেশিংটন আমাকে বিয়ে কত্তে চান; ভাব দেখে বুঝে এসেছি, মিনতিগুলি নিশ্চয়ই তাঁর সরল প্রাণের কথা। তিনি যদি আমাকে বিবাহ করেন, তা হলে হয়তো আমি এই চির দুঃখের জীবনে সুখী হতে পারবো। তিনি প্রচুর ধনের ঈশ্বর, নিজেই সংসারের কর্ত্তা, অন্তঃকরণও সরল, তাঁকে যদি আমি পতিত্বে বরণ কত্তে পারি, তা হলে এই কলঙ্কিত জীবনে অনেকটা শান্তি আসতে পারে। সেই কথাই ভাল; তাঁর প্রস্তাবেই আমি রাজি হবো। হোরেসের চরিত্র আমি এতদিনের পর বেশ বুঝে নিয়েছি, অবিবাহিতা কুমারিদের সতীত্ব নষ্ট করাই তার জীবনের ব্রত। ময়দানের বৃক্ষতলে বিবি পিথারিণ যে যে কথা আমাকে বলেছিল, ডিউক ফেশিংটনের মুখেও ঠিক সেই রকম কথা শুনে এলেম। দুজনের কথাই এক রকম; তবে

আর সন্দেহ রাখবার সম্ভিস্থল কোথায়?—কিছুই মিথ্যা নয়। হোরেসের কায়দা থেকে আমি পালাব।

শেষের সঙ্কল্পটি মনে আস্‌বামাত্র যেন আমি একটু শান্তি অনুভব করলেম। শান্তির সঙ্গে নিদ্রাদেবীর বড় পিরীত, অল্পক্ষণ মধ্যেই আমি গাঢ় নিদ্রায় অভিভূতা হয়ে পড়লেম। পরদিন প্রভাতে যখন নিদ্রা ভঙ্গ হলো, বেলা তখন আটটা; হোরেস তখনও বাড়ী আসে নাই। বেলা যখন এগারটা, তখন হোরেস দেখা দিল। মুখ বিশুষ্ক, চক্ষু বসা বসা, চুল উস্কো খুস্কো; যেন কত দিনের পুরাতন রোগী। তাকে সেই অবস্থায় দেখে, আমার মনের বিরাগ আরও প্রবল হয়ে বেড়ে উঠলো; ভাল করে তার সঙ্গে কথা কইলেম না। স্নান আহারের পর হোরেস যেন নির্জীব হয়ে ঘুমিয়ে পড়লো।

দিনমান অবসান। রাত্রিকালে হোরেস যখন মদ খেতে বসলো, আমি তখন ম্লানবদনে মৃদুপদসঞ্চারে তার নিকটবর্ত্তিনী হয়ে স্বতন্ত্র চেয়ারে উপবেশন করলেম। মদ খেতে খেতে আমার মুখের দিকে চেয়ে সচমকে হোরেস জিজ্ঞাসা করলে, একি!—তোমার মুখ এমন মলিন কেন?—দেড় দিন আমি আস্‌তে পারিনি বলেই কি অভিমান?

মনে মনে রচনা করে ধীরে ধীরে আমি উত্তর করলেম, অভিমান না হোক, ভাবনা বটে। ভাব্‌ দেখি, ভাবনা কি হয় না?—এখানে একমাত্র তুমিই আমার সর্ব্বময় প্রভু; তুমি কাছে না থাকলে আমার যে কত ভাবনা হয়, তোমার সেটা হয়তো অনুভবে আসে না; তুমি হয়তো আমার জন্য একটুও ভাব না।

হো হো রবে হাস্য করে, বিক্রপের ভঙ্গিতে বিক্রপের স্বরে হোরেস বলেছিল, ওরে আমার অভিমানিনি রে! আমার জন্য তুমি এতই ভাব? তোমার জন্য আমি একটুও ভাবি না? এই বুঝি তুমি মনে বুঝে রেখেছ?—তুমি আমার প্রাণ, তুমি আমার দেবতা, তুমি আমার সর্ব্বস্ব; তোমার জন্য আমি একটুও ভাবি না? রাখো—রাখো, ছেনালি রাখো, অভিমান ছেড়ে দাও, এই নাও নাও, এক পাত্র সুধা পান করো।

মদের ঝোঁকে এই কটি কথা বলে, হোরেস একটি স্যাম্পীনের গেলাস আমার হাতে দিল। গ্রহণ না করা ভাল দেখায় না, দরকারও ছিল, সুতরাং সবটুকু আমি খেয়ে ফেল্লেম; দিব্য একটু গোলাপী নেশার আমেজ এলো; উত্তম অবসর বুঝে, মিছামিছি চক্ষে একটু জল এনে, একটু একটু আদুরে কথায় আমি বলেছিলেম, ভাব বৈ কি?—তুমি না ভাবলে আমার জন্য ভাবে, তেমন লোক এখানে আর কে আছে? আচ্ছা সত্যই যদি ভাব, তবে আমাকে বিয়ে কর না কেন? আমাকে কলঙ্কিনী করে রেখে, মিথ্যা মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে, কত দিন আর এই রকমে কাটাবে? আমাকে যদি তুমি—

অর্দ্ধ সমাপ্ত বাক্যে বাধা দিয়ে, আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে, হোরেস বলে উঠ্‌লো, মিথ্যা—মিথ্যা আশ্বাস? কবে আমি তোমাকে কি আশ্বাস দিয়েছি। সে দিন ত স্পষ্টই বলেছি, বিবাহ করা হবে না; বিবাহটা কেবল ভণ্ডামি। আজ আবার নূতন করে বলছি, বিবাহ করাটা পাগ্‌লামী! যীশুখৃষ্ট বিবাহ করেন নাই, কাম পরতন্ত্র নির্ব্বোধ লোকেরাই বিবাহের সৃষ্টি করেছে; বিবাহকে তারা একটা ধর্ম্মের মধ্যে গণনা করে।

মানুষের সৃষ্টি করা কাজে যদি ধর্ম্ম থাকে, তবে ত চুরি ডাকাতি ও খুন জালিয়াতি ইত্যাদিকেও ধর্ম্ম বলে মেনে নিতে হয়। সত্য বল্‌ছি অলিভিয়া, তোমাতে আমাতে বিবাহ হবে না; বিবাহকে আমি মর্ম্মান্তিক ঘৃণা করি, বিবাহের উপর আমি হাড়ে হাড়ে চটা। যারা যারা বিবাহ করে, তারা সকলেই অর্ব্বাচীন,—সকলেই পাগল।

আমার চক্ষু ফুট্‌লো। মনের আশা ভরসা সমস্তই উড়ে গেল। সব আশা ফুরাল না, সব আশা ঘুমালো না, একটি আশা জেগে থাক্‌লো। ডিউক কেশিংটন আমাকে বিয়ে কত্তে চেয়েছেন, সেই আশা।—মনের ভাব চেপে রেখে, হোরেসকে আমি তখন বলেছিলেম, আচ্ছা, আমাকে চিরদিন কলঙ্কিনী করে রাখাই তবে তোমার অভিলাষ?—তাই যদি হয়, তবে আমার পিতা মাতার দশা কি হবে? গত রাত্রে আমার ভাল ঘুম হয়নি, পিতা মাতার কথা আমি অনেক ভেবেছিলেম। তুমি যদি আমাকে বিবাহ না কর, তবে ত আমি আর তাঁদের কাছে গিয়ে দাঁড়াতে পারবো না,—কলঙ্কিত মুখ কেমন করে আমি আর মা বাপের কাছে দেখাব? কোন মুখে আমি আর মুখামুখি তাঁদের কন্যা বলে পরিচয় দিব? কিছুতেই পার্‌ব না। হায় হায়! তাঁরা নিতান্ত গরীব! তাও তুমি বেশ জান, পুঞ্জ পুঞ্জ দেনা, কোথা থেকে তাঁরা সে সব দেনা পরিশোধ করবেন? কি করে তাঁদের দিন চল্‌বে—কি খেয়ে তাঁরা বেঁচে থাকবেন?

আর এক পাত্র স্যাম্পীন আমাকে দিয়ে, নিজেও আর এক গেলাস টেনে, হোরেস তৎক্ষণাৎ জোরে জোরে বলেছিল,

কেন?—কেন?—সে ভাবনা তোমার কেন? আমি তাঁদের কষ্টের কথা ভুলে রয়েছি?—মাসে মাসে বেনামি চিঠিতে দশ দশটি গিনি আমি তোমার পিতার নামে পাঠিয়ে থাকি। এতদিন তোমাকে বলি নাই, কথাটা উঠলো বলে আজ বল্লেম। তাঁদের জন্ম তুমি ভেব না, তাঁরা বেশ আছেন; আমার কাছে তুমি যেমন আছ, সেই ভাবেই থাকো, মনসুখে আমোদ প্রমোদ কর; যত পার, ভোগ বিলাস চরিতার্থ কর, সমস্তই আমি যোগাব। আমার টাকার অভাব নাই। আরো একটা নিগূঢ় কথা আজ তোমাকে বলে রাখি। পিতা আমার নামে একখানি জমিদারী করে দিয়েছেন, তাতে আমার বৎসর বৎসর প্রায় দেড় হাজার গিনি আয় হয়; সেই জমিদারী আমি তোমার নামে লিখে দিব; এর পর পিতা পরলোক যাত্রা কল্লে আমার সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি আমিই পাব, আমার ভাই নাই, ভগ্নি নাই, অংশী নাই, কেহই নাই, একা আমিই সমস্ত ধনের ও সমস্ত ভূমি সম্পত্তির অধিকারী হবো, তুমি আমার বশে থাক্লে সে সমস্ত সম্পত্তিও তোমাকেই আমি দান করবো। কিসের জন্ম তুমি ভাব? মহা উচ্চ প্রলোভন! হোরেস যেন আমাকে আকাশে তুলে দিচ্ছে! এই লোভে যদি আমি ভুলে থাকি, তা হলেই আমার সব দিক নষ্ট হবে। ভারী চালাক! কবিরা বলে গিয়েছেন, ধূর্ত্তের চাতুরী বড়! এই লোকটা ভারী ধূর্ত্ত! মনের কথা আমি ভাঙ্‌ব না, লোভের কথায় আমি ভুলব না; ভাগ্যে যা থাকে, তাই হবে, এখান থেকে আমি পালাবো।

মনে মনে আমি এই রকম মতলব আঁটছি, হোরেস হঠাৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে, কেমন এক রকম সন্দেহের স্বরে

জিজ্ঞাসা কল্লে, ভাবছ কি? আমার কথায় কি বিশ্বাস হচ্ছে না? যা আমি বল্লেম, সেটা দমের কথা; তাই কি তোমার মনে হচ্ছে? মিথ্যা কথা বলে আমি কি তোমাকে লোভ দেখাচ্ছি? আমি কি মিথ্যা কথা বল্‌তে জানি। কল্যই আমি তোমাকে দলিল লিখে দিব, তুমি আমার নিজের জমিদারীর সম্পূর্ণ মালিক হবে। ও সব ভাবনা ছেড়ে দাও,—মদ খাও, নির্ভাবনায় আমোদ কর, প্রসন্নবদনে আমার সঙ্গে কথা কও।

আর একবার স্যাম্পীনের গেলাস ফিরে গেল। দুজনেই আমরা এক এক পাত্রের সুবিচার করলেম। সেই অবসরে হোরেস আমাকে জিজ্ঞাসা কল্লে, কাল কি তুমি নাচের মজলিসে গিয়েছিলে? আমি উত্তর করলেম, গিয়েছিলেম; ডিউক আমাকে যথেষ্ট খাতির করেছেন; তুমি যাও নাই বলে অনেক আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন; আমি যাবার পূর্ব্বেই তিনি তোমার চিঠি পেয়েছিলেন।

কি একটু ভেবে, অন্যমনস্ক হয়ে, হোরেস তখন গুন্ গুন্ স্বরে বল্লে, ফেশিংটন এদিকে লোক ভাল, কিন্তু তার মনের ভিতর অনেক রকম মার্‌প্যাচ খেলে। আমার বন্ধু বটে, কিন্তু আমি তার সকল কথায় বিশ্বাস করি না; লোকটা অনেক সময় অনেক রকম মিথ্যা কথা কয়।

সে কথায় আমি বেশী মনোযোগ রাখলেম না; মনে তখন আমার আর এক রকম ভাবের উদয় হয়েছিল; রচনা করে, কৌশল করে, একটা কথা উত্থাপন করলেম। সেটা কিন্তু মিথ্যা কথা। জন্মাবধি আমি মিথ্যা কথা জানতেম না, কপটতা শিখি নাই, বরাবর ধর্ম্মভয়টা আমার বেশী ছিল; কুসঙ্গে

মিসে আমার স্বভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছিল; মনের আবেগে সেই রাত্রে হোরেসের কাছে আমি মিথ্যা কথা বলেছিলেম। ধর্ম্ম আমাকে ক্ষমা করবেন, সে কথায় আমার কোন মন্দ অভিপ্রায় ছিল না। আমি বলেছিলেম, ইতিমধ্যে ময়দানে বেড়াবার সময় সিরিলের সঙ্গে এক দিন হঠাৎ আমার দেখা হয়েছিল; সহরের বড় একটি সওদাগরি হাউসে তিনি এখন কাজ কর্ম্ম শিক্ষা করছেন, কোন রকম সুবিধা করে উঠতে পারেন নাই, টাকার অভাবে কোন একটি কারবারে লিপ্ত হতে পারছেন না। আমাকে দেখে—

কথা সমাপ্ত কত্তে না দিয়েই, চঞ্চলস্বরে হোরেস আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, কত টাকা হলে সুবিধা হয়? চিন্তা করবার অবসর না নিয়েই তৎক্ষণাৎ আমি উত্তর করেছিলেম, আপাততঃ পাঁচশো গিনি।

শোনবামাত্র মাথা ঘুরিয়ে হোরেস বলেছিল, পাঁচশো গিনি?—ওঃ! এই বই তো নয়? হাজার গিনি হলেও স্বচ্ছন্দে আমি দিতে পাত্তেম; তোমার খাতিরে—তোমার প্রেমের খাতিরে, অক্লেশে লক্ষ গিনি আমি দান কত্তে পারি। কল্যই আমি তোমাকে পাঁচশো গিনির একখানা চেক দিব, দর্শনি চেক;—ব্যাঙ্কে দেখাবামাত্র সিরিল কিম্বা তাহার কোন প্রতিনিধি সেই টাকা পেয়ে যাবে।

মনে মনে হেসে, কৃতজ্ঞতা জানিয়ে, কপট উল্লাসে আমি বলেছিলেম, তা আমি জানি, তা আমি জানি, আমাকে তুমি যথেষ্ট ভালবাস, আমার কথা তুমি অবহেলা করবে না, তাতে আমার খুব বিশ্বাস আছে। গোপনে গোপনে তুমি আমার

মা বাপকে সাহায্য কচ্ছো, আমার ভাইটিকেও সাহায্য করবার অঙ্গীকার কচ্ছো, এতে আমি—

বাধা দিয়ে একটু যেন ক্ষুব্ধ হয়ে, উদাসভাবে হোরেস বলেছিল, ও সব তোমার কি কথা? আমি কৃতজ্ঞতা চাই না, খোসামোদ ভালবাসি না, আমার কর্ত্তব্য কার্য্য পালন কত্তে আমি জানি, তাই আমি করি, তাতে আর নূতন কথা কি আছে? মুখ দিয়ে যে কথা বেরিয়েছে, কখনই তা নড়বে না, কল্যই আমি অঙ্গীকার পালন করবো। সে বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। এখন এস, আমোদ কর।

সে প্রসঙ্গে তখন আর কোন প্রকার তর্ক বিতর্ক উঠলো না, আমরা পান ভোজন সমাপন করে শয়নগৃহে বিরাম কত্তে গেলেম। পরদিন বৈকালে হোরেস একখানি চেক আর আমার নামে দলিল—জমিদারী দানের দলিল প্রস্তুত করে আমার হাতে দিলে; জয়লাভ বিবেচনা করে, সেই দুখানি কাগজ আমি আমার নিজের তোরঙ্গের মধ্যে রেখে দিলেম; তৎপর দিন অবসর ক্রমে একখানি চিঠি লিখে, চেক খানি সেই চিঠির ভিতর দিয়ে খামের উপর শীলমোহর করে, রবিন্সনের কুঠীর ঠিকানায় সিরিলের কাছে পাঠালেম; চিঠিখানি ডাকে দিয়েছিলেম, সে কথা বলাই বাহুল্য। কোথায় আমি থাকি, কোথায় আমি আছি; চিঠিতে সে ঠিকানা লিখি নাই।

ত্রয়োদশ তরঙ্গ।

কুমারি পম্পা।

তিন দিন অতীত। মাসাবধি হোরেস প্রায়ই দিনমানে বাড়ী থাকে না; হাজরে খানা খেয়ে বেলা আটটার সময় বেরিয়ে যায়, রাত্রি নটা দশটার সময় ফিরে আসে। কি কাজে যায়, আমাকে কিছু বলে না, আমিও কিছু জিজ্ঞাসা করি না। চতুর্থ দিবসের অপরাহ্নে আমি অশ্বারোহণে বাড়ী থেকে বেরুলেম; বেড়াতে যাবার ইচ্ছায় নয়, একটি নূতন বন্ধুর সহিত দেখা করবার ইচ্ছায়।—গ্রস ষ্ট্রীটে মারকুইস হংগার বাস করেন, তাঁরি বাড়ীতে একবার আমি যাব, লেডি হংগারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আস্‌বো, সেইরূপ আমার সংকল্প।

ঠিকানাটি জেনে রেখেছিলেম, কিন্তু কোন পথে যেতে হয়, সেটি জানা ছিল না। রাস্তার লোককে জিজ্ঞাসা করে করে সেই দিকে আমি যাচ্ছি, প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ অতিক্রম করেছি, এমন সময় দেখি, একটি রমণী দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে সেই দিকে আসছেন। আমি যেখানে গিয়ে পৌঁছিলেম, সেখান থেকে প্রায় সত্তর আশী হাত দূরে সেই রমণী। বেশ দেখতে পাচ্ছি, তার ঘোড়াটি খুব ছুটে ছুটে আস্‌ছে, আমার ঘোড়াটি কদমে কদমে চল্‌ছিল। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রমণী আমার সম্মুখে এসে উপস্থিত হতে পারবেন, এইরূপ আমি আশা করছিলেম; দৈবের কর্ম্ম, যাত্রার ফল, আগে থাকতে

কে বুঝতে পারে?—সেই বিবির ঘোড়াটী খানিক দূর ছুটে এসে, পথের মাঝখানে বার কতক ঘুরপাক খেলে, সম্মুখের পা দুখানা উঁচু করে বার কতক লাফালে, তাল সামলাতে না পেরে, বিবিটি জিনের উপর থেকে এক পাশে ঝুলে পড়লেন; রেকাবের উপর তাঁর একখানি পা আটকে থাকলো, মাথাটি মাটির দিকে ঝুলতে লাগলো, মাটির সঙ্গে ঠেকাঠেকি হয় হয়, এমনি গতিক; প্রাণভয়ে বিবিটি উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করতে লাগলেন। সে সময় সে পথে অন্য পথিক কেহই ছিল না; দিক্‌টা তখন নির্জ্জন, কেহই তাঁর সাহায্য কত্তে এল না। ঘোড়া কিন্তু তখনও সমান বেগে ছুট্‌ছে।

তখনও আমি প্রায় দশ বার হাত দূরে, শীঘ্র শীঘ্র ঘোড়া ছুটিয়ে সেই দিকে আমি এগুতে লাগলেম; অতি শীঘ্রই সেই বেগগামী অশ্বের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হ'লেম। আমার ঘোড়াকে মুখের কাছে দেখে সেই পাগলা ঘোড়াটা হঠাৎ থেমে গেল। আমি তৎক্ষণাৎ ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়ে বিবিটিকে রক্ষা করলেম। ঘোড়া চড়া অভ্যাস করবার সময়, কি রকমে পাগলা ঘোড়াদের শান্ত করতে হয়, কি রকমে বশ কত্তে হয়, কি রকমে তোয়াজ কত্তে হয়, সে উপায়গুলিও আমি শিক্ষা করেছিলেম। ঘোড়াটার ঘাড়ের ঝুঁটি ধরে, কপালটা চাপড়ে চাপড়ে, গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে, মিষ্ট মিষ্ট কথা বলে, যথা-সম্ভব ঠাণ্ডা করলেম। ঘোড়াটা চিঁহি চিঁহি রব করে এদিকে ওদিকে মুখ ফিরাতে লাগলো, কিন্তু আর লাফালাফি করলে না।

বিবিটী অজ্ঞান হন নাই, কিন্তু ঘন ঘন হাঁপাচ্ছিলেন;

আকস্মিক ভয়ে তাঁর সর্ব্বশরীর কাঁপছিল, চক্ষু দুটী বুজে বুজে এসেছিল, অমঙ্গল আশঙ্কায় আমি তাঁরে সেইখানে কোলে করে বস্‌লেম। দুটি ঘোড়াই মুখোমুখি হয়ে এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো।

আমি তখন করি কি! সে অবস্থায় যথাযোগ্য সুশ্রূষা না কল্লে বিপদ ঘটতে পারে, কিন্তু উপকরণ কোথায়? রাস্তার ধারে ছোট একটি বাগান ছিল, চারিদিকে লোহার রেল দেওয়া; বাগানের ভিতর নানা জাতি বৃক্ষের দীর্ঘ দীর্ঘ শ্রেণী, দিব্য ছায়া, বিবিটীকে কোলে করে সেই বাগানের ভিতর আমি নিয়ে গেলেম; বাগানের মধ্যস্থলে দিব্য একটী সরোবর, দুই ধারে শ্বেত পাথরের বাঁধা ঘাট; একটী ঘাটের চাতালের উপর বিবিটিকে শুইয়ে রেখে, একবার আমি রাস্তায় বেরুলেম; ঘোড়া দুটীকে বাগানের ভিতর নিয়ে গিয়ে দুটী গাছে বেঁধে রাখলেম, তার পর চিকিৎসা।

বিবিটি সম্পূর্ণ অজ্ঞান হন নাই বটে, কিন্তু প্রায় অচেতন, চক্ষেও দৃষ্টি ছিল না, মুখেও কথা ছিল না। সরোবর থেকে অঞ্জলি অঞ্জলি জল এনে আমি তাঁর মুখে চক্ষে বক্ষে মস্তকে ছিটাতে আরম্ভ করলেম, বুকের বোতামগুলি খুলে দিলেম, পাশে বসে রেশমি রুমাল দিয়ে বাতাস কত্তে লাগলেম। দশ মিনিট পরে চক্ষু উন্মীলন করে, বিবি একবার পাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে, আমাকে দেখতে পেলেন। কে আমি, তা জানতে পারলেন না, কথাও কইতে পারলেন না, ইঙ্গিতে জলতৃষ্ণা জানালেন; ধীরে ধীরে একবার একটু হাঁ করলেন। আমি শশব্যস্তে আর একবার সরোবরের সোপানে নেমে, এক

অঞ্জলি জল এনে তাঁর মুখে দিলেম; জল খেয়ে তিনি একটী নিশ্বাস ত্যাগ করলেন; হাঁপানিটাও একটু থাম্‌লো। আরও পাঁচ মিনিট। বিবি তখন বেশ চৈতন্য পেয়ে ঘাটের চাতালের উপর উঠে বোসলেন। আমার তখন ভরসা হলো। সত্যই আমি ভয় পেয়েছিলেম, সে ভয়টা তখন দূরে গেল।

আমি তাঁর গায়ে হাত বুলাচ্ছি, মুখের দিকে চেয়ে আছি, তিনিও আমার মুখের দিকে চেয়ে আছেন, দুজনেই কিন্তু নীরব। কি কথা তিনি বলবেন, তাই হয়তো ভাব ছিলেন, সেই জন্যই তিনি নীরব, আমি তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ একাগ্র মনে নিরীক্ষণ করছিলেম, সেই জন্যই আমি নীরব।

বিবিটি সুন্দরী, গঠন সুঠাম, মুখখানি দিব্য সুন্দর; আকার দীর্ঘ, একটু যেন কোল কুঁজো, কপাল খুব চওড়া, চক্ষু বড় বড়, নাসিকা ধারালো, ওষ্ঠ সুরঞ্জিত, গলাটি রাজহংসীর গলার মতন বেশী লম্বা, মস্তকের কেশ কবরীবদ্ধ ছিল, দীর্ঘ কি হ্রস্ব জানতে পারলেম না। বাস্তবিক বিবিটি বেশ সুন্দরী, কিন্তু কিছু কাহিল; বয়স অনুমান বিংশতি বর্ষ।

দুজনেই দুজনের মুখপানে চেয়ে আছি। সেই ভাবে আরও পাঁচ মিনিট। অবশেষে মৃদুস্বরে আমি তাঁরে জিজ্ঞাসা করলেম, অঙ্গে কোনরূপ আঘাত লাগেনি ত?—তিনি উত্তর করলেন, আঘাত লাগেনি, কিন্তু মাটিতে যদি পড়তেম, তাহলে হয়তো আমার প্রাণ যেতো। তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ। কে তুমি স্নেহময়ী? কে তুমি করুণাময়ী? তুমি কি দেবকন্যা? আমার রক্ষার নিমিত্ত তুমি কি স্বর্গ থেকে নেমে এসেছ?

আমার রক্ষার নিমিত্ত জগৎপিতা কি তোমাকে এই মর্ত্ত্যধামে প্রেরণ করেছেন?

নিশ্বাসে নিশ্বাসে এককালে এই রকম অনেক প্রশ্ন।

সব প্রশ্ন মাথায় রেখে মৃদু বচনে আমি উত্তর করলেম, দেখতেই ত পাচ্ছো, আমি একটি সামান্য মানবী, অত্যন্ত গরীব; জগৎপিতা আমাকে মর্ত্ত্যধামে পাঠিয়েছেন, কিন্তু আমার প্রতি তাঁর কৃপা কম। কৃপাময়ের কৃপার উপর দোষারোপ কল্লে পাপ হয়, আমার অদৃষ্ট ফলেই আমি দুঃখিনী। এই পথ দিয়ে যাচ্ছিলেম, হঠাৎ তোমাকে বিপদগ্রস্ত দেখে, যৎসামান্য সাহায্য করেছি, তার জন্য আমাকে দেবকন্যা বলে তুমি অতটা সম্মান দিচ্ছো, তাতে আমি বড় লজ্জা পাচ্ছি।

আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে, বিবি আবার বল্লেন, তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করেছ, চিরজীবন আমি তোমার কাছে ঋণী থাকবো; কিন্তু কার কাছে ঋণী থাকতে হবে, সেটি কি আমি জেনে রাখতে পারি? অনুগ্রহ করে তোমার নামটি কি আমাকে বলবে?

মনে কোন দ্বিধা না রেখে, আমার নামটি আমি তাঁর কাছে প্রকাশ কল্লেম। অন্য কোন পরিচয় দিলেম না, শুধু কেবল নামটি। তিনিও তাঁর নিজের নাম বলে, অতি সংক্ষেপে আমার কাছে একটু পরিচয় দিলেন। পরিচয়ের সঙ্গে আমার অনেকটা সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছিল, সেই কারণেই বলে রাখি, তাঁর নাম কুমারি পম্পা।

নূতন পরিচয়ে যে রকম কথাবার্ত্তা চলে, সেই রকম কিছু

কিছু কথাবার্ত্তা চল্লো ; হঠাৎ আমি কৌতূহলবশে জিজ্ঞাসা করেছিলেম, তোমার কি বিবাহ হয়েছে ?

পম্পা উত্তর করেছিলেন, তা হলে তো স্বামীর নামে পরিচয় দিতে পারতেম। এখনও আমার বিবাহ হয় নাই, কিন্তু প্রস্তাব হচ্ছে। তুমি যখন আমার প্রাণরক্ষা করেছো, তোমার কাছে আমি যখন কৃতজ্ঞ আছি, তখন সে কথাটা গোপন রাখব না। একটি লোক আমাকে বিবাহ করবার উমেদারী কচ্ছে ; পাঁচ মাস হতে গেল, আমাদের বাড়ীতে গিয়ে কত রকম স্তবস্তুতি কচ্ছে ; মাসাবধি ঘন ঘন গতিবিধি আরম্ভ করেছে। লোকটী বেশ সুশ্রী, কথাবার্ত্তাও বেশ, সে বলে, তার টাকাও অনেক ; আমি গরীবের মেয়ে, বিবাহের যৌতুক স্বরূপে সে আমাকে তার নিজ নামের জমিদারী লিখে দিতে চায়। সে জমিদারীর বার্ষিক উপস্বত্ব নাকি দেড় হাজার গিনি ; এই হপ্তার শেষেই দলিল লেখাপড়া করে দিবার কথা আছে। তিন দিন পূর্ব্বে সে আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিল, সমস্ত দিন ছিল, পূর্ব্বে একদিনও রাত্রি বাস করে নাই, সেই দিন রাত্রি বাস করেছিল। আজও গিয়ে ছিল, তাকে বিদায় করে দিয়ে আমি বেড়াতে বেরিয়ে ছিলেম, পথেই এই দুর্ঘটনা। এত কথা যখন আমি তোমাকে বল্লেম, তখন আর অঙ্গহীন রাখি কেন, শেষ টুকুও বলে রাখি। সেই লোকটীর নাম হোরেস রকিংহাম।

আমার কৌতূহল অত্যন্ত বেড়ে উঠ্‌ল ;—সংশয়ের সঙ্গে কৌতূহল। তৎক্ষণাৎ আমি জিজ্ঞাসা করলেম, তবে কি সেই লোকটীকে বিবাহ করাই তোমার স্থির হয়েছে ?

পম্পা উত্তর করলেন, এখনও কিছু কিছু অস্থিরতা আছে,

ইতিমধ্যে একদিন আমি আমাদের একটি প্রতিবাসিনীর মুখে শুনেছিলেম, হোরেস রকিংহামের বিবাহ হয়েছে। সে এখন সেই বিবাহের কথা গোপন করে, অন্য কামিনীর নূতন ভালবাসা লাভ কত্তে চায়। এটা হোল সাত দিন পূর্ব্বের কথা; আজ যখন হোরেস আমাদের বাড়ীতে এসেছিল, তখন আমি তাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেম; সে বলেছিল, বিবাহটা মিথ্যা কথা, তবে যদি আমার কথা তোমার বিশ্বাস না হয়, পূর্ব্বে আমি বিবাহ করেছি, এমনটা যদি তুমি সত্য বিবেচনা কর, সত্য যদি আমার স্ত্রী থাকে, তা হলে তাকে আমি ডাইভোর্স করবো। বিবাহ করা হোক না হোক, আছে আমার একটা স্ত্রীলোক; সেটা আমার মনের মতন নয়। কথা জানে না, রসিকতা জানে না, ভালবাসা জানে না, কেবল রাগ জানে; কাঙালের মেয়ে, কেবল দাও দাও, এই রকম বুলি সর্ব্বক্ষণ; তার উপর আমি ভারী বিরক্ত হয়ে গেছি— ডাইভোর্স করে ফেলবো। হাস্য করে আমি বলেছিলেম, তোমাকে হয়ত ডাইভোর্স কত্তে হবে না; আর একটি রমণীকে তুমি বিবাহ করবার যোগাড় কচ্ছো। এ কথা যদি সে শুনতে পায়, তবে সেই অরসিকা রমণীই তোমাকে ডাইভোর্স করে ফেলবে। হয়ত তোমার নামে আদালতে ক্ষতিপূরণের দাবীতে নালিশ জুড়ে দিবে। হোরেস বলেছে, কিছুতেই আমি ভয় করি না, তোমাকেই আমি বিবাহ করবো, এই হপ্তার মধ্যেই তোমার নামে জমিদারী লিখে দিব।

এই পর্য্যন্ত বলে কুমারী পম্পা আমার মুখ পানে চেয়ে রইলেন। তাঁর মুখে তখন আমি আর অন্য কথা শোন্‌বার

ইচ্ছা করলেম না, উদাস ভাবে বল্লেম, দেখ যদি জমিদারী লিখে, তবে তুমি তাকেই—

কথা বলছিলেম, এমন সময় বাগানের মধ্যে দুটি লোক এসে উপস্থিত হলো, আমাদের কথোপকথন বন্ধ হয়ে গেল। প্রিয় সম্ভাষণে উভয়ে আমরা পরস্পর বিদায় গ্রহণ করে, নিজ নিজ অশ্বারোহণে বাগান থেকে বেরুলেম; পম্পা গেলেন অন্য দিকে, আমি চল্লেম ময়দানের দিকে।

লেডি হংগারের সঙ্গে দেখা করবার জন্য যাত্রা করেছিলেম, সে দিন আর যাওয়া হোলনা; মনে তখন কেমন এক প্রকার চাঞ্চল্য এসেছিল, কত প্রকার কুৎসিত সন্দেহ আমার চিত্তকে অস্থির করেছিল, কিছুই আমার ভাল লাগলো না। সূর্য্য অস্ত হবার তখনও এক ঘণ্টা দেরী ছিল। নানাপ্রকার সন্দেহের সঙ্গে অন্তরে তখন আর একটা সংকল্পের উদয়। ঘোড়া ছুটিয়ে ময়দানের দিকে চলেছি, পথে এক জন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হলো; বেশী দিনের চেনা নয়, অল্প দিনের চেনা। তাকে আমি জিজ্ঞাসা কল্লেম, রবিন্‌সনের কুঠী কোন দিকে? তিনি এক জন নামজাদা সওদাগর, তাঁর কুঠীতে আমার একটু দরকার আছে। পথ চিনিনা, কোন দিক দিয়ে যেতে হয়— সেই লোকটি আমাকে ঠিক্ ঠিক্ রাস্তা বলে দিলে, তাকে সেলাম করে আমি অতি দ্রুতবেগে সেই দিকে ঘোড়া ছুটালেম।

আর কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা কত্তে হলো না, আধ ঘণ্টার মধ্যেই রবিন্‌সনের কুঠীতে আমি পৌছিলেম। দ্বারপালকে জিজ্ঞাসা করলেম, সিরিল ষ্ট্যাবার্ট এই কুঠীতে থাকেন?

সেলাম করে, দরোয়ান বল্লে, খবর দিব? আমি বল্লেম, হাঁ পাঁচ মিনিটের জন্য তাঁর সঙ্গে আমি দেখা কত্তে চাই। দরোয়ান আমার নাম চেয়ে ছিল, নাম আমি বল্লেম না, কেবল বল্লেম—তুমি বল গিয়ে, তাঁর ছেলেবেলার বন্ধু আমি।

দরোয়ান খবর দিতে গেল, অবিলম্বেই আমার প্রিয় সহোদর সিরিল আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান। দুই বৎসরের পর ভাই ভগ্নীতে সাক্ষাৎ, আমাদের যে তখন কত দূর আনন্দ, কত দূর বিস্ময়, সে কথা বলতে পারি না; আমাদের উভয়েরই চক্ষে জলধারা। সিরিল আমার হস্তধারণপূর্ব্বক আফিসের বাহিরের একটি ছোট ঘরে নিয়ে গেলেন, সজল লোচনে জিজ্ঞাসা করলেন, রোজ! এত দিন তুমি কোথায় ছিলে? এখন তুমি কোথায় আছ? তোমার কোনরূপ অসুবিধা ঘটেনিতো? আসল কথা গোপন করে, অতি সংক্ষেপে আমি ঐ তিনটী প্রশ্নের উত্তর দিয়ে, অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করলেম, ডাক-যোগে তোমার নামে আমি একখানি পত্র পাঠিয়ে ছিলেম, পেয়েছিলেত?

কুটিল হাস্য করে, ঘৃণা ব্যঞ্জক স্বরে, সক্রোধে সিরিল উত্তর করলেন, জুয়াচুরি কাণ্ড! ভয়ানক দম্‌বাজি! সেই চেক্‌খানা নিয়ে আমি নিজেই ইংলণ্ড ব্যাঙ্কে গিয়েছিলেম। চেক ডিপার্টমেন্টের প্রধান কেরাণি বল্লেন, হোরেস রকিংহামের নামে এ ব্যাঙ্কে কোন হিসাব নাই। ঝুটা চেকখানা ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে, ক্রোধে ঘৃণায় দারুণ লজ্জায় আমি ফিরে এলেম। হোরেসের সঙ্গে তোমার কোথায় দেখা হয়েছিল? সে পাষণ্ডটা কেন তোমাকে সেই জাল চেক্‌খানা দিয়ে ছিল?

সিরিলের মতন ক্রোধে ঘৃণায় ও লজ্জায় উত্তেজিত হয়ে আমি উত্তর করেছিলেম, সে লোকটা আমার বাল্যকালের বন্ধু ছিল, দৈবাৎ হাইড্‌পার্কে এক দিন দেখা হয়েছিল, কি অবস্থায় তুমি আছ, সংবাদ আমি জান্‌তেম না, তোমার কার-বারের অভিলাষ তারে আমি জানিয়ে ছিলেম, তার পকেটেই এক খানা ছোট রকম চেক বহি ছিল, কলের কমল ছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সে তখনি সেই চেকখানা লিখে দিয়ে ছিল। যে আশ্রমে আমি থাকি, সেখান থেকে বাহির হওয়া আমার নিষেধ ছিল, সেই জন্যই এত দিন আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারিনি।

এই সকল মিথ্যা কথা বোলে, মাথা হেঁট করে সিরিলের নিকটে আমি দাঁড়িয়ে থাকলেম; দুটি চক্ষু দিয়ে দর দর ধারে জল পড়তে লাগলো। সিরিল আমার চক্ষের জল দেখতে পেলেন না, তিনি বল্লেন, এখানে আমি বেশ আছি, রবিন-সনের কারবারের অংশি হয়েছি; প্রথমে শূন্য ভাগী ছিলেম, এখন মূলধন আমানত রেখে পাকা অংশি হয়ে কাজ কচ্ছি। তোমার যা যখন আবশ্যক হবে, চিঠি লিখে আমাকে জানিও, আমি তৎক্ষণাৎ টাকা পাঠাব।

সে সব কথার কোন উত্তর না দিয়ে, শীঘ্রই আবার দেখা হবে বলে, চঞ্চলপদে আমি বেরিয়ে পড়লেম, অশ্বে আরোহণ করেই দ্রুত প্রস্থান। মনের ভিতর জাগ্‌তে লাগলো কুমারি পম্পা আর হোরেসের জাল চেক্।

চতুর্দ্দশ তরঙ্গ।

দ্বিতীয় দর্শন।

যে বাড়ীতে ছিলেম, সেই ঘৃণিত বাড়ীখানাকে তখন বাড়ী বল্‌তে আমার ঘৃণা হোল; সন্ধ্যার পর সেই বাড়ীতে আমি পোঁছিলেম। যেখানে বসি, সেই ঘরে প্রবেশ করবা মাত্র আমার যেন গাত্রদাহ উপস্থিত হয়েছিল; কে যেন আমার গায়ে আগুন ছড়িয়ে দিতে লাগল। এত দিন সে রকম জ্বালা ধরেনি, সেই দিন সেই নূতন জ্বালা।

হোরেস তখন বাড়ীতে ছিল না। থাক্‌বার কথাও নয়। ভিতরের খবর আমি অনেকটা জেনে এসেছিলেম; হোরেসকে গরহাজির দেখে আমার একটুও আশ্চর্য্য বোধ হোল না। পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করে, একখানি আরম চেয়ারে আমি উপবেশন করলেম। যে সকল চিন্তায় বুক পোড়ায়, সেই রকমের গোটা কতক চিন্তা তখন আমার কম্পিত হৃদয়কে ঘন ঘন দগ্ধ করতে লাগলো। এক দিনও যে কাজ আমি করি নাই, সেই দিন সন্ধ্যার পর সেই কাজ আমাকে কত্তে হয়েছিল; আলমারী খুলে বোতল বাহির করে, স্বহস্তে ঢেলে ঢেলে তিন বার আমি মদ খেয়েছিলেম। মদ খেতে শিখে অবধি তেমন কোরে আপনি ঢেলে, একাকিনী লুকিয়ে লুকিয়ে মদ খাওয়া আমার অভ্যাস হয় নাই, সেই দিন নূতন আরম্ভ।

বড় বড় চিন্তা আমার তিন প্রকার। হোরেস আমাকে

ভয়ানক দমে ফেলে রেখেছে, তাই আমি ভেবে রেখেছিলেম, কিন্তু আজ যে সকল কাণ্ড প্রকাশ হলো, সেটা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। নূতন কাণ্ডই আমার নূতন চিন্তার উত্তেজক। প্রথম চিন্তা—পম্পা কুমারি; হোরেস সেই পম্পাকে বিবাহ কর্ব্বে স্থির করেছে; তার নামে জমিদারী লিখে দেবে বলেছে; আমার সঙ্গে বিবাহ হয় নাই, তবু আমাকে ডাইভোর্স করবে বলেছে। কি ভয়ঙ্কর লোক! যে জমিদারিখানা আমাকে লিখে দিয়েছে, সেই খানাই পম্পাকে লিখে দেবে, এটা নিশ্চয়; কেননা, সে নিজেই বলেছিল, তার বাপ তার নামে কেবল একখানা জমিদারী করে দিয়েছে। সেই খানাই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দুজনকে দান করবে? কি ভয়ানক জুয়াচুরি!

দ্বিতীয় চিন্তা—ব্যাঙ্কের নামে চেক। সিরিলের মুখে শুনে এলেম, ব্যাঙ্কের লোকে বলেছে, হোরেসের নামে তাদের আফিসে কোন হিসাব নাই। তবেই জানা গেল, চেক্‌খানা জাল। চেক্ যদি জাল হলো, তবে জমিদারির দলিলখানাও জাল হতে পারে। কি ভয়ানক ধড়ীবাজী!

তৃতীয় চিন্তা—আমার মা বাপের সাহায্য করা। হোরেস বলেছে, মাসে মাসে বেনামি চিঠিতে তাঁদের কাছে টাকা পাঠায়। আমি যেন বুঝতে পাচ্ছি, সে-কথাটাও সম্পূর্ণ জাল! চেক্ জাল, দলীল জাল, কথা-জাল! সর্ব্বনেশে লোক!

রাত্রি আটটা বাজলো। হোরেস এলোনা। আবার আমি একটু মদ খেলেম। আবার কত রকম ভাবতে লাগলেম। নটা বেজে গেল, তখনও তার দেখা নাই। কুমারি পম্পাকেই

হাত কত্তে গিয়েছে, সে বিষয়ে আর একটুও সন্দেহ রাখলেম না। দশটা বাজলো, তখনও গর হাজির। আমি তখন মনে কল্লেম, নিশ্চয়ই সেই সাগরে ডুবেছে, আজ আর আসছে না। ঘণ্টা বাজিয়ে সিলভিয়াকে ডাকলেম; দুজনে একটু একটু মদ খেলেম; খানার আয়োজন হয়েছিল, দুজনে এক সঙ্গে খানা খেলেম; দুজনে বসে বসে নানা রকম গল্প কল্লেম। যে সব চিন্তা আমার মনের ভিতর, সিলভিয়াকে সে চিন্তার কথা বল্লেম না। গল্প কত্তে কত্তে ঝাড়া দুঘণ্টা কেটে গেল। বারটা বাজলো। সিলভিয়াকে বিদায় দিয়ে, কাপড় ছেড়ে, আমি শয়ন করলেম, এক ঘণ্টা জেগে জেগে শেষকালে আমি ঘুমিয়ে পড়ি; দুই ঘণ্টা পরে আবার জাগি;—আর শীঘ্র নিদ্রা এলোনা;—ছট্‌ফট্ কত্তে লাগলেম। শেষ রাত্রে টোল্‌তে টোল্‌তে মূর্ত্তি এসে উপস্থিত। ঘরের মেঝেতে তার পদার্পণ হবামাত্র, দেওয়ালের ঘড়ীতে ঠন্‌ঠন্ করে পাঁচটা বেজে গেল। সে সময় তাকে আমি একটি কথাও বল্লেম না; সে নিজে খানিকক্ষণ জড়ানো জড়ানো গোটা কতক কথা বলে, আর এক গেলাস ব্রাণ্ডি উদরস্থ করে, বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো; মাতাল মানুষ, যেমন শোয়া, অমনি গাঢ় নিদ্রায় নাসাগর্জ্জন।

পরদিন বেলা প্রায় নটার সময় মাতালের নিদ্রাভঙ্গ; দশটার সময় হাজরে খেয়ে, মাতালটা আবার তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। সেই রাত্রে একটু সকাল সকাল ফিরে এসেছিল; আমার সঙ্গে মদ খেয়েছিল; পাঁচ রকম এলো মেলো গল্প করেছিল; অবসর বুঝে, তালে তালে শ্লেষ করে, তাকে আমি বলেছিলেম, বিবাহ করা ভারী মজা; জমিদারী লিখে

দিয়ে বিয়ে করা আরও মজা; যাকে বিয়ে কত্তে তোমার মন চায়, তাকেই তুমি জমিদারী লিখে দিতে পার, আমাকে তুমি জমিদারী লিখে দিয়েছ, একদিন হয়তো আমাকেও বিয়ে কত্তে রাজী হবে। হও যদি, তাও আমার পক্ষে মঙ্গল; কিন্তু আমার চেয়ে সুন্দরী আর একজনকে যদি বিয়ে করে ফেল, যার কাছে রাত কাটাও, যার কাছে ফাঁকা ফাঁকা ডাইভোর্সের কথা কও, তার সঙ্গে যদি তোমার বিয়ে হয়, তবেই ত আমি গেছি।

ইঙ্গিতের আভাষে কতক কতক মর্ম্ম বুঝতে পেরে, মাতালটা একবার চোম্‌কে উঠলো; ভাবটা সামলে নিয়ে, আমার দিকে কট্‌মট্‌ চক্ষে চেয়ে, ক্ষণকাল আপনা আপনি ফোঁস ফোঁস করে গর্জ্জন কল্লে, ভারী চোটে উঠলো। কর্কশস্বরে আমাকে বল্লে, কার কাছে তুই ও সব কথা শুনে এসেছিস্‌। দুষ্ট লোকে অনেক রকম মিথ্যা কথা রটায়; তাদের সঙ্গে তুই বুঝি পিরীত কত্তে যাস্‌? তোকে আমি আচ্ছা শিখান শিখাব। রাত কাটাবার কথা, ডাইভোর্সের কথা, নূতন বিয়ের কথা, নিশ্চয়ই তুই তাদের কাছেই শুনে এসেছিস্‌; আচ্ছা শিখান শিখাব;—তোকেও শিখাব,—তাদেরও শিখাব;—ছেনাল্‌! বেইমান! বদ্‌মাস!

রেগে রেগে আমাকে ঐ রকম গালাগালি দিয়ে, মাতালটা আর একবার আর একটা পূর্ণপাত্র উজাড় কল্লে; সেবারে আর আমাকে খেতে বল্লে না; না বলুক, আমি কিন্তু আমার পালায় আপনি ঢেলে, এক চুমুকে একটি গেলাস নিকাশ করলেম।

আমারও ভারি রাগ হলো। সামলাতে না পেরে, মহা উত্তেজিত কণ্ঠে, একটু চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, মাতালকে আমি বল্লেম, কি তুই শিখাবি? কাকে তুই শিখাবি? কি রকম শিখাবি? অনেক কথা আমি জানতে পেরেছি, ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে আমার গুপ্তচর বেড়ায়; কি তুই শিখাবি?--তোকে কে শেখায়, সেইদিকে সাবধান থাকিস্? আমার ভাইকে একখানা চেক্ দিয়েছিলি, সেখানা জাল সাব্যস্ত হোয়েছে? ব্যাঙ্ক বলেছে, সেখানে তোর নামে কোন খাতাপত্র নাই। দমবাজ! জালিয়াৎ! এত দমবাজী তোর! আমার সঙ্গে এতদূর দাগাবাজী!

দেয়ালের গায়ে, আলমারির গায়ে, টেবিলের পায়ায় বোতল গেলাসগুলো ছুড়ে ছুড়ে ফেলে, ভেঙ্গে চুরমার কোরে, মাতালটা টোল্‌তে টোল্‌তে রাগে ফুলতে ফুলতে, ঘর থেকে ছুটে বেরুল; যাবার সময় আমার গালে একটা ঠোনা মেরে গেল। গুম্ গুম্ কোরে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ হলো, গজ্‌গজ্ কোরে বোক্তে বোক্তে, সদর দরজা খুলে, মাতালটা একেবারে রাস্তায় বেরিয়ে পোড়লো। দরজা খোলার শব্দ আমি শুন্‌তে পেয়েছিলেম, আমিও তখনি তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে, সদর দরজায় চাবি লাগালেম; উপরে উঠে এসে, অন্য আলমারি থেকে নূতন মদ বাহির কোরে, একে একে তিনপাত্র শেষ কোরে ফেল্লেম; সিল্‌ভিয়াকে ডাকলেম, তাকেও এক গেলাস মদ দিলেম, এক সঙ্গে খানা খেলেম; মাতালটা কিছুই খেলেনা ভেবে, মনে একটু কষ্ট থাক্‌লো।

ঘরময় কাঁচভাঙ্গা ছড়াছড়ি, মদ ছড়াছড়ি, সেই সব দেখে

সিল্‌ভিয়া আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি সব কথা তাকে বলেছিলেম। সব কথা কি, তাও বল্‌তে হয়; যে উপলক্ষে রাগারাগি হয়েছিল, তারি সংক্ষেপ কথামাত্র; বড় বড় কথাগুলো আমি গোপন রেখেছিলেম। সিল্‌ভিয়া বলেছিল, এতদিন তো এত রাগ হতো না, এখন কেন হয়? আমি বলেছিলেম, এতদিন আমি তাঁর নষ্টামির কোন তত্ত্বকথা জান্‌তে পারি নাই, এখন কতক কতক জেনেছি, সেইজন্যই তার রাগ বেড়েছে। নষ্ট লোকের গুহ্য কথা প্রকাশ হলেই, তারা একেবারে একাদশের উপর চোড়ে উঠে। যাক্‌ সে কথা,—আচ্ছা সিল্‌ভিয়া আমি যদি এখান থেকে সরে যাই, তা'হলে তুমি আমার সঙ্গে যেতে রাজি হবে কি? সিলভিয়া জিজ্ঞাসা করেছিল, সরে যাবার সংকল্প করেছ নাকি? আমি বলেছিলেম, কাজে কাজেই সংকল্প কর্‌তে হয়েছে; নিত্য নিত্য এসব কেলেঙ্কার আর সহ্য হয় না। সেই জন্য জিজ্ঞাসা করছিলেম, তুমি আমার সঙ্গে যেতে রাজি হবে কি? সিলভিয়া উত্তর করেছিল, তোমার জন্যই আমি এখানে আছি, তুমি যদি স্থানান্তরে যাও, আমাকে যদি সঙ্গে নিতে চাও, অবশ্যই আমি যাব। আমিও জ্বালাতন হয়েছি, এখানে থাক্‌তে আর এক মিনিটও আমার মন চাচ্চে না।

কথায় কথায় রাত্রি একটা বেজে গেল, সিল্‌ভিয়া আর সেখানে বেশীক্ষণ থাক্‌লো না, অন্য সময়ে পরামর্শ হবে বলে ঘর থেকে বেরুল, দরজা বন্ধ করে আমি শয়ন কল্লেম।

যে রজনীতে ডিউক ফেশিংটনের বাড়ীতে নাচের নিমন্ত্রণে গিয়েছিলেম, দিন গণনায় সেই দিন থেকে আজ পঞ্চম রজনী

আর দুদিন পরেই ডিউকের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ কর্ত্তে যাব, এইরূপ অঙ্গীকার করে এসেছি, যাবই যাব—সুবিধাও বেশ হয়েছে। ঈশ্বর মঙ্গলময়, তাঁর ইচ্ছায় যা কিছু সংঘটন হয়, সমস্তই মঙ্গলের জন্য। হোরেসের সঙ্গে আমার চটাচটিও বোধ হয় মঙ্গলের জন্য। ডিউকের সঙ্গে দেখা করে, তাঁর প্রস্তাবেই আমি সম্মতি জানাবো, নিশ্চয়ই তিনি আমাকে আশ্রয় দিবেন, তা হলেই আমি হয়তো সুখী হতে পার্ব্বো। আশায় আশায় এই রকম ভাবতে ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি; দিব্য নিদ্রা হয়েছিল; প্রভাতের পূর্ব্বে নিদ্রা ভঙ্গ হয় নাই।

প্রভাতে গাত্রোত্থান করে, নূতন রকম বসন পরিধান করে, সিল্‌ভিয়ার ঘরে আমি প্রবেশ কল্লেম। আশ্চর্য্য! সিল্‌ভিয়াকে দেখ্‌তে পেলেম্ না। একজন দাসীকে জিজ্ঞাসা করে জানলেম, ভোরে উঠে সিল্‌ভিয়া বেরিয়ে গিয়েছে। সদর দরজায় আমি চাবি দিয়ে রেখেছিলেম, চাবি আমার নিজের কাছেই ছিল, অন্য দরজা দিয়ে সিল্‌ভিয়া প্রস্থান করেছে, তাই আমি অবধারণ কল্লেম; কোথায় গিয়েছে, অনুভব কত্তে পারলেম না।

বেলা যখন প্রায় নটা, সেই সময় সিল্‌ভিয়া ফিরে এলো, হোরেস এলোনা। আমরা হাজ্‌রে খেলেম্। খানার টেবিলে বসেও, গত রাত্রের কথা তুলে, আরও পাঁচ রকম তর্ক বিতর্ক কল্লেম; সিল্‌ভিয়া আমার সকল কথাতেই হেসে হেসে সায় দিয়ে গেল।

হোরেস এলোনা। বেলা দুই প্রহর, তখনও আমরা তার আশাপথ চেয়ে থাক্‌লেম, এলোনা; বেলা একটার সময় আমরা

আহার করলেম। ক্রমেই বেলা যেতে লাগ্‌লো, সন্ধ্যা হোয়ে এলো, আমি উতলা হলেম না। রাত্রি কালেও হোরেস এলোনা। একটু বেশী রাত্রে সিল্‌ভিয়াতে আমাতে পান ভোজন সমাপন করে শয়ন কল্লেম। পরদিনও ঐ রকম হোরেস এলোনা। সেই দুদিন আমিও বাড়ী থেকে কোথাও বেরুলেম না। ডিউকের কাছে সাতদিনের অবসর নিয়ে এসেছিলেম, সেই সাত দিন অতিবাহিত। সপ্তম রজনীর প্রভাতে একবার আমি মনে করেছিলাম, সকাল বেলাই ডিউকের সঙ্গে দেখা করে আস্‌বো, কিন্তু দ্বিতীয়বার বিবেচনা করে স্থির করলেম, বৈকালে যাওয়াই ভাল। বৈকাল এলো—হোরেস এলো না, ভালই হলো। বেলা পাঁচটার সময় মনের মতন বেশভূষা সমাধান করে, সিল্‌ভিয়ার সঙ্গে আমি দেখা করলেম; সাবধান করে তারে বলে রাখলেম, আমার সঙ্কল্পের কথা অপর কেহ যেন জানতে না পারে। আমি এখন এক জায়গায় চল্লেম, আস্‌তে বোধ হয় একটু দেরী হবে; ইতিমধ্যে হোরেস যদি আসে, তাকে বলো, আমি ময়দানে বেড়াতে গিয়েছি, রাত্রি দশটার সময় আসবো।

সিল্‌ভিয়াকে এইরূপ উপদেশ দিয়ে, অশ্বারোহণে আমি ডিউক প্রাসাদে যাত্রা করলেম। যথা সময়েই নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিলেম। প্রাসাদের ফট্‌ক বন্ধ ছিল, রজতময় শৃঙ্খলে দোদুল্যমান একটি ঘণ্টা ছিল, মৃদু হস্তে তিন বার আমি সেই ঘণ্টাধ্বনি করলেম; একজন আর্দ্দালি এসে ফটক্‌ খুলে দিলে। আমার মুখে আমার অভিপ্রায় শুনে সেলাম দিয়ে, আর্দ্দালি আমার নাম জিজ্ঞাসা কল্লে; আমার সঙ্গেই আমার নাম লেখা কার্ড

ছিল, সেই কার্ডখানি তৎক্ষণাৎ আমি তার হাতে দিলেম, সে দ্রুত-গতি বাড়ীর ভিতর চলে গেল।

পূর্ব্বে বল্‌তে ভুলেছি, হোরেস আমাকে ইতিপূর্ব্বে জমিদারি দানের যে দলীলখানা লিখে দিয়ে ছিল, ডিউককে দেখাবার জন্য বাড়ী থেকে আস্‌বার সময় সেই দলীলখানা আমি সঙ্গে করে এনেছিলেম। অশ্বপৃষ্ঠে বসে বসে অনেক কথা আমি আলোচনা করলেম; লণ্ডনের বড় লোকেরা প্রায়ই খামখেয়ালী হয়, ডিউক্ যদি এখন আমার সঙ্গে দেখা করতে না চান, তা হলে তো মনের দুঃখে—দারুণ অপমানে—হতাশ হয়ে ফিরে যেতে হবে। আবার ভাবলেম, না না—ডিউক্ কেন্শিংটন সে ধরণের লোক নন্, তিনি আমাকে অবশ্যই দেখা দেবেন, অবশ্যই আদর করবেন, অবশ্যই আমার প্রতি সদয় হবেন।

ভাব্‌ছি আর্দ্দালী ফিরে এলো; ডিউক বাহাদুরের অনুকূল অনুমতি বিজ্ঞাপন কর্‌লে। ঘোড়া থেকে নেমে আমি ফটকের ভিতর প্রবেশ করলেম; আর্দ্দালী আমার ঘোড়াটিকে আস্তা-বলে নিয়ে রাখবার বন্দোবস্ত করে দিয়ে, আমার সঙ্গে আসতে লাগলো। সম্মুখের উদ্যানটি পার হয়ে আমরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করলেম, ধীরে ধীরে উপরে গিয়ে উঠলেম; যে ঘরে ডিউক্ বাহাদুর, আর্দ্দালী আমাকে সেই ঘরটি দেখিয়ে দিয়ে, সেলাম করে ধীর পদক্ষেপে নীচে নেমে গেল।

ঘরের ভিতর আমি প্রবেশ করলেম। ঘরের পূর্ব্বধারে একটি প্রশস্ত টেবিলের সম্মুখে বৃহৎ একখানি ইজি চেয়ারে ডিউক বাহাদুর উপবিষ্ট ছিলেন, সসম্ভ্রমে অভিবাদন করে আমি একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালেম। আমাকে দেখবামাত্র আসন

থেকে উঠে, সমাদরে তিনি আমার হস্তধারণ করে নিজের পার্শ্বা-সনে বসালেন, আপনিও আমার দক্ষিণপার্শ্বে উপবেশন কর্‌লেন; সহাস্যবদনে সম্ভাষণ করে বল্লেন, অলিভিয়া! তুমি ত ঠিক্ ঠিক্ বাক্য রক্ষা করেছ? তোমাকে দেখে আমি পরম সন্তুষ্ট হলেম। এখন তোমার মনের অভিপ্রায় কিরূপ, সেইটি জানবার জন্য আমার বিশেষ আগ্রহ;—দুই দিকে আমার মন দুল্‌ছে; হয়ত তোমার কথা শুনে আনন্দে আনন্দে আমি স্বর্গ হাতে পাব, না হয় ত নিদারুণ নির্ঘাত বাক্য শুনে নিরাশা-সাগরে ডুবে যাব। সুন্দরি! বেশীক্ষণ আর আমাকে সংশয়ের দোলায় দুলিও না, কি তুমি স্থির করে এসেছ, শীঘ্র প্রকাশ কর।

আমার হৃদয় কম্পিত হলো। কেমন করে, কি কথা প্রকাশ কর্ব্বো, মস্তক অবনত করে নীরবে কিয়ৎক্ষণ তাই আমি ভাবতে লাগলেম; মনে মনে আনন্দ, তথাপি কিন্তু হৃৎকম্প। টেবি-লের উপরে রকমারি ফুলদানে রকমারি সুন্দর সুন্দর ফুল সাজান ছিল, সঙ্কোচে সঙ্কোচে একটি রক্তবর্ণ পুষ্প তুলে নিয়ে, নত-বদনেই আমি সেই ফুলটি নাকের কাছে ধরে, ক্ষুদ্র বালিকার মতন খেলা কত্তে লাগ্‌লেম, উৎকণ্ঠিতস্বরে ডিউক আমাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করলেন, চুপ্ করে রইলে যে? কি তুমি স্থির করে এসেছ, কেন সেটী ব্যক্ত কচ্ছো না? কোন ভয় নাই। যদি আমার আশার অনুকূল হয়, তাও আমি শুন্‌বো, যদি প্রতিকূল হয়, তাও আমি শুন্‌বো, কিছুতেই আমার ধৈর্য্য-হানি হইবে না। বল,—বল প্রিয়—না না,—বল—সুন্দরি, কি তোমার মনের কথা?

একবার আমি তার দিকে, বক্র কটাক্ষ নিক্ষেপ কল্লেম; মুখ তুলে চাইলেম না, হেঁট মুখেই কটাক্ষ। সে কটাক্ষের প্রতি ডিউক বাহাদুরের নজর পড়ে ছিল; মৃদু হাস্য করে তিনি বলেছিলেন, প্রেমময়ি! হাঁ হাঁ,—এখন অবধি তোমাকে ঐ রকমে সম্বোধন করাই আমি উচিত বিবেচনা কচ্ছি;—প্রেমময়ি! তোমার মতন সুন্দরীদের অধিকারে যত প্রকার অস্ত্র আছে, তার মধ্যে ঐ কটাক্ষ বাণটি সত্যই একটী প্রধান অস্ত্র। ঐ কটাক্ষ আমাকে যেন বলে দিচ্ছে, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েছ। কটাক্ষের বাক্যে বিশ্বাস করেও আমি স্থির থাকৃতে পাচ্ছি না; তোমার চন্দ্রবদনে একটি মধুর বাক্য শ্রবণ কত্তে চাই। সকল দেশের কবিরাই বলে থাকেন, চাঁদের কিরণে সুধা ক্ষরণ হয়, তোমার ঐ মুখচন্দ্রের সুধা পান কত্তে আমার উন্মত্ত-চিত্ত একান্ত লালায়িত; আমি তোমার সুধা পিপাসী;—আশা করি, তোমার ঐ মুখচন্দ্র থেকে এক বিন্দু সুধা ক্ষরণ হোক।

অন্তরানন্দে আমি পুলকিতা। এতক্ষণ অধোমুখে ছিলেম, সেই সময় একবার মুখ তুলে ডিউকের মুখের দিকে নেত্র নিক্ষেপ করে, ধীরস্বরে আমি বল্লেম, তিন দিন হোরেস বাড়ী আসে নাই; আজ বেলা পাঁচটা পর্য্যন্ত আমি ঘরে ছিলেম, তখনও আসে নাই; বোধ করি আজ রাত্রেও আস্‌বে না।

স্থির নেত্রে আমার মুখ পানে চেয়ে, গম্ভীর বদনে ডিউক্ বল্লেন, তবে ত এক রকম ভালই হলো; তোমাকে আর দোষী হতে হবে না। সে যদি তোমাকে কোন মন্দ কথা বলে, তা হলে তখনই তুমি তার মুখের মতন জবাব দিতে পার্কে।

আত্ম সম্ভ্রম অন্তরে রেখে, লজ্জা খেয়ে আমি তখন বলেছিলেম, মন্দ কথা বলতে বাকি রাখেনি ;—ছেনাল বলেছে, বেইমান বলেছে, বদমাস বলেছে ; শিক্ষা দিবে বলেছে।

পূর্ব্ববৎ গম্ভীর বদনে ডিউক বল্লেন, তবে ত আরও ভাল। সে তবে তোমাকে আপনা হতেই ছেড়ে দিবার চেষ্টা করছে। সে সব কথা তুমি আর মনে রেখ না, অপমান মনে করে মনকে কষ্ট দিও না ; নষ্ট লোকের নষ্টামি অনেক রকম। স্বভাব চরিত্র বিশেষরূপ না জেনে, আগে আমি তাকে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছিলেম, ঘনিষ্টতা বেশী হওয়াতে ক্রমে ক্রমে কতক কতক বুঝতে পেরেছিলেম, এখন বুঝতে পাচ্ছি, লোকটা বহুরূপী ; সে রকম লোককে ঠিক্ চিনতে পারা বড়ই কঠিন।

একটুও চিন্তা না করে, তখনই আমি প্রতিধ্বনি করেছিলেম, লোকটা বহুরূপী ; চিন্তে পারা বড়ই কঠিন। আমাকে একখানা দলীল লিখে দিয়েছে, তার নিজ নামে একখানা জমিদারী আছে, আমার নামে সেই জমিদারীর দানপত্র। এই কথা বলেই, দলীলখানি বাহির করে তাঁকে আমি দেখালেম।

আড় নয়নে গোটাকতক অক্ষর দেখেই, বক্র-ওষ্ঠে হাস্য করে, বিকৃতকণ্ঠে তিনি বল্লেন, ভয়ঙ্কর দাগাবাজী। অক্ষরগুলি তার নিজের হাতের লেখার মতন নয় ; দস্তখৎটাও আঁকা বাঁকা ; আমার কাছে তার পাঁচ সাতখানা চিঠি আছে, নাচের রাত্রেও একখানা চিঠি পেয়েছিলেম, সে সব চিঠির দস্তখতের সঙ্গে এ দস্তখত মেলে না। এই গেল এক কথা, তা ছাড়া আরও একটা বড় কথা আছে,—তার নিজ নামে কোন জমিদারী নাই। বুড়ো রকিংহাম একেত বিষম কঞ্জুস, তার উপর ছেলের

সঙ্গে তার বনে না। ছেলেটা বদ্‌মাস হয়েছে, বুড়োটা সে কথা জানতে পেরেছে; তেমন ছেলের নামে সে যে জমিদারী করে দিবে, এটা ত কথার মধ্যেই নয়। বিশেষতঃ আমি তাদের ঘরের খবর সব জানি; ঠিক ঠিক খবর রাখি; হোরেসের নামে কোন জমিদারী নাই। কথাটাও জাল. দলীলখানাও জাল।

আমার ভাইকে চেক্ দিয়েছিল, বেনামী চিঠিতে আমার মা বাপকে টাকা পাঠায় বলেছিল, ডিউক্ বাহাদুরকে সেই দুটো কথা বলি বলি মনে করেছিলেম, ঠোঁটের আগায় কথাও জুগিয়ে ছিল, কিন্তু দরকার নেই ভেবে, চেপে গিয়েছিলেম। সে দুটো কথা চেপে রেখে, ডিউকে আমি শেষে বলেছিলেম, আর একটি যুবতী কুমারীকে হোরেস মজাচ্ছে; সেই কুমারীকে বিয়ে কত্তে চেয়েছে, ঐ জাল জমিদারীটা তার নামেও লিখে দেবে বলেছে। দৈবযোগে সেই কুমারীর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, তারি মুখে আমি এই সব কথা শুনেছি; তার নাম হচ্ছে কুমারী পম্পা।

কি জানি কেন, পম্পা নাম শুনেই ডিউকের প্রশান্ত গম্ভীর বদন সহসা আরক্ত হয়ে উঠলো। সক্রোধে তিনি বল্লেন, ওঃ! সে জুয়াচোরের অসাধ্য কর্ম্ম নাই। আর আমি তার মুখদর্শন কর্ব্বো না, তুমিও আর সে বাড়ীতে যেও না, আজ অবধি তুমি আমার হও, আজ অবধি এই আশ্রমেই তুমি বাস কর, এ আশ্রমটি তুমি তোমার নিজের আশ্রম মনে করো; সে বাড়ীতে আর যেও না। যার কথা তুমি বল্লে, সেই পম্পাকে আমি জানি; একটু দূর সম্পর্কে সে আমার ভগ্নী হয়,—একজন

সম্পর্কীয় পিতৃব্যের কন্যা। তার সঙ্গে আমার বিবাহের কথা হয়েছিল, ছুঁড়ীটা ভারি রোগা, সেই জন্য তাকে বিয়ে কত্তে আমি রাজী হই নাই। সেই পম্পা এখন পাকা বদমাসের কায়-দায় পড়েছে; বিবাহের কথাটাত সবই মিথ্যা, পম্পা যদি সত্য সত্য তার দমে মজে, তা হলে নিশ্চয়ই হোরেস তার ইহকাল পরকাল মাটি কর্ব্বে; তুমি আর হোরেসের জুয়াচুরির আড্ডায় যেও না।

দফায় দফায় আমার চৈতন্য জন্মাতে লাগলো; জুয়াচুরির আড্ডায় যাব না, মনে মনে ঠিক্ সেই সংকল্প করলেম; তথাপি আস্তে আস্তে একবার বলেছিলেম, একটি বার যেতে হবে।

সন্দিগ্ধ স্বরে ডিউক জিজ্ঞাসা করলেন, কি জন্য? সেখানে কি তোমার কোন রকম মূল্যবান জিনিসপত্র আছে?

আমি উত্তর করেছিলেম, জিনিসপত্রের মায়া আমি রাখি না; অলঙ্কারগুলি আমার অঙ্গেই আছে, জামা, ঘাগ্‌রা, টুপি, শাল, সে সব সামান্য জিনিসে আমার দরকার নেই। সে সব জিনিসে আগুন লেগে যাক্, জিনিসের জন্য আমি যাব না; সেই যে আমার সহচরীটি, যাকে আমি নাচের মজলিসে সঙ্গে করে এনে ছিলেম, যাকে আপনি দেখেছিলেন, সেইটীকে আন্‌বার জন্যই যেতে চাচ্ছি।

ডিউক বল্লেন, সে জন্য তোমাকে যেতে হবে না, কৌশল করে তাকে আমি এইখানে আনাব। কি নাম তার? হাঁ,—সিল্‌ভিয়া; মেয়েটি বেস;—তার সঙ্গে কথা কয়ে আমি খুসি হয়েছি, কল্যই আমি তাকে এই বাড়ীতে আনাব। তুমি আমার হও। তোমাকে বিয়ে করে আমি তোমার সর্ব্ব কষ্ট নিবারণ কর্ব্বো, আমাকে যদি তুমি—

কথায় বাধা পড়ে গেল। দুহাতে দুটি সেজ নিয়ে একজন পরিচারক সেই গৃহ মধ্যে প্রবেশ কল্লে। সেজ দুটি টেবিলের উপর রেখে, বাতি জ্বেলে দিয়ে পরিচারক বিনা বাক্যব্যয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ডিউকের সঙ্গে ব্যাক্যালাপে আমি অন্য মনস্ক ছিলেম, সন্ধ্যা হয়েছিল, সেটা জানতেই পারি নাই। মনে মনে আমি ঈশ্বরের উপাসনা কল্লেম; ডিউক্ বাহাদুর সে রকম কিছু কল্লেন কিনা, বুঝলেম না; বোধ হয়, কল্লেন না। ইংলণ্ডের বড় লোকেরা বড় একটা উপাসনার ধার ধারেন না; লোক দেখাবার জন্য কিম্বা অন্য কোন মতলবে কেহ কেহ রবিবারে রবিবারে গির্জ্জায় যান, সেটা কেবল ভণ্ডামি। সাহেবেরাও যান, বিবিরাও যান, সকলে কিছু ভজনা কত্তে যান না, গুহ্য গুহ্য মতলব থাকে। যুবা যুবা সাহেবেরা যান বিবি পছন্দের জন্য, যুবতী যুবতী বিবিরা যান দলের ভিতর বর পছন্দ করবার জন্য। সত্য সত্য ভজনার জন্য অতি অল্প লোকেই গির্জ্জামন্দিরে দর্শন দেন। ইংলণ্ডের বড় লোকেরা কেবল টাকা ভাল বাসেন, ঈশ্বরের প্রতি অথবা ঈশ্বরের পুত্রের প্রতি ভক্তি অপেক্ষা টাকার প্রতিই তাঁদের ভক্তি অধিক।

এই সব আমি মনে মনে আলোচনা করেছিলেম। এক দৃষ্টে আমার মুখ পানে চেয়ে, ডিউক বাহাদুর চুপটি করে বসেছিলেন, কি যেন ভেবে, মৃদুস্বরে হঠাৎ বল্লেন, কি কথা বলছিলেম!—হাঁ,—আমাকে যদি তুমি দয়া করে বিবাহ কর, তা হলে আমি পৃথিবীর সমস্ত সুখ তুচ্ছ মনে কর্ব্বো। আমাদের এখন একটু রসালাপ করবার প্রয়োজন হচ্ছে।

এই কথা বলে, আসন থেকে উঠে, অগ্রে তিনি ঘরের দরজা

বন্ধ করে দিলেন, তারপর আলমারি থেকে তখনকার উপযুক্ত সরঞ্জামগুলি বাহির করে, টেবিলের উপর রাখলেন। পাত্রে পাত্রে সুধা পরিপূর্ণ হলো, উভয়েই আমরা সুধা পান কল্লেম। তিন তিন পাত্রের সুবিচারের পর মৃদু মৃদু হেসে, একটু রহস্য করে আমি বল্লেম, একটু আগে আপনি আমাকে বলেছিলেন, তোমার ঐ মুখচন্দ্র থেকে এক বিন্দু সুধাক্ষরণ হোক্। এখন দেখুন, আপনার ঐ বোতলের মুখচন্দ্র থেকে কেমন সুমধুর সুধা-ক্ষরণ হচ্ছে।

মধুর মধুর হাস্য করে, ডিউক্ বাহাদুর আনন্দে গাঢ় অনু-রাগে তিনবার আমার মুখচুম্বন কল্লেন। মজলিসের রজনীতে তাঁর ঐ রকম সোহাগে আমি যেন অসাড় হয়েছিলেম; একটি অঙ্গও পরিচালন করি নাই। কিন্তু এই রাত্রে রোমাঞ্চিত কলেবরে আমি তাঁর মধুর চুম্বনের উচিত মত পরিশোধ কল্লেম।

ডিউকের আশ্বস্ত হৃদয়ে প্রেমানন্দের লহরী ছুট্‌লো। চতুর্থ পাত্রের মানরক্ষার পর, প্রফুল্লবদনে তিনি আবার বল্লেন, আমার আশা পূর্ণ হয়েছে; তোমাকে বিবাহ করে আমি নির্ম্মল সুখের অধিকারী হব, দিবারাত্রি প্রেম-সাগরে সাঁতার খেলব। এই কথার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বার চুম্বন; দ্বিতীয় বার আমারও প্রতিচুম্বন।

পঞ্চম পাত্রের আবাহন ও বিসর্জ্জন। অকস্মাৎ আমার মনে নূতন ভাবের উদয়! সংশয়কে সম্মুখে রেখে, বাহ্য লক্ষণে আতঙ্ক জানিয়ে, ডিউককে আমি বল্লেম, লণ্ডনে আমি থাক্‌বো না। আপনি যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেন, আপনার সঙ্গে

যদি আমার বিবাহ হয়, তা হলেও আমি লণ্ডনে থাকতে পার্ব্বো না।

বিস্মিত হোয়ে ডিউক জিজ্ঞাসা কর্লেন, কেন? লণ্ডন কি ভাল জায়গা নয়? লণ্ডনের হাওয়া কি তোমার গায়ে সহ্য হচ্ছে না? রাজধানী জায়গা, সর্ব্ব সুখের আকর, রাজধানীতে তুমি থাকতে পার্ব্বে না কেন?

আমি উত্তর কোরেছিলেম, রাক্ষসের ভয়ে। লণ্ডনে আমি আছি, লণ্ডনে আমি থাকি, হোরেস যদি এ সন্ধান জান্তে পারে,—পার্ব্বেই নিশ্চয়, বাড়ীতে আমাকে দেখতে না পেলেই পাঁচ জায়গায় অন্বেষণ কোর্ব্বে, গুপ্তচর ভেজাবে, গোপনে গোপনে সন্ধান রাথ্বে,—আমি কিছু আপনার বাড়ীতে কয়েদীর মতন থাক্‌বো না, কাজের অনুরোধে, বেড়াবার অনুরোধে, অবশ্যই আমাকে বেরুতে হবে, কাহারও মুখে হোরেস অবশ্যই সে সংবাদ শুনতে পাবে, কোন দিন না কোন দিন সে হয়তো নিজেই আমাকে দেখতে পাবে, তখন আর আমি লুকিয়ে থাকতে পার্ব্বো না, রাক্ষস আমার উপর বিষম দৌরাত্ম্য আরম্ভ কোর্ব্বে, হয়তো আপনার সঙ্গেও শত্রুতা দাঁড়াবে। সেই জন্যই বল্‌ছি, লণ্ডনে আমি থাক্‌বো না।

তৃতীয়বার চুম্বন কোরে, ডিউক বাহাদুর বোল্লেন, ঠিক কথা বলেছো। ওটা আমি আগে ভাবি নাই। লণ্ডনে থাকা হবে না, বিবাহটিও লণ্ডনে হবে না; তোমাকে নিয়ে আমি এডিনবরায় চলে যাবো। এডিনবরা নগরটি অতি রম্যস্থান, প্রায় বারমাস সেখানে বসন্ত ঋতু বিরাজ করে, প্রকৃতির শোভাও নয়ন-মোহিনী—চিত্ত-মোহিনী; সেই খানেই তোমাকে

নিয়ে যাবো, সেই খানেই বিবাহ হবে। কল্যই আমি তোমার সিল্‌ভিয়াকে এইখানে আনাবো, কল্য রাত্রেই এডিনবরায় রওনা হবো।

আমি আশ্বস্ত হোলেম। হোরেসের বাড়ীতেও যাব না, লণ্ডনেও থাকবো না, সেই পরামর্শই স্থির। তথাপিও ডিউক বাহাদুরকে আমি বোল্লেম, আজ রাত্রে একবার আমি সেখানে যাই; কি জানি, হোরেস যদি আসে, আমাকে দেখতে না পেয়ে, আরো চোটে যেতে পারে। তার চটাতে আমি ভয় করিনি, তবু কাজ কি,—দু একদিনের জন্য মিছামিছি কেলেঙ্কার করায় কাজ কি,—একবার আমি যাই, সে যদি আসে, রয়ে যাব, না যদি আসে, সিল্‌ভিয়াকে নিয়ে এই রাত্রেই আমি চলে আস্‌বো; কল্য রাত্রে আমরা তিন জনেই লণ্ডন ছেড়ে চলে যাবো। তা যদি না হয়, হোরেস যদি আজরাত্রে আসে তা হোলে একটা দিন দেরি হবে, এই পর্য্যন্ত কথা।

ডিউক বাহাদুর বিস্তর নিষেধ করলেন, আমি শুনলেম না; আর এক পাত্র সুধা পান করলেম, আমার আশ্রয়দাতাকে এক পাত্র দান করে, উল্লাসে উল্লাসে তারে চুম্বন করলেম; তিনি আমার কটিদেশ বেষ্টন করে প্রেমাদরে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করলেন।

* * * * *

রাত্রি দশটা। ডিউকের নিকট বিদায় গ্রহণ করে অশ্বারোহণে আমি প্রস্থান করলেম।

হোরেস আসেনি, সিলভিয়াকে আমাদের সংকল্পের কথা জানালেম। সেই রাত্রেই সেই রাক্ষসপুরী পরিত্যাগ করা

সিলভিয়ার ইচ্ছা হলো। পূর্ব্বে আমি ডিউকের কাছে বলেছিলেম, পোষাক গুলোতে আগুন লেগে যাক, কিন্তু দুটি তিনটি পোষাকের উপর আমার কিছু মায়া বসেছিল, সেই তিনটি পোষাক আমি সংগ্রহ করলেম। সেই সময় আর একটা কথা মনে পড়েছিল। এক রাত্রে আমার একটা দরকারের জন্য হোরেসের কাছে আমি কিছু টাকা চেয়েছিলেম, সে রাত্রে পাই নাই; পাঁচ রাত্রি পরে হোরেস এক তাড়া নোট এনে, নেশার ঝোঁকে, টেবিলের নীচে ফেলে রেখেছিল, মাতাল ঘোর নিদ্রায় অচেতন হবার পর সেই তাড়াটা আমি কুড়িয়ে এক জায়গায় লুকিয়ে রেখেছিলেম। মাতালের সে কথাটা আর মনে ছিল না। যেখানে আমি রেখেছিলেম, তাড়াটা প্রায় এক মাস সেইখানেই ছিল; সেই নোটের তাড়াটা আমি বাহির করে নিলেম। চুরি করা হলো না, সে রকম কাজকে চুরি করা বলে না; কারণ আমি চেয়েছিলেম, আমাকে দিবে বলেই মাতাল সেই নোটগুলি এনেছিল, আমাকে দিতে পারে নাই, নেশার ঝোঁকে ফেলে রেখেছিল, হয়তো মনে করেছিল হারিয়ে ফেলেছে; কোন কথাই আমাকে জিজ্ঞাসা করে নাই। ধর্ম্মানুসারে সে নোটগুলি আমারি; আমার নোট আমি গ্রহণ করলেম, ধর্ম্মের বিচারে সেটা চুরি হতে পারে না। পোষাকগুলির সঙ্গে সেই নোটের তাড়াটি আমার পোর্টমেণ্টতে রেখে সিলভিয়ার হাতে দিলেম; দুজনেই চুপি চুপি উপর থেকে নেমে এলেম।

রাত্রি দুই প্রহর। বাড়ীর দাসী চাকরেরা সকলেই নিজ নিজ ঘরে নিদ্রাগত। সদর দরজা খুলে আমরা বেরুলেম।

বাড়ীর পাশেই আস্তাবল; আমার অশ্বটী আস্তাবলের নিকটেই বেঁধে রেখেছিলেম, আস্তাবল থেকে আর একটি অশ্ব বাহির কোরে জিন্ লাগাম দিয়ে সাজালেম, দুজনে আমরা দুটি ঘোড়ার সওয়ার হোয়ে, অল্পক্ষণ চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত কোরলেম; কোন দিকেই কেহ ছিল না, বিজনপথে বায়ুবেগে আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেম; আধ ঘণ্টার মধ্যেই ডিউকের বাড়ীতে হাজির।

পঞ্চদশ তরঙ্গ।

নূতন আশ্রম।

রাত্রেই আমি ফিরে এলেম, সহচরী সিল্‌ভিয়া আমার সঙ্গে, তাই দেখে ডিউক বাহাদুর বিশেষ সন্তুষ্ট হলেন, আমার বুদ্ধির প্রশংসা কোর্‌লেন, যে কথা আমি বোলে গিয়েছিলেম, সেই কথার সত্যতা দেখালেম, তাই বুঝেই ডিউকের বেশী আনন্দ। রাত্রেই আমি ফিরবো, অনুমানে সেটী হয়তো তিনি জান্‌তে পেরেছিলেন, সেই জন্যই তত রাত্রি পর্য্যন্ত শয়ন করেন নাই, নির্জ্জন ঘরে একাকী বোসে বোসে একটু একটু মদ খাচ্ছিলেন, আর একখানি সঙ্গীত পুস্তক মাঝে মাঝে উল্টে পাল্টে দেখ্‌ছিলেন। সেই ঘরেই আমরা উপস্থিত হোয়েছিলেম। রাত্রি অধিক হোয়েছিল, তথাপি তিনি আমাদের এক এক পাত্র মদ্য গ্রহণের অনুরোধ কোল্লেন, অশ্বের দ্রুতধাবনে আমরাও ক্লান্ত হোয়েছিলেম, বিনা ওজরে সেই অনুরোধ পালন কোরলেম।

রাত্রি যখন একটা, সেই সময় শয়ন। পাশের একটী সজ্জিত কক্ষে দুটি শয্যা; এক শয্যায় আমি, দ্বিতীয় শয্যায় সিল্‌ভিয়া, ডিউক বাহাদুর তাঁর নিজের শয়নকক্ষে প্রবেশ কোরলেন।

পরদিন প্রভাতে হাজরে খাবার সময় ডিউককে আমি বোলেছিলেম, আজ দিনমানটি আমি লণ্ডনে আছি, একটী

আলাপী লোকের সঙ্গে একবার দেখা কোত্তে ইচ্ছা করি, অধিকক্ষণ বিলম্ব হবে না, এক ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আস্‌বো। ডিউক বাহাদুর সম্মতি দিয়েছিলেন, হাজরে খানার পরেই আমি বেরিয়েছিলেম। সিল্‌ভিয়াকে সঙ্গে নেই নাই, একাকিনী। অশ্বারোহণে যাই নাই, ডিউকের গাড়ীতেও যাই নাই, একখানা ঠিকা গাড়ী ভাড়া করেছিলেম।

ঠিকানাটি আমার ঠিক মনে ছিল, গাড়োয়ানকে হুকুম দিয়েছিলেম, গ্রস্‌ ষ্ট্রীট। বিশ মিনিটের মধ্যে গ্রস্‌ ষ্ট্রীটে গাড়ী পৌঁছিল, একটী লোককে জিজ্ঞাসা করে বাড়ীখানির সন্ধান জেনে নিয়েছিলেম, বড়লোকের বাড়ীর সন্ধান জানা অতি সহজ, অল্প দূর গিয়েই বাড়ীখানি আমি দেখতে পেলেম। বৃহৎ অট্টালিকা ;—মারকুইস হংগারের সুদৃশ্য নিকেতন।

দ্বাররক্ষককে কার্ড দিয়ে, অনুমতি আনিয়ে, বাড়ীর মধ্যে আমি প্রবেশ করলেম।

গাড়ীখানা বিদায় করে দিলেম না, সেই গাড়ীতেই ফিরে যাব, গাড়োয়ানকে সেই কথা বল্লেম, একটু তফাতে গাড়ীখানা দাঁড়িয়ে থাকলো।

যে গৃহে মারসনেস্‌ হংগার, ওরফে বিবি পিথারিণ, একজন পরিচারিকা সেই গৃহে আমাকে নিয়ে গেল। মারসনেস খানিকক্ষণ আমার মুখ পানে চেয়ে চেয়ে, পূর্ব্বস্মৃতি জাগিয়ে যথেষ্ট সমাদরে আমার অভ্যর্থনা করলেন। একখানি সোফার উপর তিনি বসেছিলেন, হস্তধারণ করে পার্শ্বেই আমাকে বসালেন ; পরস্পর কুশলবার্ত্তা বিনিময়ের পর আমি আমার তখনকার অবস্থার সমস্ত কথা তাঁকে বল্লেম। একটু বিস্ময়ে,

একটু সন্দেহে, একটু সঙ্কোচে তিনি বল্লেন, এই রকম হবে, তা আমি জানতেম; হোরেসের চরিত্রে আমি ভুক্তভোগী; তাকে তুমি ছেড়েছ; বেশ হয়েছে, পম্পাও আমার বিশেষ পরিচিতা, আমি তার মঙ্গল কামনা করি, তাকেও আমি সাবধান করে দিব। ডিউক ফেলিংটন তোমাকে ভাল বেসেছেন, মন্দ কথা নয়; তাঁর বাড়ীতে নাচের মজ্‌লিসে আমি গিয়েছিলেম, ডিউকের সঙ্গে তুমি নেচেছিলে, তাও আমি দেখেছিলেম; তিনি তোমাকে এডিনবরায় নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, যাও, কিন্তু সাবধান; এ রাজ্যের বড় বড় লোকের সন্তানেরা প্রায়ই মেয়ে মানুষের সঙ্গে খোলসা ব্যবহার করেন না। তুমি এখন ডিউকের সঙ্গে যেতে চাচ্ছ, যাও, যদি তিনি তোমাকে বিবাহ করেন, তবে থেকো, বিবাহ যদি না করেন, আজ হবে, কাল হবে, দশ দিন পরে হবে, এই রকম যদি টাল দেন, তা হলে পালিয়ে এসো। জগদীশ্বর করুন, তোমার মঙ্গল হোক্।

একবারও মারসনেসের কথার উপর কথা ফেলে আমি বাধা দিলেম না, স্থির হয়ে চুপ করে সব কথাগুলি শুন্‌লেম; তার পর গোটা কতক বাজে কথা। আধ ঘণ্টা থেকেই আমি বিদায় গ্রহণ কল্লেম।

ডিউকের প্রাসাদে যখন আমি ফিরে এলেম, বেলা তখন এগারটা। কোথায় আমি গিয়েছিলেম, ডিউক সে কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন না, সিল্‌ভিয়াও জিজ্ঞাসা কোল্লে না, কৈফিয়তের দায় থেকে আমি নিস্তার। সেই রাত্রে আহারাদির পর আমরা এডিনবরায় যাত্রা কোল্লেম। পথে দুই তিন জায়গায়

আড্ডা কোত্তে হোয়েছিল। শীঘ্র গমনে যত দিন লাগে, তার চেয়ে আমাদের দুই দিন বেশী হয়েছিল।

স্কটলণ্ডের রাজধানী এডিনবরা। পরম রমণীয় স্থান। ডিউকের মুখে যেরূপ বর্ণনা শুনেছিলেম, চক্ষে সেই রূপ দর্শন কোল্লেম। ভারতবর্ষ আমি দেখি নাই, ইতিহাস পুস্তকে ভারতবর্ষের যেরূপ বর্ণনা পাঠ করেছি, স্কটলণ্ডের প্রকৃতি ও বাহ্য শোভা প্রায় তদ্রূপ। এডিনবরা সহরে আমি নূতন আশ্রম প্রাপ্ত হোলেম। আশ্রমটি পরম সুন্দর। অতি সুন্দর দ্বিতল অট্টালিকা, নীচে উপরে অনেক গুলি ঘর, উপরের তিনটি ঘর, পরিপাটিরূপে সজ্জিত; দক্ষিণ দিকে সুপ্রসস্ত নাচ ঘর; সময়ে সময়ে সেই ঘরে বড় বড় মজলিস্ হোতে পারে। দোতালার ছাতে উঠিলে দূরবর্ত্তী পর্ব্বতের শোভা দেখা যায়। আশ্রমটি আমার বেশ পছন্দ হোলো। লণ্ডনে প্রথম প্রথম এক প্রকার ভোগ সুখে মন কতকটা ভাল ছিল, শেষকালে যারপর নাই যাতনা ভোগ কোরেছি; হৃদয় উত্তপ্ত হোয়েছিল, এডিনবরায় গিয়ে আমি যেন কতই শান্তি পেলেম, মাথা জুড়লো, হৃদয় জুড়লো, প্রাণ জুড়লো।

লণ্ডন থেকে আসবার সময় দুজন চাকর আমাদের সঙ্গে এসেছিল, বাকী যে সকল লোকজন দরকার, এডিনবরাতেই সে সকল দাসদাসী নিযুক্ত করা হয়েছিল; একমাস আমরা দিব্য সুখ-সচ্ছন্দে এডিনবরায় বাস কোল্লেম। বিবাহের কথা উত্থাপন হয়, ডিউক বলেন, কিঞ্চিত বিলম্ব আছে, এখানকার পুরোহিতের দ্বারা সে কার্য্য হবে না; লণ্ডনে আমাদের বংশের কুল পুরোহিত আছেন, তাঁরা পুরুষানুক্রমে আমাদের যাজকতা

করেন; যিনি এখন বর্ত্তমান, তাঁকেই আনতে হবে। ব্যস্ত হবার প্রয়োজন নাই; বিবাহের পূর্ব্বে কতদিন কত লোকের কোর্ট-সিপ্ চলে; বিলম্বে বিবাহ হলেও ভালবাসার অঙ্গ হানি হয় না। প্রেমের যেরূপ মহিমা, মনের মিলন থাক্‌লে সে মহিমার কোন অঙ্গ অসিদ্ধ থাকে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, যত শীঘ্র হয়, পুরোহিতকে আমি আনাবো, দুই এক মাসের মধ্যেই বিবাহ হোয়ে যাবে। যদি কিছু বিলম্ব হয়, তাতে আমাদের ভালবাসা অঙ্গহীন থাকবে না, অঙ্গীকারও ভঙ্গ হবে না।

আমার মন চিরদিন সরল; যে কথা বোলে ডিউক আমাকে প্রবোধ দিলেন, তাতেই আমি বিশ্বাস করলেম। আরও এক মাস অতিবাহিত হলো। এক একবার মনে হয়, ডিউক হয়তো কপটতা কোরে আমাকে ভুলিয়ে রাখছেন, তখনি আবার অনুতাপ আসে; আপনাকে আপনি তিরস্কার করে মনকে বুঝাই, ডিউকের উপর সন্দেহ কেন কর? এমন উদার স্বভাব যাঁর, তিনি কি প্রতারণা কর্ত্তে জানেন? তা যদি জান্‌তেন, তা হলে একটা প্রতারকের হাত থেকে আমাকে উদ্ধার করে আনবেন কেন? অবশ্যই তিনি সত্য পালন করবেন, অবশ্যই তাঁর সঙ্গে পরিণয়-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে, সংসারে আমি সুখী হতে পার্ব্বো।

সংশয়কে দূর কোরে দিয়ে, মনে মনে আমি ঐ রকম প্রবোধ পাই; নানাপ্রকার ভোগ-বিলাসে, ডিউকের সহবাসে নিত্য নিত্য আমি নূতন নূতন সুখানুভব করি। যতদূর সাধ্য ডিউককেও সুখী করবার চেষ্টা পাই; যাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন, সেই রকম ব্যবহার কোত্তে সর্ব্বক্ষণ আমি যত্ন

করি। আমার মন যাতে ভাল থাকে, ডিউক্ বাহাদুর সেই চেষ্টায় আমাকে নানাস্থানে বেড়াতে নিয়ে যান, স্বভাবের শোভা দেখান, পর্ব্বতের ঐশ্বর্য্য দেখান, বড়লোকের মজলিসে নিমন্ত্রণ হলে আমাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে যান, সহরে যত গুলি আমোদের স্থান, সে সকল স্থানেও মধ্যে মধ্যে আমাকে নিয়ে গিয়ে যথেষ্ট আনন্দ প্রদান করেন; তাতেই আমি ভুলে থাকি, বেশ সুখে সুখে, আমোদ আহ্লাদে, কৌতুকে কৌতুকে দিন কেটে যায়।

আরো এক মাস। সেই সময়ে আমি আর একদিন বিবাহের কথা উত্থাপন কোরেছিলেম; ডিউক আমাকে চুম্বন কোরে আদর জানিয়ে, হাস্‌তে হাস্‌তে বোলেছিলেন, স্ত্রী-জাতির মনে সন্দেহটা বেশী প্রবল বুঝ্‌তে পাচ্ছি, আমার উপর তুমি কোন রকম সন্দেহ কর। প্রিয়তমে! সন্দেহ রেখো না, মনে কোন প্রকার কুতর্ক এনো না, পরমেশ্বরের নাম কোরে আমি বল্‌ছি, তোমার সঙ্গে আমি কোন রকম চাতুরী খেল্‌বো না। আমি হোরেস নই, মাথার উপর ধর্ম্ম আছেন, ধর্ম্মকে আমি বড় ভয় করি। হোরেসটার ধর্ম্ম-জ্ঞান নাই, কাণ্ডাকাণ্ড বিবেচনা নাই, অঙ্গীকার পালনে প্রবৃত্তি নাই, সেইজন্যই পদে পদে তোমার সঙ্গে প্রতারণা খেলেছে, সে রকম প্রতারণা কদাচ আমার মনে স্থান পায় না; আমি প্রবঞ্চনা জানি না, ছলনাও জানি না, অবলা রমণীকে ভোগা দিয়ে নষ্ট করা আমার ধর্ম্ম নয়। কেন তুমি বিমনা হও? কেন তুমি বিপরীত ভাবো? কেন তুমি উতলা হও? বিবাহের প্রতিজ্ঞা আমি ভুলি নাই; তোমার সঙ্গে আমার বিবাহ হবেই হবে;

বিধাতা যদি বিমুখ না হয়, অকালে যদি আমি পৃথিবী পরিত্যাগ কোরে না যাই, তা হোলে কদাচ আমার বাক্যের অন্যথা হবে না।

অপ্রতিভ হোয়ে আমি বোলেছিলেম, অত কথা আপনি কেন বোলছেন? আপনার উপর আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই, আমার হৃদয়ের সম্পূর্ণ বিশ্বাস আপনার উপর,—আমার ভাগ্যের শুভাশুভ পরীক্ষা আপনার কাছেই হবে, দৃঢ় প্রত্যয়ে সর্ব্বদাই তাই আমি মনে করিব। তবে কি জানেন,—বিবাহটা যত শীঘ্র সম্পন্ন হয়, ততই মঙ্গল। বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রীপুরুষে বেশী বেশী ঘনিষ্ঠতা দেখ্‌লে, অপর লোকে নিন্দা কোর্‌তে পারে।

পুনর্ব্বার আমাকে একটি চুম্বন কোরে, প্রসন্নবদনে ডিউক বাহাদুর বল্লেন, লোকনিন্দার ভয়ে তুমি ম্রিয়মাণা হও, সেটা আমি বুঝতে পারি, কিন্তু প্রাণেশ্বরি? এদেশের লোকনিন্দার ভয় তুমি রেখো না। এদেশের 'লোকেরা—বেশীর ভাগ অবোধ লোকেরা মিছামিছি ভাল লোকের নিন্দা করে; আপনারা যে কাজ করে, সকল লোকেই সেই কাজের কাজি, তাই তারা মনে করে থাকে। সৌখিন রমণীদলের কতকগুলি গর্ব্বিতা রঙ্গিণী আছে, তারা অত্যন্ত হিংসা-পরায়ণা;—রঙ্গরস করে, ক্রীড়া কৌতুক করে, গর্ব্বভরে পরিহাস করে,—সব করে, তথাপি তাদের বুকের ভিতর গুমে গুমে হিংসার আগুন জলে। লোকনিন্দার কথা তুমি ভেবো না।

আমি বলেছিলেম, তাতো আমি ভাবি না, ভবিষ্যৎ ভেবে আপনাকে আমি বলেছি, বিবাহের পূর্ব্বে স্ত্রী পুরুষে বেশী বেশী

ঘনিষ্ঠতা দেখলে অপর লোকে নিন্দা করতে পারে। সে কথাটা বলাতে বোধ করি কোন দোষ হতে পারে না। আচ্ছা মাই লর্ড! শীঘ্র শীঘ্র আমাদের বিবাহ হবার বাধা কি?

ডিউক বাহাদুর বল্লেন, বাধা?—বাধা কিছুই নাই। প্রায় সর্ব্বদাই আমি লণ্ডনের খবর পাই; সম্প্রতি শুনেছি, আমাদের সেই পাদ্‌রিটির শরীর বড় অসুস্থ হয়েছে;—বাত, কাশি, উদরাময় এই তিন প্রকার রোগে তিনি শয্যাগত আছেন, তাঁকে আমি সংবাদ দিয়ে রেখেছি, একটু আরাম হলেই তিনি এখানে আসবেন; তিনি এলেই শুভ বিবাহ সমাধা হয়ে যাবে; কিছুমাত্র বিলম্ব হবে না।

আবার আমি সেই কথাতেই প্রবোধ পেলেম। যে রকম আমোদ আহ্লাদ, ক্রীড়া কৌতুক, রসাভাষ, ইত্যাদি চলে আসছিল, দিন দিন সেই রকম চলতে লাগ্‌লো অনেকগুলি সৌখিন কামিনীর সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হলো, বড় ঘরের দুটি পাঁচটি যুবা পুরুষের সঙ্গেও আমার বন্ধুত্ব জন্মালো; তাঁরাও আমাদের বাড়ীতে আসেন, আমিও এক একদিন তাঁদের এক একজনের বাড়ীতে যাই, মর্য্যাদা মত আমোদ প্রমোদ বেশ চলে। একদিন একটি উপাধিধারিণী সম্ভ্রান্ত মহিলা সকৌতুকে আমাকে বলেছিলেন, দুদিন পরেই হোক্, দশদিন পরেই হোক্; কিম্বা দুই এক মাস বিলম্বেই হোক্, তুমি আমাদের পদমর্য্যাদার সমান সমান অংশী হয়ে দাঁড়াবে, বিনা সঙ্কোচে বড় বড় দলে স্বচ্ছন্দে মিশতে পারবে, কেহ আর তখন তোমাকে উপাধিশূন্য বলে উপেক্ষা করতে পারবে না। একজন মহামান্য ডিউকের সঙ্গে তোমার বিবাহ হবে, সেই গৌরবে

সেই দিনেই তুমি মহা গৌরবিনী ডচেস্ উপাধির অধিকারিণী হবে; লোকে তোমাকে গৌরবিনী লেডি বলে সমাদর কোর্ব্বে। ডিউক কেশিংটন তোমাকে এখানে এনেছেন, প্রাণে প্রাণে ভাল বেসেছেন, অচিরেই তোমার পাণি গ্রহণ করবেন, তাতে আর একটুও সন্দেহ নাই। আমরাও বুঝেছি, তুমি তাঁর মনের মতন উপযুক্ত পাত্রী, পরিণয়-সূত্রে নিবদ্ধ হয়ে উভয়েই তোমরা সমান মান গৌরবে বিমলানন্দ উপভোগ কর্ব্বে।

বড় ঘরের একটি বড় দরের বড় বিবির মুখে ঐরূপ কথা শুনে, আমার মনে নূতন আশার সঞ্চার হয়েছিল, উচ্চ আশা জেগে উঠেছিল; সসম্মানে বিবিটিকে ধন্যবাদ দিয়ে, আমি তাঁর কল্যাণ কামনা করেছিলেম। আরও দু-তিনটি বিবিও আমার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্যের দৈববাণী করে, আমার মনকে নূতন প্রকার উৎসাহে—নূতন প্রকার আনন্দে মাতিয়ে তুলে ছিলেন। তাঁদের কথাই আমার সত্য বলে বিশ্বাস হয়েছিল।

পৃথিবীর মনুষ্যেরা যে যেখানে যে অবস্থাতেই থাকুক, সকলেরই এক এক রকমে দিন যায়। দিনের গতি অবিরাম; দিন চিরদিন ক্রমাগত সমভাবে চলে চলে যায়। যে রমণী রাজ-প্রাসাদে রাজসিংহাসনে উপবেশন করে পৃথিবীতে স্বর্গের সুখ উপভোগ করেন, তাঁরও দিন যায়, যে দুঃখিনী উদরান্নের জন্য কেঁদে কেঁদে, পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়ায়, আশ্রয়াভাবে বৃক্ষতলে শয়ন করে, তারও দিন যায়; দিন কাহারও জন্য বসে থাকে না; এডিনবরা সহরে লণ্ডনের একজন ডিউকের আশ্রয়ে আমি আছি, সুখে সুখে আমারও দিন চলে যাচ্ছে। ডিউকের কাছে যা যখন চাই, তাই তখনই পাই। নগর

টাকা, মূল্যবান অলঙ্কার, অন্য কোন প্রকার মহামূল্য পদার্থ, যা যখন আমি ডিউকের কাছে প্রার্থনা কচ্ছি, বিরুক্তি না করে, তাই তখনই তিনি আমাকে প্রদান কচ্ছেন; মানুষের মনে সম্ভবত যত প্রকার বিলাস বাসনা উদয় হতে পারে, আমার মনেও সেই রকম বাসনার অভ্যুদয় হয় না; একটি বাসনাও অপূর্ণ থাকে না। এক কথায় এডিনবরা নগরে সর্ব্বাংশেই আমি সুখে আছি। সুখের দিন ঘন ঘন চলে যাচ্ছে।

দেখতে দেখতে এক বৎসর কেটে গেল। ততদিনের মধ্যেও আমাদের বিবাহ হলো না। পাদরি সাহেব শয্যাগত, ডিউকের মুখে বার বার কেবল সেই কথাই শুনি, সে কথার উপর কোন কথাই আমি কইতে পারি না। আমার প্রতি তাঁর যত্নের ত্রুটি নাই, ভালবাসার লাঘব নাই, দিন দিন বরং ভালবাসার বৃদ্ধি; প্রেমানুরাগের পাকাপাকি বন্দোবস্ত। আমোদ প্রমোদে আমি একদিনও বঞ্চিত থাকি না, ক্রীড়া কৌতুকেও অবসাদ আসে না, অর্থাকাঙ্ক্ষাও অপরিতৃপ্ত থাকে না; কোন রকমে বিন্দুমাত্র কষ্টও আমি অনুভব করি না; অনুভবের মধ্যে অনুভব কেবল বিবাহের বিলম্ব। সকল সুখের মধ্যে কেবল সেই টুকুই আমার অসুখ।

দিবাভাগে যে ঘরটিতে আমি বসি, সেই ঘরে অনেক রকম জিনিস। পুস্তকাধারে ইতিহাস, নবন্যাস, উপন্যাস, রহোন্যাস, কাব্য, নাটক, ভূগোল, ইত্যাদি নানাপ্রকার পুস্তক; পিয়ানো, হারমোনিয়ম, ক্লারিয়নেট্, ফ্লুট ইত্যাদি নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্র; হরেক রকম বর্ণের পশম, রেশম, মস্‌লিন ইত্যাদির সঙ্গে শিল্প কর্ম্মের নানা উপকরণ; ছোট একটি গ্লাস কেশে জীবনশূন্য

ছোট ছোট পক্ষী, সর্প, ভেক, প্রজাপতি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচিত্র বর্ণের মূষিক। আরও কত কি ছিল, নাম করবার দরকার বুঝি না। একদিন অপরাহ্ণে আমি সেই ঘরে একখানি চেয়ারে বসে, মাথা হেঁট্ করে কার্পেট বুনছি, এমন সময় ডিউক বাহাদুর প্রবেশ কল্লেন; ঠিক আমার চেয়ারের কাছে এসেই দাঁড়ালেন; পদশব্দ পেয়ে মুখ তুলে আমি চেয়ে দেখি, তাঁর মুখখানি যেন কোন প্রকার নূতন ভাবে বিরঞ্জিত; আনন্দের ভাব, কি নিরানন্দের ভাব ঠিক বুঝতে পারলেম না; কেমন একটু সন্দেহ হলো; আমি কোন কথা জিজ্ঞাসা করবার অগ্রেই, রঞ্জিতনয়নে আমার দিকে চেয়ে, একটি নিশ্বাস ফেলে, ডিউক বাহাদুর বল্লেন, ধর্ম্মের বিচার অতি সূক্ষ্ম; বৃদ্ধ রকিংহাম অকস্মাৎ মারা পড়েছে, হোরেস রকিংহাম বিষয়াধিকারী হয়েছিল, একেবারে বিসর্জ্জন। পিতা বর্ত্তমানে সেই মেয়ে মুকো ছোঁড়াটা পিতার বিষয়ের টাকা হাতে পেত না; বাজে খরচের জন্য ক্রমাগত হ্যাণ্ডনোট কাট্‌তো; বৃদ্ধ বর্ত্তমানেই সেই সকল নোটের মহাজনেরা নালিস দায়ের করেছিল, সেই সকল দেনার দায়ে সম্প্রতি সমস্ত বিষয় নিলাম হয়ে গিয়েছে, ভদ্রাসন বাড়ীখানা পর্য্যন্ত নাই; হোরেস এখন ফকির;—না না,—ফকির হয়ে বেড়ানও বরং ভাল ছিল, সব টাকা শোধ না হওয়াতে মহাজনেরা তাকে দেওয়ানি জেলখানায় কয়েদ করে রেখেছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্চে। পম্পাকে বিয়ে কত্তে পারে নাই; বিয়ে করবার মতলবও ছিল না; কারাগারের দেওয়ালের সঙ্গেই এখন বিয়ে হবে।

হাতের কাজগুলি টেবিলের উপর ফেলে রেখে, উপরে

দিকে চেয়ে, আমি একটি নিশ্বাস ফেল্লুম; পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেম; যে সকল লোক প্রচুর ধনেশ্বর হয়েও, গরীবের কষ্টে চক্ষু কর্ণ রাখে না, গরীব লোকগুলিকে বরং অধর্ম্মের কূপে নিক্ষেপ করে দিন দিন উপবাসে প্রাণে মারবার যোগাড় করে, তফাৎ থেকে মজা দেখে, ধর্ম্মের সূক্ষ্ম বিচারে এই রকমেই তাদের পতন হয়। টাকাওয়ালা দলের বেশীর ভাগ সেই রকম লোক। পৃথিবীর বিচারপতিকে বরং ফাঁকি দেওয়া যায়, স্বর্গের বিচারপতিকে ঘুস দিয়ে বশ করা যায় না। যে কর্ম্মের যে ফল, জগৎপিতার বিচারে সে ফল অবশ্য ফলেই ফলে।

মনে মনে এই সব আমি আলোচনা কল্লেম। যে হোরেস আমাকে অশেষ বিশেষে যন্ত্রণা দিয়ে ছিল, সেই হোরেস এখন দেউলে,—সেই হোরেস এখন নরকতুল্য জেলখানায় কয়েদি। সংবাদ আমাকে আনন্দ দিলে না, লোকের বিপদে আনন্দ প্রকাশ কত্তে নাই; সুতরাং ডিউককে আমি সে সম্বন্ধে কোন কথাই বল্লেম না, নিশ্বাস ফেলেছিলেম, সেই পর্য্যন্তই আমার উত্তর। কদিন আমি মনে করেছিলেম, হোরেস সত্য সত্য বেনামী চিঠিতে আমার পিতামাতাকে টাকা পাঠায় কি না, মাতার নামে পত্র লিখে সেইটি আমি জান্‌বো। চিঠিতে আমার দস্তখত থাকবে, কিন্তু ঠিকানা থাকবে না; লণ্ডনের সওদাগর রবিন্‌সনের কুঠীতে সিরিলের নামে উত্তর লেখবার অনুরোধ কর্ব্বো। এই রকম আমি ভেবেছিলেম, কিন্তু আর পত্র লিখতে হলোনা; স্পষ্টই বুঝা গেল, দেউলে হোরেসের সমস্তই জাল—কথাও জাল, কাজও জাল।

চেয়ার থেকে আমি উঠলেম, ডিউক আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, আমাকে অন্যমনস্ক দেখে যেন কেমন একটু বিষণ্ণ হলেন। ফুটে কিছু বল্লেন না, আমার সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে, গাড়ী প্রস্তুত করবার হুকুম দিলেন, নিজেও পোষাক পোরে প্রস্তুত হলেন, আমাকেও মজলিসি পোষাক পর-বার আদেশ দিলেন; বল্লেন, নূতন জায়গায় বেড়াতে যাবেন।

এক ঘণ্টা বেলা থাকতে আমরা নূতন জায়গায় বেড়াতে গেলেম। সে দিন যে বাড়ীতে তিনি আমাকে নিয়ে গেলেন, সে বাড়ীতে ইংরেজ লোক থাকে না, তিনটি ফরাসী বিবি আর দুইটি ফরাসী ভদ্রলোক। ডিউক ফেশিংটন তাঁদের কাছে আমার পরিচয় দিয়ে দিলেন, তাঁরা আমারে প্রিয় সম্ভাষণে আদর কোরলেন। কথোপকথন চল্‌ছিল, সেই অবকাশে জনান্তিকে ডিউক আমাকে বল্লেন, একটা মরণ খবর তোমাকে দিয়েছি, আর দুটি মরণ খবর দি। আমাদের সেই পাদরি সাহেবটি ইহসংসার পরিত্যাগ করে গিয়েছেন; বোধ করি আমাদের বিবাহে আরও দেরী পড়লো। আরও শুন,—তোমার জননী পক্ষাঘাত রোগে যাতনা পাচ্ছেলেন, তিনিও সম্প্রতি লীলাসম্বরণ করে সমস্ত যন্ত্রণা এড়িয়ে গিয়েছেন। তোমার পিতা এক রকম পাগলের মতন হয়েছেন। একটি লোক আমার কাছে এসে-ছিল, তারি মুখে শুনলেম, রেভারেণ্ড ল্যাম্বার্ট আজ কাল আর বেশীক্ষণ মঠে থাকেন না, পুরোহিতগিরি চাকরিটীও গিয়েছে। দিনমানে তিনি এখন প্রায় পথে পথেই বেড়ান, হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, তুড়ি দিয়ে দিয়ে, মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে, আপনা আপনি

বিড় বিড় করে কত কি বকেন; পথে কোন মানুষের সঙ্গে দেখা হলে, ভয়ে ভয়ে চমকে চমকে তাকেই তিনি বলেন, "বাবা গো! তোমার কাছে আমি কিছু ধারি না?—না না,—সে বুঝি তুমি নও,—সে বুঝি আমি নই?"—এই রকম এলো মেলো কথা বলে, সবেগে সে দিক থেকে তিনি ছুটে পালান! যেদিকে যাকে তিনি সম্মুখে দেখেন, তাকে দেখেই ভয় পান, তাকেই ঐ রকম ধার কার্য্যের কথা বলেন; সকলের সম্মুখ থেকেই ছুটে ছুটে পালিয়ে যান;—তাঁর এখন পাড়ার ভিতর পথ চলা বিড়ম্বনা হয়েছে। দশজনের কাছে অনেক টাকা দেনা কিনা,—কাজে কাজেই ঐ রকম বিভীষিকা দেখেন;—সত্য মহাজন না হলেও, সম্মুখে মানুষ দেখলেই তিনি ভয় পান। সকলেই স্থির করেছে, তিনি পাগল হয়েছেন।

মুখে রুমাল ঢাকা দিয়ে আমি কেঁদে ফেল্লেম। এই সব ভয়ানক কথা শুনাবার জন্যই ডিউক আমাকে পরের বাড়ীতে এনেছেন, সেইটি মনে করেই আমার শোক আরও বেশী হলো; আমি আর সেখানে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেম না; অভদ্রতা প্রকাশ হবার ভয়ে উঠে আসতেও পারলেম না, উভয় সঙ্কট। জনান্তিকে কথা, ফরাসি সাহেব বিবিরা সে সব কথা হয়তো শুনতে পান নাই, অকস্মাৎ আমার রোদন দেখে তাঁরা বিস্ময়াপন্ন হলেন। দু-পাচটী শিষ্টাচার বাক্য বিনিময় করে, ডিউক বাহাদুর আমাকে নিয়ে রাত্রি আটটার সময় আশ্রমে ফিরে এলেন।

মাতার মৃত্যু, পিতার উন্মাদ রোগ, আমার বিবাহের বিলম্ব, এই তিনটি প্রতিকূল ঘটনা যেন অগ্নিমূর্ত্তি ধারণ করে, আমার

বুকের ভিতর হু হু করে জলতে লাগলো। পাঁচ দিন অতিবাহিত; আমার মনের যাতনা কিছুতেই কমে না। অন্যমনস্ক হবার জন্য, জোর করে হাসি, খেলি, আমোদ করি, মদ খাই, কিছুই কিন্তু ভাল লাগে না।

এক সপ্তাহ পরে ডিউক একদিন লণ্ডন নগরে চলে গেলেন; আমাকেও সঙ্গে যেতে বলেছিলেন, হোরেস জেলখানায় পচিতেছে, লণ্ডনে তোমার এখন আর ভয় কি, এই কথা বলে বুঝিয়েছিলেন; আমি কিন্তু যাই নাই; তিনি একাই গিয়েছিলেন। আমি থাকলেম, সিলভিয়া থাকলো, দাসি চাকরেরা থাকলো, সহিস কোচম্যানি থাকলো, গাড়ী ঘোড়াও থাকলো। আমার যা যখন ইচ্ছা হবে, তাই তখন কোর্ত্তে পার্ব্বো, ডিউকের এইরূপ অনুমতি থাকলো।

লণ্ডনে ডিউকের বেশী দিন দেরি হয় নাই; শীঘ্রই ফিরে এসেছিলেন। আমার চিত্ত যতটা চঞ্চল হয়েছিল, দিনে দিনে ক্রমে ক্রমে কম হয়ে এলো, ততটা আর থাকলো না। ডিউক যে দিন এলেন, সেই দিন রাত্রে আহারের সময় তিনি আমাকে বল্লেন, শীঘ্রই আমাকে মফঃস্বলের জমীদারীতে যেতে হবে; লণ্ডনের চ্যান্‌সারি কোর্টে আমার একটী মোকদ্দমা ঝুলছে, ক্রমাগত দশ বৎসর সেই মোকদ্দমা পড়ে আছে; কিছুতেই নিষ্পত্তি হচ্চে না। চ্যান্‌সারি কোর্টের মামলা যদি একটু জটিল হয়, একটা লোকের জীবন কালের মধ্যেও সে মামলা শেষ হয় না। যাই হোক, দশ বৎসর পরে আমার সেই মোকদ্দমাটা উঠেছে। মাঝে মাঝে এক একবার উঠেছিল, কেবল মুলতুবি—কেবল মুলতুবি। আবার উঠেছে। সে লোকটা ফরিয়াদি

সে আমার সম্পত্তির একজন অংশী, আদালতে সেই কথা সপ্রমাণ কোর্ত্তে চায়। দশ বৎসর পূর্ব্বে আমি তাকে চিনতেম না, আমার সম্পত্তিতে তার অংশ আছে, ঘুণাক্ষরেও সে কথা আমি জানতেম না; এত কালের পর কোথা থেকে মাথা তোলা দিয়েছে, তাও আমি জানি না। মোকদ্দমা কিন্তু শক্ত; ভাল ভাল সাক্ষী যোগাড় কোর্ত্তে হবে, মফঃস্বলের জমীদারী সম্বন্ধেই মোকদ্দমা; মফঃস্বলের মাতব্বর প্রজাগণকে সাক্ষী মান্য কর্ত্তে হবে; আমি নিজে না গেলে ঠিক ঠিক বন্দোবস্ত হবে না; দু একদিনের মধ্যেই আমি যাবো, তোমরা খুব সাবধানে থেকো।

আমার উৎকণ্ঠার উপর উৎকণ্ঠা বাড়লো। যাঁর বাড়ীতে রয়েছি, তিনি উপস্থিত থাকেবেন না, সেই একটা বিষম উৎকণ্ঠা। আমার উৎকণ্ঠায় একজন বড় লোকের বিষয়কর্ম্ম বন্ধ থাকবে না; তাকে যেতেই হবে। যে রাত্রের কথা, তাহার তিন দিন পরেই ডিউকের মফঃস্বল যাত্রা। আমার হাতে হাজার পাউণ্ডের ছোট ছোট ব্যাঙ্ক নোট দিয়ে, আবার আমাকে পুনঃপুন সাবধান কোরে, এক পক্ষ পরেই ফিরে আসবো বোলে, ডাকগাড়ী যোগে তিনি জমিদারীতে যাত্রা কোল্লেন।

একপক্ষ অতীত হোয়ে গেল, ডিউক বাহাদুর ফিরে এলেন না, সেই এক পক্ষের মধ্যে তাঁর কোন পত্রাদিও পেলেম না, এক পক্ষের জায়গায় তিন পক্ষ পার হোয়ে গেল, কোন সংবাদই প্রাপ্ত হোলেম না। দিন দিন আমার দুঃশ্চিন্তা বেড়ে উঠতে লাগলো। ডিউক আমীকে বল্লে ছিলেন, তিনি প্রবঞ্চনা জানেন না, কিন্তু এক বৎসরের বেশী হোয়ে গেল, অঙ্গী-

কার পালনে তাঁর মতি হোল না, পাদরি সাহেব শয্যাগত, পাদরি সাহেব পরলোক গত, এইরূপে এক একটা ওজর কোরে এই দীর্ঘকাল কাটিয়ে দিলেন, আবার একপক্ষ পরে আসবেন বোলে, তিন পক্ষ ডুবে রইলেন, ব্যাপারখানা কি ?—মোকদ্দমার কথাটা হয়ত মিথ্যা, আমাকে ছলনা কোরে বোধ হয় সোরে পোড়েছেন। হোরেস যে রকমে আমাকে বঞ্চনা কোরেছিল, ইনিও হয়তো সেই রকমে বঞ্চনা করবার ফন্দী খাটিয়ে থাক্‌বেন। বড় লোকেরা অনেক রকম ফন্দী জানেন। ডিউক ফেশিংটন হয়তো আমাকে বিবাহ কোরবেন না ; সখের আস্‌বাবের মতন আমাকে রেখে দিয়ে ছিলেন, তা পর্য্যন্ত বোধ হয় লোপাট হোয়ে যায়।

সেই চিন্তাই সর্ব্বক্ষণ আমাকে দগ্ধ কোত্তে লাগলো। ঘরে যদি কাল ভুজঙ্গ বাসা কোরে থাকে, কখন দংশায়, কখন দংশায়, সেই সাংঘাতিক সংশয়ে গৃহস্থ যেমন অহঃরহ প্রাণের ভয়ে কাতর হয়, আমিও সেই রকমে মানের ভয়ে কাতর হোয়ে পড়লেম।

যে দিন ডিউক মফঃস্বল যাত্রা করেন, সেই দিন অবধি আমি আর বাড়ীর বাহির হই নাই ; বাড়ীর হাওয়া ভিন্ন অন্য হাওয়া সেই অবধি আমার গায়ে লাগতে পায় নাই। সেই দেড় মাস যেন আমি সোণার শিকল পায়ে পরে, সখের গারদে কয়েদ ছিলেম। সিলভিয়াকে বল্লেম, আজ আমি একবার বেড়াতে যাবো ; তুমি আমার ঘরের জিনিস পত্রগুলি আগলে থেকো।

বৈকালে আমি ঘরের গাড়ীতেই বেড়াতে বেরুলেম।

কোথায় যাই ?—আলাপী হোয়েছিল অনেকগুলি, তাদের এক জনের বাড়ীতে যেতে পাত্তেম, কিন্তু মন সরলো না। যে বাড়ীতে ফরাসি বিবিরা বাস করেন, সেই বাড়ীতেই যাবার ইচ্ছা হলো। বিবিদের সঙ্গে আমার নূতন আলাপ হয়েছিল, সাহেব দুটিও আমাকে যত্ন কোরেছিলেন, সেখানে গেলে মনে কতকটা শান্তি পাবো, তাই ভেবেই সেই বাড়ীতে গেলেম।

বিবিরা আমাকে চিরপরিচিতের মতন সাদরে অভ্যর্থনা কোরলেন। সাহেব দুটিকে প্রথমে সেখানে দেখতে পাই নাই; তাঁরা বাড়ীতে ছিলেন কি বেরিয়ে গিয়েছিলেন, তাও জানিতে পারি নাই; বিবিদের সঙ্গে আমি পাঁচ রকম গল্প কচ্ছি, একটি সাহেব সেই সময় সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেন; আমাকে দেখে যেন কতই খুসি হোয়ে, মিষ্ট বচনে বল্লেন, মিস্ অলিভিয়া! তোমার সঙ্গে সেই দেখা আর এই দেখা! নিত্য আমি তোমার কথা মনে করি, তোমার গুণের কথা আলোচনা করি, তোমার দুঃখের কথা স্মরণ কোরে অন্তরে বেদনা পাই। তুমি এখন আছ কেমন ?

সমুচিত উত্তর দিয়ে, সসম্ভ্রমে আমি তাঁকে সেলাম কোরলেম; ডিউক ফেশিংটন দেড় মাস পূর্ব্বে মফঃস্বলে গিয়েছেন, সে কথাও তাঁকে বোল্লেম। এতক্ষণ তিনি দাঁড়িয়েছিলেন, এই সময় একখানি চেয়ার টেনে নিয়ে, ঠিক আমার নিকটেই বস্‌লেন; প্রশান্ত বদনে বল্লেন, তা আমি জানি; মফঃস্বলে তিনি গিয়েছেন, সেখানে কিছু বিলম্ব হবে, তা আমি জানি। ইতিমধ্যে তুমি কি তাঁর কোন সংবাদ পাও নাই? এক মাস পূর্ব্বে আমি একখানা পত্র পেয়েছিলেম,

পাঁচ দিন হোলো, আর একখানা পত্র এসেছে। তিনি সেখানে আছেন ভাল।

যে সাহেবটির সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল, তিনি ফ্রেঞ্চ মডান, পূর্ব্বেই সে পরিচয় দেওয়া আছে; তাঁর নাম মস্যুর পিমারিও। ডিউকের কথা বলতে বলতে গ্রীবাভঙ্গি করে তিনি আমার দিকে এক বিশাল কটাক্ষ নিক্ষেপ কোল্লেন। সে কটাক্ষের অর্থ ঠিক আমি বুঝলেম না, কিন্তু মনে কেমন এক প্রকার অশুভ কল্পনার আভাষ এলো। ডিউক ফেশিংটন এই পিমারিওকে দুখানা পত্র লিখেছেন, আমাকে একটি কথাও লেখেন নাই; আমার চেয়ে এই পিমারিও কি বেশী প্রিয়?—হোতেও পারে, আমার সঙ্গে অল্পদিনের দেখা, পিমারিও হয়তো অনেক দিনের বন্ধু, সেই জন্যই পিমারিওকে অগ্রেই পত্র লিখেছেন। আর এক তর্ক মনে উঠলো;—পিমারিও বলেছেন, তিনি সেখানে আছেন ভাল। এ সংবাদটা কি রকম?—তিনি সেখানে হাওয়া বদলাতে যান নাই, মোকদ্দমার সাক্ষী যোগাড় কোর্ত্তে গিয়েছেন, নিজে জমীদার হোলেও সে রকম কার্য্যে আরাম করবার অবকাশ হয় না; তবে ভাল থাকা কথাটা কি রকম বুঝাচ্ছে? সাক্ষী যোগাড়ের কথাটা কি তবে ছলনা মাত্র?—মনের ভাব মনে চেপে রেখে মৃদুস্বরে পিমারিওকে আমি বল্লেম, আমাকে কিন্তু একখানিও পত্র লেখেন নাই।

আমার কথাগুলি তিনি শুনতে পেয়েছিলেন কি না, বলতে পারি না; বোধ হয়, শুনতে পান নাই; কেননা, সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে, অন্য কথা উত্থাপন করে, তিনি তখন বলেছিলেন, এই যে তিনটি কামিনীকে দেখছো, এঁদের মধ্যে

দুটি আমার ভগ্নী, আর একটি আমার বন্ধুর পত্নী; প্রথম দিন আমার কাছে যে লোকটিকে তুমি দেখেছিলে, তিনিই আমার বন্ধু।

যে সব কথার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক ছিল না, সেই রকমের গোটাকতক থাপ্‌ছাড়া থাপ্‌ছাড়া কথা তিনি আরম্ভ করলেন, আমি অন্যমনস্ক হয়ে থাকলেম। বিবি তিনটিও এক এক কথার উপর দুটি একটি টিপ্পি কাট্‌লেন। তারপর পিমারিও আমার দিকে এক রকম ইঙ্গিত কোরে হঠাৎ আসন থেকে উঠে দাঁড়ালেন, ভিতর দিকের বারাণ্ডায় বেরিয়ে গেলেন। বারাণ্ডা থেকেও ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে আমাকে আহ্বান। তাৎপর্য্য না বুঝেও, বিবি তিনটির দিকে চেয়ে চেয়ে চেয়ার থেকে উঠে, ধীরে ধীরে আমি বারাণ্ডায় গিয়ে হাজির হোলেম।

পিমারিওর বদনে বিদ্যুৎগতিতে বর্ণ পরিবর্ত্তন;—একবার দেখলেম, মুখখানি যেন পাণ্ডুবর্ণ, তখনি আবার দেখলেম, হঠাৎ রক্তবর্ণ। আমার একখানি হস্ত ধারণ কোরে চুপি চুপি তিনি বল্লেন, ডিউক আমাকে যে দুখানা পত্র লিখেছেন, তাকি তুমি দেখতে চাও? কোন উত্তর না দিয়ে, স্থিরনেত্রে আমি তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকলেম।

চিঠি দুখানা তাঁর পকেটেই ছিল, বাহির করে তিনি আমার হাতে দিলেন। তাঁর অনুমতি নিয়ে প্রথম চিঠিখানি আমি পাঠ কল্লেম; সে চিঠিতে মোকদ্দমার কথাও ছিল না, সাক্ষীর কথাও ছিল না, আমার কথাও ছিল না, কেবল পৌঁছানর সংবাদ আর কতকগুলি বন্ধুত্বের কথা লেখা ছিল মাত্র। পাঠ সমাপ্ত হোলে, চিঠিখানি আমি তাঁকে প্রত্যর্পণ কোল্লেম; তিনি

আমাকে গম্ভীর বদনে বল্লেন, দ্বিতীয়খানি পাঠ কর। প্রথম চিঠি অপেক্ষা দ্বিতীয়খানি অনেক দীর্ঘ,—তিন পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ; প্রথম দুই পৃষ্ঠা পাঠ কোরে, আমার মনে কোন প্রকার নূতন ভাবের উদয় হলো না, তৃতীয় পৃষ্ঠায় দৃষ্টি দান কোরে, কয়েকটি ছত্র পাঠ কোত্তে কোত্তে আমার যেন গলা শুকিয়ে এলো, মাথা ঘুরতে লাগলো, সর্ব্ব শরীর সহসা অবশ হলো; হাত কেঁপে কেঁপে চিঠিখানা বারাণ্ডার ধারে পড়ে গেল। আমিও বিনা অবলম্বনে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলেম না, যেন মাতালের মতন টোলে টোলে বারাণ্ডার রেল ঠেস দিয়ে টাল সামলালেম; নিকটে রেল না থাকলে নিশ্চয়ই আমি সেই খানে পড়ে যেতেম। রেল ঠেস দিয়ে দাঁড়ালেম; বুকের ভিতর যেন চপলা চমকাল; চক্ষের সম্মুখ দিয়ে যেন বিদ্যুৎমালা ছুটে গেল, থরথর কোরে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপতে লাগলো।

গতিক দেখে পিমারিও আমাকে কোলে কোরে ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন, একখানি কোচের উপর শয়ন করালেন, তাঁর ভগ্নিরা আর তাঁর সেই বন্ধু পত্নিটি পাশে বসে আমাকে বাতাস কোর্ত্তে লাগলেন। পিমারিও নিজেও আমার মুখে একটু ব্রাণ্ডি ঢেলে দিলেন; আমার কপালে, নাসাগ্রে ও ওষ্ঠপুটে বিন্দু বিন্দু ঘাম হতে লাগলো; ক্ষণকাল আমি যেন অচেতন হয়েছিলেম; চৈতন্য হবার পর আমার দুই চক্ষু দিয়ে দুই তিন ফোঁটা জল পড়েছিল। কি কারণে সে অবস্থা, পিমারিও সেটা ঠিক বুঝেছিলেন, কিন্তু বিবি তিনটি কিছুই বুঝেন নাই; তাঁরা হয়ত বুঝেছিলেন, কোন রকম ফিট্

হয়েছে। কেননা, তাঁরা সেই পত্রখানা দেখেন নাই। পত্রে কি কি কথা লেখা ছিল, সময়ান্তরে সে সব কথা আমি খুলে বল্‌বো। ডিউক্ ফেশিংটনের মনে ততদূর গুহ্য চাতুরি লুকানো ছিল, তা আমি জানতেম না।

অতি কষ্টে যখন আমি একটু সুস্থ হলেম, পিমারিও তখন আমারে আবার একটু একটু ব্রাণ্ডি খাওয়ালেন। পূর্ব্বে আমি কখনও ব্রাণ্ডি খাই নাই, কিন্তু সে অবস্থায়, মূর্চ্ছা ভঙ্গের পর তিন চারি বার সজল ব্রাণ্ডি পান কোরে, আমি অনেকটা বল পেলেম; কৌচের উপর উঠে বস্‌লেম।

পিমারিও সেই অবকাশে তিনটি বিবির দিকে এক প্রকার নেত্র সঙ্কেত করলেন, বিবিরা তৎক্ষণাৎ সে ঘর থেকে বেরিয়ে, অন্য ঘরে চলে গেলেন। পিমারিও তখন এক খানি চেয়ার নিয়ে আমার কৌচের কাছে উপবেশন করলেন; দৃষ্টি থাকলো আমার মুখের দিকে। আমি বুঝতে পারলেম, কোন গুরুতর কথা বলা যেন তাঁর অভিলাষ। তিনি আমার মুখ পানে চেয়ে আছেন, আমিও তাঁর মুখ পানে চেয়ে আছি, সহসা তিনি মৌনভঙ্গ করলেন। তখন সন্ধ্যা হয়েছিল, ঘরে আলো জ্বল-ছিল, বিবিরা বেরিয়ে যাবার সময় বাহির দিক থেকে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে গিয়েছিলেন, পিমারিওর গুপ্তকথা বলবার কোন বাধা ছিল না। আমার মুখের কাছে একটু হেঁট হয়ে, মৃদু গুঞ্জনে সহসা তিনি বল্লেন, দেখলে ত?—পড়লে ত?—ভাব গ্রহণ কল্লে ত?—ডিউক ফেশিংটন কেমন প্রকৃতির লোক, তোমার উপর তাঁর কত দূর ভালবাসা, তোমাকে বিবাহ করবার কত দূর আকিঞ্চন, তা এখন জানতে পারলে ত?

আবার আমার বুক কাঁপতে লাগলো। কি উত্তর দিব, ভেবে চিন্তে স্থির করতে না পেরে, আমি চুপ করে থাকলেম। পূর্ব্বরূপ মৃদুস্বরে পিমারিও আবার বল্লেন, সমস্তই ত তুমি বুঝেছ। বৎসরের মধ্যে তিনি আর রাজধানীতে ফিরে আস্‌ছেন না; একটি সুন্দরী কুমারীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছেন, তাকেই সেইখানে বিবাহ করবেন, এক বৎসর সেইখানে থাকবেন, বহু দিন তাঁর অদর্শনে বিরক্ত হয়ে আপনা হতেই তুমি স্থানান্তরে চলে যাবে, এইটিই তাঁর আসল মতলব। শেষে আমি যে কটি কথা বল্লেম, পত্রে সে কথাগুলি লেখা নাই, কিন্তু ঠিক আমি বুঝেছি। লণ্ডনের একটি সুন্দরী তাঁর সঙ্গে গেছে, তাকে তিনি ভালবাসেন, সুন্দরীও তাঁকে ভালবাসে; উভয়ে বিবাহ হবার চুক্তি স্থির হয়েছে, তাও আমি জানি। যে ছুঁড়ীকে তিনি নিয়ে গিয়েছেন, সে ছুঁড়ী সুন্দরী, কিন্তু তোমার মত সুন্দরী নয়; কি চক্ষে যে ডিউক তাকে দেখেছেন, কিসে যে তাঁর মন মজেছে, তা আমি বলতে পারি না। তাঁর সঙ্গে যে দিন তুমি এখানে এসেছিলে, সেই দিনেই তোমাকে আমার ভালবাসতে ইচ্ছা হয়েছিল;—ইচ্ছা আর কেন বলি, সত্যই তোমাকে আমি ভাল বেসেছি; অন্য ভাবে না হোক, বন্ধু ভাবে ভাল বেসেছি;—সেই ভালবাসার খাতিরেই তোমার জন্য এখন আমার ভাবনা হচ্ছে।

কথাগুলি আমি চুপ করে শুনলেম, প্রাণে আমার নূতন কোন রকম আঘাত লাগলো না; ডিউকের পত্রখানা পাঠ করে যেরূপ শক্ত আঘাত লেগেছিল, আর এক জনের মুখে

সেই পত্রের মর্ম্ম কথা শুনে তার চেয়ে বেশী আঘাত লাগবার সম্ভাবনাই ছিল না। সুতরাং সে সব কথার কোন উত্তর না দিয়ে, পূর্ব্বের ন্যায় আমি মৌনী হয়ে থাকলেম।

দরজার বাহিরে সেই সময় খুট্‌ খুট্‌ করে কি শব্দ হলো, দ্বারের দিকে চেয়ে মস্যুর পিমারিও সেই দিকে কাণ খাড়া কল্লেন; আবার সেই রকম শব্দ। সংশয়ক্রমে একটু উচ্চকণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কেহ কি এখানে এসেছ? যদি এসে থাক, ঘরে প্রবেশ করবার যদি দরকার থাকে, আসতে পার।

দ্বার উদ্‌ঘাটিত, একটি বালিকা পরিচারিকার প্রবেশ। পরিচারিকার এক হস্তে একটি স্যাম্পীনের বোতল, অপর হস্তে এক খানি রৌপ্য পাত্রে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য। টেবিলের উপর সেই দুটি জিনিষ রেখে, পরিচারিকা তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল, দ্বার পুনরায় অবরুদ্ধ। পরিচারিকা যখন যায়, তখন আড়ে আড়ে আমার দিকে কটাক্ষসন্ধান করে গিয়েছিল।

স্যাম্পীনের সমাদর। স্যাম্পীনের আস্বাদনে আমি অভ্যস্থ, পিমারিও সে পরিচয় পেয়েছিলেন; মূর্চ্ছার সময় ব্রাণ্ডির ব্যবস্থা করেছিলেন। এ সময়ে আর ব্রাণ্ডির নাম করলেন না, অল্প অল্প পরিমাণে স্যাম্পীন চালাতে আরম্ভ করলেন। রাত্রি ক্রমশ অগ্রসর হতে লাগলো, আশ্রমে ফিরে আসবার জন্য আমি চঞ্চলা হতে লাগলেম। কার আশ্রমে আস্‌ব, কি কারণে আস্‌ব, সেটা ত তখন ভাবলেম না, বিদায় হবার জন্য পিমারিওর কাছে বারম্বার ব্যগ্রতা জানালেম।

আমার ব্যগ্রতায় লক্ষ্য না রেখে, ক্ষণকাল মনে মনে কি একটু ভেবে, পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মৃদুস্বরে পিমারিও বল্লেন,

সাতদিন পরে আমরা এখান থেকে স্বদেশে চলে যাবো; আমার সেই বন্ধুটি একটি বিশেষ কাজের জন্য লণ্ডনে গিয়েছেন, তিনি ফিরে এলেই যাত্রা করা যাবে। লণ্ডনে তাঁর চার পাঁচ দিনের বেশী বিলম্ব হবে না। সুন্দরি অলিভিয়া! এই সময় তোমাকে আমি একটি কথা বল্‌তে চাই। তোমার তো এডিনবরার সুখ ফুরালো, লণ্ডনের আশাও দূরে গেল, ডিউক আর এখন আসবেন না, তোমাকেও বিবাহ করবেন না, নূতন বিবাহে নব রস রঙ্গে নব রঙ্গিণীর সঙ্গে প্রেমসাগরে ভাসবেন; তবে তুমি আর এডিনবরায় থেকে কি কোর্ব্বে, লণ্ডনে গিয়েই বা কোন সুখের মুখ চেয়ে থাক্‌বে? তুমি এক কাজ করো;— আমাদের সঙ্গে প্যারিসে চলো। ফরাসি রাজধানী প্যারিস নগরী সর্ব্বজনের নেত্রমোহিনী;—সর্ব্বজনের চিত্তমোহিনী! প্যারিসে সর্ব্ব সুখের খনি আছে, স্থান অতি রমণীয়; প্যারিসের কামিনীরা পৃথিবীর দুর্ল্লভ দুর্ল্লভ বিলাসভোগে আমোদিনী, নৃত্য-গীত-বাদ্যে প্রমোদিনী, সুন্দর সুন্দর যুবাজনের মনঃপ্রাণ-বিমোহিনী। প্যারিসের কামিনীরা নিত্য নিত্য নব নব বেশ-ভূষায় সুসজ্জিতা হোয়ে নব নব নাগরগণের ভালবাসা আকর্ষণ করে; বসন ভূষণের গৌরবে প্যারিসের কামিনীগণ জগতের কামিনীকুলের অপেক্ষা উচ্চ গৌরবিনী; বসন ভূষণে ফরাসী-ফ্যাসন সর্ব্বদেশের অগ্রগণ্য। তুমি প্যারিসে চলো; আমি তোমাকে সেখানে পরম সুখে রাখতে পার্ব্বো; তুমি প্যারিসে চলো। তোমার কল্যাণের জন্য এই আমার পরামর্শ। আমি ব্যাচিলর, সেই সূক্ষ্ম কথাটিও তোমাকে বলে রাখি। যদি তোমার ইচ্ছা হয়, তোমাতে আমাতে বিবাহ হলেও—

আর আমি শুনতে পারলেম না। দুই চক্ষে দুখানি হাত চাপা দিয়ে ঘন ঘন হাঁপাতে লাগলেম। মশুর পিমারিও আমার মুখ থেকে হাত দুখানি সরিয়ে নিয়ে আমার দুটি কপোলে দুবার চুম্বন করলেন। আমি কেঁপে উঠলেম। মন তখন কেমন হোয়েছিল, হঠাৎ তিনি চুম্বন করবেন, সেটাও ভাবতে পারি নাই, সুতরাং চুম্বনে আমি বাধা দিই নাই। সেইখানে বসে বসে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান অনেক আমি ভাবলেম। পিমারিও আমার দুখানি হাত ধরেছিলেন, মিনতি বচনে তাঁরে আমি বল্লেম, এখন আপনি আমাকে ছাড়ুন, আশ্রমে যেতে দিন, আজ আর আমাকে বেশী কথা বলবেন না; আবার আমি আসবো। আপনারা তো আরও সাত দিন এখানে থাকবেন, সাতদিনের আগেই আবার আমার দেখা পাবেন। আমার বুদ্ধি এখনও স্থির হয় নাই। আমার একটি সহচরী আছে, সেটি বেশ বুদ্ধিমতী, তার বুদ্ধি নিয়েই আমি সব কাজ করি; তার সঙ্গে পরামর্শ কোরে আপনার প্রস্তাবের উত্তর দিব। আজ আমাকে ছেড়ে দিন; রাত্রি অনেক হয়েছে।

পিমারিও আর এক পাত্র স্যাম্পীন আমাকে প্রদান কোল্লেন, নিজেও এক পাত্র পান কোল্লেন, আবার আমার ওষ্ঠাধরে দুটি তিনটি চুম্বন দিলেন; আমি বিদায় হোলেম। রাত্রি দশটার পরে আশ্রমে এসে পৌঁছিলেম।

ষোড়শ তরঙ্গ।

আশা বদল।

হায় হায়! যে আশ্রমকে নূতন আশ্রম বলে আশ্বস্ত হৃদয়ে আনন্দিত হোয়েছিলেম, সেই আশ্রমটি এখন পরিত্যাগ কত্তে হলো;—আশাও বদল হোয়ে গেল। আশ্রমে ফিরে এলেম, কিন্তু সে আশ্রমকে তখন সে চক্ষে আমি দেখলেম না। বর্ষাধিক কাল যে চক্ষে আমি এডিনবরা সহরের সেই আশ্রমখানি দর্শন করে আসছিলেম, সে চক্ষু যেন আমাকে অন্য প্রকার বিপরীত ছবি দেখালে।

বুক অত্যন্ত ভারী! অনেক কষ্ট পেয়েছি, মাতাপিতার আশ্রয় পরিত্যাগ করে এসেছি, পরিত্যাগ কোর্তে তাঁরাই আমাকে বাধ্য করেছিলেন, তাতেও এত কষ্ট অনুভব করি নাই; তাতেও বুক এত ভারী হয় নাই। হোরেস আমাকে বিলক্ষণ দাগা দিয়েছে, তাতেও বুক আমার এতদূর ভারী হয় নাই; জননীর মৃত্যু সংবাদ পেয়েছি, পিতা পাগল হয়েছেন, শুনেছি, তাতেও এতটা কাতর হই নাই, বুক এত ভারী বোধ হয় নাই; কিন্তু সেই রাত্রে পিমারিওর নিকট থেকে বিদায় হোয়ে এসে, আমার অন্তরে মহা বিপদের তরঙ্গ উঠেছিল;—বুক অত্যন্ত ভারী!

সে কি কথা!—অত বড় বড় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে একজন ডিউকের প্রণয় পরীক্ষায় অপূর্ণকাম হোলেম, সেইটিই কি

এত বেশী কষ্ট!—সে কি কথা!—না না,—তা নয়;—ডিউক ফেশিংটনের প্রণয়ে হতাশ হোলেম, ডিউক ফেশিংটন বিশ্বাস-ঘাতক, কপট প্রণয়ে তিনি আমাকে এক বৎসর মুগ্ধ করে রেখেছিলেন, হঠাৎ না বলে না কয়ে, মিথ্যা একটা ওজর কোরে, তিনি আমাকে পরিত্যাগ কোরলেন; কেবল তাই ভেবেই অধিক কষ্টে আমি অভিভূত হই নাই, আমার কষ্টের আরও বিশেষ কারণ ছিল। ইংলণ্ডের ন্যায় সভ্য রাজ্যেও সরলা অবলাদের প্রতি এইরূপ নির্দ্দয় ব্যবহার, এইটি মনে কোরেই আমার তখনকার যন্ত্রণা যেন চরম সীমায় উঠেছিল।

বুক অত্যন্ত ভারী! আশ্রমে ফিরে এসে সিলভিয়ার সঙ্গে আরও একটু বেশী মাত্রায় মদ খেলেম; ক্ষুধা হয়েছিল, তথাপি কিছুই আহার কোরলেম না; ফরাসিদের বাসাবাড়ীতে যে সব ভয়ানক তত্ত্ব জেনে এলেম, সে রাত্রে সিলভিয়ার কাছে সে সব তত্ত্বের কথা কিছুই বল্লেম না; রাত্রি একটার পর শয়ন কোল্লেম; অনেক প্রকার দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেম, নিদ্রা ভাল হয় নাই; এক ঘণ্টা রাত্রি থাকতে শয্যা পরিত্যাগ কোরে আশ্রমের পশ্চাৎদিকের ফুল বাগানে অনেকক্ষণ আমি বেড়িয়ে-ছিলেম; হাজরে খাবার সময় সিলভিয়ার সঙ্গে দেখা। গত রজনীতে বন্ধু সাক্ষাতের ফলাফলগুলি সেই সময় সিলভিয়াকে আমি বলি—কি করা কর্ত্তব্য, তৎসম্বন্ধে তার পরামর্শ চাই।

সিলভিয়া মহা বিস্ময়াপন্ন। খানিকক্ষণ নির্ব্বাক হোয়ে, বিস্মিতনয়নে সিলভিয়া আমার বিস্মিত মুখপানে ফ্যাল ফ্যাল কোরে চেয়ে রইল; তারপর ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে কাতর কণ্ঠে

ধীরে ধীরে বল্লে, ভয়ানক প্রতারণা! ডিউক ফেশিংটনকে যথার্থ ভদ্রলোক বলে আমার ধারণা হয়েছিল, তাঁর কিনা এই ব্যবহার, এ রাজ্যের হাওয়া ভাল নয়; এ রাজ্যে আর থাকবার দরকার নাই; সেই ফরাসি ভদ্রলোকটি যে রকম প্রস্তাব কোরেছেন, তাতেই তুমি রাজি হও; চল আমরা তাঁদের সঙ্গেই প্যারিসে চলে যাই।

আমার মনেরও যেরূপ উপদেশ, সিলভিয়ার মুখেও সেইরূপ পরামর্শ; উভয়ের সংকল্পেরই সমান মিলন। পাঁচদিন পরে পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে ফরাসিদের বাসা বাড়ীতে আমি উপস্থিত হোলেম; প্রথমেই পিমারিওর সঙ্গে দেখা হোলো। আমার মুখে তখন বোধ হয় কোনরূপ দৃঢ় সংকল্পের ছায়া পড়েছিল, পিমারিও সেইটি অনুভব কোরে বিলক্ষণ সন্তোষ প্রকাশ করলেন, বিবিরা যে ঘরে বসেছিলেন, সাদরে আমার হস্ত ধারণ কোরে তিনি আমাকে সেই ঘরে নিয়ে গেলেন। সেখানেও আমি বিলক্ষণ আদর পেলেম। পিমারিওর বন্ধুটি সেদিন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনিও বোধ হয় ডিউক ফেশিংটনের পত্রের মর্ম্ম অবগত হয়েছিলেন, আমাকে দেখে তিনি মনের উচ্ছ্বাসে আমার সঙ্গে সহানুভূতি দেখালেন, বিবি তিনটিও সেই রকম সমবেদনা প্রকাশ কোল্লেন। পিমারিওর বন্ধুটির নাম কাপ্তেন ফলিসান।

সন্ধ্যার পূর্ব্বেই আমি উপস্থিত হয়েছিলেম, সন্ধ্যার পরেই চা খাওয়া হোলো, আর একটু পরেই সরাপের বোতলেরা আমাদের অভ্যর্থনা কোল্লে।

মজলিস গরম। সচরাচর গরম মজলিসেই মানুষের মনের

কথা ফুটে পড়ে। তাঁদের সঙ্গে আমি ফরাসিদের রাজধানীতে যেতে সম্মত আছি, মনে কোন প্রকার দ্বিধা না রেখেই স্পষ্ট স্পষ্ট সেই অভিপ্রায় আমি ব্যক্ত করলেম। সকলেই সন্তুষ্ট হোলেন; পিমারিওর মনেই অধিক সন্তোষ। তিনদিন পরেই তাঁরা স্কটলণ্ড পরিত্যাগ করবেন, এইরূপ স্থির; আমিও সেই স্থিরতায় সায় দিলেম, সে রাত্রে আমি আর সেখানে বেশী বিলম্ব করলেম না, পরামর্শ স্থির কোরে রাত্রি নটা বাজবার পূর্ব্বেই বিদায় হোয়ে এলেম; সিলভিয়াকে সকল কথা জানালেম; সিলভিয়া খুব খুসি।

নানা কথায়, নানা আয়োজনে, নানা পরামর্শে দুটি দিন কেটে গেল। দ্বিতীয় দিবসের রাত্রিকালে, আশ্রমের সকলে বিশ্রাম শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করবার পর, সিলভিয়াতে আমাতে চুপি চুপি বাড়ী থেকে বেরুলেম। আমার হাতে তখন অনেক টাকা সঞ্চিত ছিল, টাকাগুলি, পোষাকগুলি, অলঙ্কারগুলি আর সৌখিন সৌখিন সামগ্রীগুলি পেটিকায় চাবি বন্ধ কোরে সিলভিয়ার হাতে দিয়েছিলেম; সন্ধ্যার পূর্ব্বে সকলের অগোচরে আস্তাবলের দুট অশ্ব বাহির কোরে নিকটবর্ত্তী সরাইখানায় রেখে এসেছিলেম, পদব্রজে সরাইখানা পর্য্যন্ত গিয়ে দুজনে দুটি অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ কোল্লেম; ঘোড়ারা নক্ষত্রবেগে আমাদের নিয়ে ছুটে ছুটে দশ মিনিটের মধ্যেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে দিলে। যখন পৌঁছিলেম, রাত্রি তখন তিনটে। রাস্তায় দ্রুতধাবিত অশ্বের পদধ্বনিতে সেই বাড়ীর দরোয়ানের নিদ্রাভঙ্গ হোয়েছিল, দ্বারে আমরা করাঘাত করবামাত্র, বৃত্তান্ত জানবার জন্য দরোয়ান দরজা খুলে চৌকাটের উপর দাঁড়ালো; সে আমাকে চিন্‌তো।

রাস্তার আলোতে আমার মুখ দেখে সসম্ভ্রমে সেলাম দিলে, আমরা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। আস্তাবলের একজন সহিসকে ডেকে দরোয়ান আমাদের ঘোড়া ছুটিকে তার জিম্মা কোরে দিলে; সদর দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল। আমরা উপরে গিয়ে উঠলেম; ডাকাডাকি কোত্তে হোলো না; সদরের গোলমালে বাড়ীর লোকেরাও জেগেছিলেন, আনন্দ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত স্থানে আমরা আশ্রয় পেলেম। পরদিন আমরা সেই বাড়ীতেই থাকলেম; তৎপর দিন উষাকালে সকলে একত্র হোয়ে প্যারিস নগরে যাত্রা কোল্লেম।

যথাযোগ্য যানবাহনে যথা সময়ে আমরা প্যারিসে পৌঁছি-লেম। মস্যুর পিমারিও ইতিপূর্ব্বে যেকথা আমাকে বলেন নাই, স্বদেশে উপস্থিত হয়ে সেই কথাটি প্রকাশ কল্লেন। কথার তাৎপর্য্য এই যে, নিজের বাড়ীতে আমাকে তিনি রাখবেন না; যে বাড়ীতে নিয়ে রাখলেন, সেখানি তাঁর ভাড়াটে বাড়ী। নিজ বাড়ীতে কেন রাখবেন না, তার হেতু এই যে, তাঁর মাতাপিতা আছেন, সহোদর ভাই আছে, যে ছুটি ভগ্নি সঙ্গে গিয়েছিলেন, তাঁরাও সেই বাড়ীতে থাকেন। আমি অপরিচিতা, তাতে আবার অবিবাহিতা, অতএব সে বাড়ীতে তিনি আমাকে রাখতে পারবেন না, রাখলেনও না। ভাড়াটে বাড়ীতে আমি থাকলেম। আবশ্যকমত দাসী চাকর নিযুক্ত হলো।

তিন দিন তিন রাত্রি সেই বাড়ীতে আমি বাস কল্লেম। চতুর্থ দিবসে পিমারিও আমাকে নগর দেখাতে নিয়ে বেরুলেন। গাড়ীতে আমরা তিন জন;—আমি, পিমারিও আর সিল্‌ভিয়া। নগরের শোভা অতি চমৎকার, সে শোভার কাছে লণ্ডনের

শোভা পরাস্ত হয়। অনেক ভদ্রলোকের বাস, অনেক দোকান পসার, অনেক সরকারি বাড়ী। সকল বাড়ীগুলিই মনোহর, বড় বড় দোকানগুলিও এক একখানি অট্টালিকা। বড় বড় দীঘি, বড় বড় বাগান, বড় বড় থিয়েটার, চিড়িয়াখানা, যাদু-ঘর ও পান্থশালা অনেক। কিন্তু প্যারিস নগরে বারাঙ্গনার সংখ্যা কিছু বেশী বলে বোধ হোয়েছিল।

নগরের শোভা দেখে আমার আশা হয়েছিল, অধিক দিন সে সহরে থাকতে পাল্লে আমি সুখী হতে পার্ব্বো। ভাগ্যে যদি সুখ না থাকে, স্বর্গেও সুখ হয় না; অরণ্য মধ্যে সামান্য পর্ণকুটীরে বাস কোরেও লোকে সুখে থাকে, ভাগ্যের খেলা এই রকম। আমাদের দেশের অনেক লোক, বিশেষতঃ ইংলণ্ডের অনেক লোক অদৃষ্ট মানে না, ফরাসি রাজ্যের প্রায় সকলেই অদৃষ্ট মেনে চলে। ফরাসি সিংহাসনে যিনি মহা প্রতাপে দণ্ডধর হোয়েছিলেন, সেই মহাবীর নেপোলিয়ন নিজে সর্ব্বপ্রকারে অদৃষ্টবাদী ছিলেন; তিনি নিজে ভাগ্যগণনার এক-খানি পুস্তক রচনা কোরেছিলেন; সেই দৃষ্টান্তে ফ্রান্সরাজ্যের প্রায় সমস্ত লোক নিজ নিজ ভাগ্যের উপর সমস্ত জীবনের শুভাশুভ নির্ভর করে। ছেলে বেলা থেকে আমিও অদৃষ্টকে খুব মানি, আমার জীবনে যা যা ঘটে আস্‌ছে, সমস্তই অদৃষ্টের ফল, সেই বিশ্বাসেই কোন দুর্ঘটনা আমাকে বেশী কাতর কোত্তে পারে না। প্যারিসে আমি সুখে থাক্‌তে পার্ব্বো, মনে এইরূপ আশা করেছিলেম; অদৃষ্টে যদি বিড়ম্বনা থাকে, সুখ আমার ভাগ্যে ঘট্‌বে না, সেটাও স্থির কোরে রেখেছিলেম।

যখন আমি প্যারিসে যাই, তখন আমার বয়স কুড়ি বৎসর। সে বয়সে আমাদের দেশের রমণীগণকে বালিকা বলা যায়; সে হিসাবে তখন আমি কুড়ি বৎসরের বালিকা।

একমাস আমার প্যারিসে বাস করা হোলো। পিমারিও নিত্য নিত্য আমার সঙ্গে দেখা করেন, অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সেই বাড়িতে থাকেন, আমাকে অনেক রকম বাদ্য যন্ত্র কিনে দিয়েছিলেন, প্রতি রজনীতে গীত বাদ্য হয়, আমোদ কৌতুক হয়, মদ খাওয়া হয়, বন্ধু-বান্ধবেরও আমদানী হোতে থাকে। ফরাসি রাজ্যে অনেক রকম ভাল ভাল সরাপ হয়, প্রায় সকল-গুলিই ঠাণ্ডা, সকল গুলিই সুস্বাদু, তন্মধ্যে সর্ব্ব প্রধান আসন পায় সুমধুর স্যাম্পীন।

আমোদে আমোদে একমাস কেটে গেল। পিমারিও এক-দিন বিবাহের প্রস্তাব কোল্লেন। লণ্ডন নগরে দুজনের প্রস্তাবে আমি বিলক্ষণ ভুক্তভোগী হোয়েছিলেম, নূতন লোকের প্রস্তাবে শীঘ্র রাজী হতে মন চাইতো না, কিন্তু পিমারিওর চালচলন দেখে শুনে বিবাহ কোত্তে আমি রাজী হোয়েছিলেম। বিবাহ হোয়েছিল। প্যারিসের সমাজের প্রধান প্রধান লোকের পরিণয় পদ্ধতি কিরূপ, সেটি আমার জানা ছিল না; পিমা-রিও আমাকে বলেছিলেন, তাঁদের বিবাহে গির্জ্জায় যেতে হয় না, পরমেশ্বরের বেদীর সম্মুখে শপথ কোত্তে হয় না, বিশেষ কোন ধর্ম্মযাজক পাদরিকে ডাকতে হয় না, চলনসই সামান্য একজন পুরোহিতকে আহ্বান করে, নিজের নিজের বাড়ীর বৈঠকখানাতেই ধর্ম্ম সাক্ষী করে পরস্পর পাণিগ্রহণ কল্লেই বিবাহ সিদ্ধ হয়। প্রবোধ দিয়ে তিনি আমাকে আরও বলে-

ছিলেন, পরমেশ্বর কেবল গির্জ্জামন্দিরে থাকেন, সেরূপ সিদ্ধান্ত করা মূর্খ লোকের পাগলামী; জগদীশ্বর সর্ব্বব্যাপি, সর্ব্বত্রেই তাঁর অধিষ্ঠান। বিবাহের সময় বৈঠকখানায় নিশ্চয়ই তিনি সাক্ষী থাকেন। আমি তাঁর সে সকল কথায় কোন আপত্তি করি নাই; বৈঠকখানাতেই বিবাহ হয়েছিল, সহরের সীমার বাহিরে এক ক্রোশ তফাতে একটি রমণীয় উদ্যানে একটি সুরম্য নিকেতনে আমাদের "হনিমুন" হয়েছিল; সে বিবাহে আমরা উভয়েই চরিতার্থ বোধ করেছিলেম।

বিবাহের পর পিমারিওর ভগ্নিরা, পল্লীবাসিনী অপরাপর বিবিরা এবং অন্য পল্লীর বিলাসিনী মহিলারা মধ্যে মধ্যে আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে আস্তেন, কাপ্তেন ফলিসনের বিবিটিও প্রতি সপ্তাহে দর্শন দিতেন, তাঁদের সঙ্গে আলাপে আমি অকপট আনন্দ অনুভব কোত্তেম। সমাজের রীতি লণ্ডনও যেমন, প্যারিসের সেইরূপ। পিমারিওর বন্ধু মহলের সৌখিন সৌখিন পুরুষরাও মাঝে মাঝে পান ভোজনের মজলিসে নিমন্ত্রিত হোয়ে, বেশ আমোদ আহ্লাদ কোরে যেতেন। অনেকের সঙ্গেই আমার ঘনিষ্ট আলাপ হোয়েছিল; বিবাহ উপলক্ষে আমি অনেক টাকা যৌতুক পেয়েছিলেম।

সপ্তাহে সপ্তাহে আমি নগরের এক এক পল্লীতে বেড়াতে যাই, উদ্যানে উদ্যানে হাওয়া খাই, বন্ধুলোকের বাড়ীতেও এক একদিন আমোদ আহ্লাদ কোরে আসি। এই রকমে আট মাস কাটলো। পিমারিও আমাকে যথেষ্ট ভাল বাসেন, যথেষ্ট সোহাগ করেন, যথেষ্ট টাকা দেন, দামী দামী অলঙ্কার বস্ত্রের অভাব জানতে পারি না, সকল রকম সুখেই আমার দিন

যায়; সে সুখে বুঝি বিচ্ছেদ হবে না, সেইরূপ আমার ধারণা হোয়েছিল।

হায়—হায়—হায়! সে সুখ আমার ভাগ্যে সইল না! অদৃষ্ট যখন বিগুণ হয়, সব সুখ তখন পলায়ন করে! বিধাতা আমার দাম্পত্যসুখে বাদী হোলেন; হঠাৎ একরাত্রে অধিক মাত্রায় তেজস্কর মদ্যপান কোরে, মস্যুর পিমারিও দম্ আট্‌কে মারা গেলেন। বিবাহের আটমাস পরেই আমি বিধবা হলেম।

পতিবিয়োগে আমার নূতন শোক-সিন্ধু উতলে উঠলো; পতির গুণাবলী স্মরণ করে আমি বিস্তর বিলাপ করলেম। সিল্‌ভিয়া আমাকে অনেক রকম বুঝালে, প্রবোধবাক্যে সান্ত্বনা করবার চেষ্টা পেলে, শীঘ্র শান্ত কত্তে পাল্লে না। পিমারিওর ভগ্নিরা আর আমার নূতন আলাপী সঙ্গিনীরা অনেক রকম প্রবোধ দিয়েছিলেন, পুরুষ বন্ধুরাও সমবেদনা জানাতে এসে-ছিলেন, মন আমার কিছুতেই প্রবোধ মানে নাই।

কিছু পুরাতন হলেই শোকের বেগ ক্রমে ক্রমে কম হয়ে আসে; দুই মাস বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করে, ভাগ্যফল স্মরণে আমি অল্পে অল্পে আপনা আপনি প্রবোধ পেতে লাগলেম। তখন ভাবনা এল, থাকি কোথা! যাই কোথা! আশ্রয় পাই কোথা! সিল্‌ভিয়ার পরামর্শ চাইলেম, সিল্‌ভিয়া আমার মনের মতন উত্তর দিতে পারলে না; আর আর যাঁরা যাঁরা আমার হিতৈষিণী সঙ্গিনী হয়েছিলেন, তাঁদের কাছেও পরামর্শ চেয়ে ছিলেম। তাঁদের মধ্যে কেহ কেহ বলেছিলেন, এই বাড়ীতেই থাক, বিবাহ হয়েছিল, স্বামীর সম্পত্তিতে অধিকারিণী হয়েছো;

এ সব ত্যাগ করে তুমি কোথায় যাবে? এই বাড়ীতেই থাক।

হা আমার অদৃষ্ট! আমিও যেমন, যাঁরা পরামর্শ দিলেন, তাঁরাও তেমনি পণ্ডিত?—ভাড়াটে বাড়ীতে আবার অধিকার কি?—সম্পত্তিতে অধিকার! সেটাই বা কি কথা! পিতা বর্ত্ত-মানে পুত্রের মৃত্যু, সম্পত্তিতে আমার অধিকার কিরূপে আসবে? আমি কোথাকার কে?—কোন আইন অনুসারে জীবন্ত শ্বশুরের সম্পত্তিতে আমি অধিকারিণী হবো? কোন কথাই কাজের নয়, বাড়ীখানা ত্যাগ করে যাওয়াই আমার ভাল বোধ হলো। কিন্তু কোথায় যাব? একটা আশ্রয় না পেয়ে রাস্তায় বাহির হওয়া কোন মতেই উচিত হয় না।

তিন মাস অতীত হয়ে গেল। পরিচিত বন্ধুদলের একটি যুবা পুরুষ সেই তিন মাস প্রায় নিত্য নিত্য আমাকে প্রবোধ দিতে আসতেন; আকার ইঙ্গিতে, ভাব ভঙ্গিতে তিনি আমার উপর ভালবাসা জানাতেন। এক দিন তিনি এসেছেন, নানা কথা তুলেছেন, এমন সময় পিমারিওর সেই দুটি ভগ্নি এসে দেখা দিলেন। একটু পরে কাপ্তেন ফলিসনের স্ত্রী বিবি ফলি-সানও সেইখানে এলেন। আমি যাই কোথা, সেই প্রশ্ন উত্থা-পিত হওয়াতে তারা তিন জনেই বল্লেন, যেমন ছিলে, যেমন আছ, সেই রকমই থাক; যাবে কোথা?

কাহারও কথা আমার ভাল লাগলো না, যে বাড়ীতে ছিলেম, সে বাড়ীর তিন মাসের ভাড়া বাকি পড়েছিল, সেইগুলি চুকিয়ে দিয়ে, নগরের আর এক পল্লীতে আর এক খানা নূতন বাড়ী ভাড়া নিলেম। লণ্ডনের টাকা, এডিনবরার টাকা,

প্যারিসের টাকা, তিন জায়গার টাকাই আমার হাতে মজুত ছিল, টাকার অভাব থাকলো না, সিল্‌ভিয়ার সঙ্গে আমি নূতন বাড়ীতে নীচে বাস করলেম; বড় মানুষি কেতা দেখাতে হয়, তা দেখাতে না পাল্লে প্যারিসের মতন জায়গায় মান পাওয়া যায় না। অবস্থা মত দাসী চাকর নিযুক্ত করলেম, দেউড়িতে দরওয়ান বসালেম, গাড়ী ঘোড়াও রাখলেম। বিধবা হয়ে এক বৎসর আমি সুখে দুঃখে অতিবাহিত কল্লেম। বয়স তখন আমার প্রায় বাইশ বৎসর।

যে রকম দস্তুর, বিধবাকে বিবাহ করবার জন্য অনেক লোক লালায়িত হয়; বিশেষতঃ আমার টাকা ছিল, আমার রূপ ছিল, আমার মজলিসি ধরণের অনেক গুণ ছিল; কতকগুলি যুবা আমাকে বিবাহ করবার লালসায় খুব খোসামোদ জুড়ে দিলে। যে লোকটির কথা পূর্ব্বে বলেছি, সেই লোকটির উমেদারী কিছু পাকা পাকা। লোকটির নাম বটারফ্লাই। তাকেই আমি বিবাহ কোল্লেম। বার বার এক রকমের বেশী কথা বলা আমি ভালবাসি না; অদৃষ্টের ফলাফল সংক্ষেপে বোলে যাই।

উপর্য্যুপরি আমি পাঁচ জনকে বিয়ে কোরেছিলেম। একটার পর একটা। দ্বিতীয় বার বিবাহের বর সেই বটারফ্লাই; তাকেই আমি প্রথম বলে গণনা কোল্লেম; কেননা, প্রথম বিবাহে এক প্রকারে কুমারী কালের ব্রতটাই রক্ষা হোয়েছিল; বিধবা হবার পর পাঁচ বিবাহ। সেই পাঁচ বারই আমি বিধবা হই। যার সঙ্গে বিবাহ হয়, তার মরণেই বিধবা হতে হয়, কিন্তু পাঁচ বার আমি সে রকমে বিধবা হই নাই; দুজনের

মরণ আর বাকি তিন জনের সঙ্গে ডাইভোর্স। আমার দোষে ডাইভোর্স ঘটে নাই, পুরুষের দোষেই ঘটেছিল। ডাইভোর্স আইনের গোড়া বড় শক্ত; খুব বাঁধাবাঁধি। পুরুষ হোক কিম্বা স্ত্রী হোক, সুস্পষ্ট ব্যভিচার প্রমাণ কোত্তে না পাল্লে ডাইভোর্সের দরখাস্ত মঞ্জুর হয় না; হাতে-নোতে আমি ব্যভিচার ধরেছিলেম, আদালতে স্পষ্ট স্পষ্ট প্রমাণ দিয়েছিলেম, বিবাহ গুলো খারিজ হোয়ে গিয়েছিল। শেষবারের ডাইভোর্সের সময় আমার বয়স হোয়েছিল প্রায় ত্রিশ বৎসর।

আর আমি বিবাহ করবো না, সভ্যদেশের সভ্য পুরুষের প্রেমে আর আমি মজবো না, যীশুখৃষ্টের দোহাই দিয়ে যারা চলে, তাদের ভণ্ডামীতে আর ভুলবো না, এই রকম আমার প্রতিজ্ঞা হোয়েছিল;—দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। সেই বয়সে যথার্থই আমি বিধবা হোয়ে থাকলেম। ভারতবর্ষের হিন্দুজাতীর বিধবারা যেমন চিরজীবন পবিত্র ব্রতপালন করে, হিন্দু ব্যবস্থায় হিন্দু বিধবার পক্ষে যে প্রকার আঁটা আঁটি, বিবিধ পুস্তকে সে সম্বন্ধে যে রকম আমি পাঠ কোরেছিলেম, ততদূর শক্ত শক্ত বাঁধাবাঁধি রাখতে পারি নাই, পুরুষের সংসর্গে যাব না, সৌখিন দলে মিসবো না, কেবল সেই রকম আমার সংকল্প হোয়েছিল।

সংকল্প সাধন করা সকলের পক্ষে সহজ হয় না। বিশেষতঃ আমি স্ত্রীলোক, মাথার উপর অন্য কোন উপযুক্ত অভিভাবক ছিল না, সৎবুদ্ধি দিবার,—সৎপরামর্শ দিবার যোগ্য লোকের বড়ই অভাব; যা করে একমাত্র সিলভিয়া। আমার মন যখন যে দিকে যায়, সব কথাই আমি তখনি তখনি সিলভিয়াকে

বলি; সিলভিয়া আমার মন ফেরায়, যে বেগটা ভাল বিবেচনা করে, সেই দিকের স্রোতে সুবাতাস দেয়, তাতেই আমি রক্ষা পাই, তাতেই আমার মঙ্গল হয়। তবু—তবু মনে রাখতে হয়, সিলভিয়া স্ত্রীলোক;—স্ত্রীলোকের বুদ্ধি সকল সময়ে এক রকমে স্থির থাকে না, স্ত্রীলোকের বুদ্ধি সকল সময় শুভকরী হয় না। যে স্ত্রীলোকের বুদ্ধি খুব ভাল, তাদের পরামর্শ বরং উপকারে আসে, কিন্তু যাদের বুদ্ধি নাই কিম্বা দুষ্ট বুদ্ধি আছে, তাদের পরামর্শ নিয়ে কাজ কোল্লে বিপরীত হোয়ে দাঁড়ায়; পদে পদে বিপদ ঘটে; পরিণামে বিলক্ষণ পস্তাতে হয়। সিলভিয়া বিশুদ্ধ বুদ্ধিমতী, তার পরামর্শগুলিও বিশুদ্ধ হোতো, তবুও সে আমার অধীন ছিল কিনা, প্রিয় সহচরি হোলেও এক এক সময়ে সে আমাকে একটু একটু ভয় কোরে চোলতো; গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হোলে সে সমস্যা পূরণে তার একটু একটু সঙ্কোচ আস্‌তো; সেই সঙ্কোচেই আমার পতন।

ত্রিশ বৎসর বয়সে আমার সংকল্প হোয়েছিল, হিন্দু বিধবাদের মতন কতকটা পবিত্রতা রক্ষা কর্ব্বো, কিন্তু চাঞ্চল্য বশে পেরে উঠলেম না। এক বৎসর ঠিক রেখেছিলেম; নির্জ্জন বাস,—বাড়ী থেকে কোথাও বেরুতেম না, মদ্য মাংস ছুঁতেম না, রসিকতার আভাসে কোন পুরুষের সঙ্গে আলাপ কোরতেম না, কোন পুরুষ আমার সঙ্গে দেখা কোত্তে এলে বিশেষ পরিচয় জানতে না পাল্লে তার কাছে আমি দেখা দিতেম না, দেউড়ি থেকেই ফিরিয়ে দিতেম, এই নিয়ম রেখেছিলেম এক বৎসর। তারপর আর পারি নাই। পূর্ব্ব পরিচয়ের উল্লেখ কোরে এক এক জন পুরুষ আমার নামে

চিঠি লিখতো, সাক্ষাৎ করবার অনুমতি চাইতো, চিঠিতে কত রকম শিষ্টাচার, কত রকম মিনতি, কত রকম ধর্ম্মভাবের বাক্য বিন্যাস কোত্তো, এক এক জন এক একটা কৌশল খাটাতো, এক একটি পরিচিতা রমণীকে দূতি নিযুক্ত কোরে আমার কাছে পাঠাতো; কত বার আমি সে সব লোকের সে সব কৌশল ফাঁসিয়ে দিয়েছিলেম, তথাপি শেষ রক্ষা হয় নাই।

সেই যে পিমারিওর বন্ধু কাপ্তেন ফলিসান এক বৎসর পরে তিনি একদিন আমার ভাড়াটে বাড়ীর দরজায় এসে, আমার কাছে কার্ড পাঠান; দেখা দিই কি না দিই, অনেক ভেবেছিলেম, অনেকক্ষণ ইতস্ততঃ কোরেছিলেম, শেষকালে ভেবেছিলেম ফিরিয়ে দেওয়া ভাল হয় না;—পূর্ব্বে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হোয়েছিল, ফিরিয়ে দেওয়া উচিত কার্য্য নয়; অভদ্রতা প্রকাশ পাবে, গর্ব্ব প্রকাশ পাবে, ঔদাস্য প্রকাশ পাবে, ফিরিয়ে দেওয়া ভাল হয় না; এই ভেবে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে আমার মন হোয়েছিল; যে লোকের হাতে তিনি কার্ড পাঠিয়েছিলেন, সেই লোককে দিয়ে আমি সম্মতি জানিয়েছিলেম, তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরেছিলেন। আমি তাঁর খাতির কোরেছিলেম, যে সকল কথায় দোষ হয় না, সে সকল কথাও তাঁর মুখে শুনেছিলেম, আমিও সেই রকমে এক এক কথার উত্তর দিয়েছিলেম; আধ ঘণ্টা থেকে তিনি চোলে গিয়েছিলেন।

একদিনেই মানুষের আশা পূর্ণ হয় না; প্রথম দিনের উৎসাহ পেয়ে, কাপ্তেন ফলিসান উপর্য্যুপরি দশ দিন দেখা

কোত্তে এসেছিলেন; দিনমানেই আসতেন, দিনমানেই চলে যেতেন। একদিন দেখি সন্ধ্যার পরেই উপস্থিত। আমার কিছু শঙ্কা হোয়েছিল, শঙ্কায় শঙ্কায় একটু তফাতে বোসে তাঁর সঙ্গে আমি আলাপ কোরেছিলেম, আমি বসি তফাতে, তিনি কিন্তু তাঁর নিজের চেয়ার সরিয়ে সরিয়ে নিয়ে আমার দিকে সরে সরে আসেন; লক্ষণ বড় ভাল বোধ হয় নাই; যতই তিনি সরে আসেন, ততই আমি সরে যাই, হাস্য কোরে তিনি বলেছিলেন, আমাকে দেখে কি তুমি ভয় পাচ্ছো? আমি কি বনের বাঘ, টপ্ কোরে কি তোমাকে খেয়ে ফেলবো? ভয় পাও কেন? আমি তোমায় দুটো ভাল কথা বোলতে এসেছি, মন্দ চেষ্টায় আসি নাই, একটু স্থির হোয়ে কথাগুলি তুমি শুনলেই আমি সন্তুষ্ট হই।

কি তাঁর ভাল কথা, অনুমান কোরে বুঝতে পারলেম না, কিন্তু আপত্তিও কোরলেম না, চুপ কোরে থাকলেম। তিনি আরম্ভ কোল্লেন, সংসারে যেটি ঘটবার অবশ্যই সেটি ঘটে; তুমি অনেক রকম মনবেদনা পেয়েছো, তা আমি বুঝেছি; অনেকেই এই রকমে মনবেদনা পায়, উপযুক্ত ঔষধ ব্যবহার কোল্লে সে বেদনা ভাল হোয়ে যায়; তুমি সেই রকম একটা ঔষধ ব্যবহার করো। তোমার কিসের বয়স? ভাল দেখে পছন্দ কোরে আবার তুমি একটি বিবাহ করো; সব বেদনা ভাল হোয়ে যাবে। স্ত্রীজাতির স্বতন্ত্র থাকতে নাই, একাকিনী থাকার অনেক দোষ; মন ক্রমে ক্রমে খারাপ হোয়ে যায়। আমি শুনেছি, কোন কোন স্ত্রীলোক বিধবা অবস্থায় তোমার মতন এই রকম নিঃসঙ্গ হোয়ে থেকে থেকে

শেষকালে পাগল হোয়ে গিয়েছিল। এ রকম নিঃসঙ্গ হোয়ে তুমি থেকো না; সুপাত্র দেখে আর একটি বিবাহ করো। যদি তোমার অনুমতি পাই, তা হোলে আমিই একটি যোগ্যপাত্র জুটিয়ে দিতে পারি।

চমকে উঠে আমি বোলেছিলেম, ও রকম কথা আমাকে আপনি আর বোলবেন না; এ জীবনে ও রকম কথা আর আমি শুনবো না। বার বার বিবাহ করবার যে ফল, তা আমি বেশ জানতে পেরেছি, খুব ভোগ ভুগেছি, আর আমি সে পথে যাবো না। যেমন আছি, এই রকমেই জীবন কাটাবো। এই খানেই থাকি কিম্বা অন্য দেশেই যাই, যেখানকার মাটি আমার ভাগ্যে থাকে, এই রকমেই সেই খানে আমি মাটি হবো; ও রকম কথা আপনি আর আমার কাণে তুলবেন না;—বিবাহের কথা আমার কাণে যেন বিষ বোধ হয়।

ফলিসান বোলেছিলেন, আচ্ছা, মনটা একটু স্থির করো; আজ আর আমি সে কথা তুলে তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না; আপনা আপনি বিবেচনা কোরে যখন তুমি বুঝবে, তখন আপনা হতেই আমাকে ডেকে পাঠাবে, যে কথাটা আজ ভাল লাগলো না, কিছুদিন পরে সেই কথাই আবার খুব মিষ্ট লাগবে। আমি তোমার মঙ্গল চাই, সেটা কিন্তু তুমি ঠিক জেনে রেখো।

কতক আমি শুনলেম, কতক যেন বাতাসে উড়ে গেল; কোন কথায় আমি কোন উত্তর দিলেম না; তিনিও সে প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে অন্য প্রসঙ্গ ধরলেন। লণ্ডন সহর ভাল,

কি এডিনবরা সহর ভাল, কি প্যারিস সহর ভাল, সেই কথা তুলে তিনি অনেক প্রকার বাগাড়ম্বর কোরলেন; আমার অঙ্গে যেন তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ কণ্টকবিদ্ধ হোতে লাগলো। উঠে গেলে বাঁচি, নিমেষে নিমেষে সেই রকম ইচ্ছা আমার মনে হোতে লাগলো। আমি অত্যন্ত অস্থির হোলেম।

আমি অস্থির হোলেম কিন্তু কাপ্তেন বিলক্ষণ সুস্থির। কথার কৌশলে তিনি একটু মদ খাবার আভাস জানালেন। আমার ঘরে তখন সে সব জিনিস থাকতো না, অপ্রস্তুত হবার ভয়ে, তাঁর অজ্ঞাতে বাজার থেকে একটা ফ্রেঞ্চব্রাণ্ডি আনিয়ে, আমি তাঁর আশা পূর্ণ করেছিলেম। মদিরা মহিমায় এক একজনের বক্তৃতা-শক্তি বাড়ে, কাপ্তেন ফলিসান আরো প্রায় এক ঘণ্টাকাল অবিশ্রান্ত বক্তৃতা কোরে বিদায় গ্রহণ কোল্লেন। বলে গেলেন, আগামী শনিবার আবার আসবেন।

বিবি অলিভিয়ার কাহিনী বড় ছোট নয়, ক্রমাগত তিন সপ্তাহকাল এই কাহিনী আমি শ্রবণ করিতেছিলাম; কাপ্তেন ফলিসান বিদায় হইয়া গেলেন, সেই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া, বিবিকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি অতগুলি বিবাহ করিয়াছিলে, তবু এখনও তুমি আপনাকে "মিস্" বলিয়া পরিচয় দাও, ইহার অর্থ কি?

এই প্রশ্নে অলিভিয়া উত্তর দিয়েছিলেন, তাৎপর্য্য আছে। বিবাহ কোরেছিলেম অনেকগুলি, কিন্তু শাস্ত্রমত বিবাহ একটাও নয়। পিমারিওকে যখন বিবাহ করি, তখন বলে রেখেছি, গির্জ্জা মন্দিরে পরমেশ্বরের বেদীর সম্মুখে দস্তুর মত মন্ত্রপাঠ

কোরে বিবাহ হয় নাই, বৈঠকখানাতেই এক রকম সখের বিবাহ। যে কটা বিবাহ হোয়েছিল, সব কটাই এক রকম। বিবাহের গণ্ডগোল চুকে গেলে, বার বার আমি বিধবা হোলেম। একদিন একজন বৃদ্ধ পাদ্রির সঙ্গে আমার দেখা হোয়েছিল; তাঁরে জিজ্ঞাসা কোরে আমি জেনেছিলেম, প্যারিসের ভদ্রলোকের বিবাহের জন্য শাস্ত্র ছাড়া স্বতন্ত্র বিধি নাই, সকলকেই গির্জ্জায় গিয়ে বিবাহ কোত্তে হয়; তবে যাহারা কোন প্রকার গুপ্ত কারণে গোপনে বিবাহ করে, তাদের বিবাহ বৈঠকখানাতেও হোতে পারে, রন্ধনশালাতেও হোতে পারে, বনমধ্যেও হোতে পারে। সে রকম বিবাহকে বিবাহ বলে না।

পাদ্রির বাক্যপ্রমাণে আমার ঠিক বিশ্বাস হোয়েছে, আসলেই আমার বিবাহ হয় নাই; আমি কেবল জনকতক লোকের খেলার সামগ্রী হোয়েছিলেম; সুতরাং চিরদিন আমি কুমারী আছি; সেই জন্যই চিরদিন আমার নাম মিস্ অলিভিয়া।

কাপ্তেন ফলিসানের সঙ্গে যতক্ষণ আমার কথা হোয়েছিল, কপাটের আড়ালে দাঁড়িয়ে সহচরি সিল্‌ভিয়া ততক্ষণ সব কথাগুলি শুনেছিল; কাপ্তেন বিদায় হবার পর সিলভিয়া আমাকে অনেক রকম তিরস্কার করে, তাতে আমি বড় লজ্জা পাই। কাপ্তেনকে আর দেখা দিব না, সিল্‌ভিয়ার কাছে সেইরূপ প্রতিজ্ঞা করি। ক্রমেই দিন যেতে লাগলো, যে শনিবারে কাপ্তেনের আসবার কথা, সেই শনিবার সমাগত।

বেলা পাঁচটা। সামান্য এক সুট পরিচ্ছদ পরিধান কোরে, বাড়ী থেকে আমি বেরুলেম; বহু দিনের পর বাহির হওয়া।

যে পথে দাঁড়িয়েছিলেম, সে পথে বাজারের গণিকাতে আর আমাতে বড় একটা ভেদ ছিল না; সে পথে অনেক মিথ্যা কথা শিখতে হয়, আমিও অনেক মিথ্যা কথা শিখেছিলেম; বাহির হবার সময় সিলভিয়াকে আমি বোলে গেলেম, কাপ্তেন যদি আসেন,—আসবেনই ঠিক, তাঁকে তুমি বলো, আমি একটি বন্ধু লোকের বাড়ীতে গিয়েছি, রাত্রে আর ফিরবো না। আমার উপদেশ শুনে সিল্‌ভিয়া হাস্য কোরেছিল।

আমি বেরুলেম। যে যে পল্লীতে পূর্ব্বে আমার গতিবিধি ছিল, সে সকল পল্লীতে গেলেম না; একটা নূতন রাস্তা ধোরে নূতন পল্লীর দিকে চল্লেম। পদব্রজেই চলেছি, কিছুই কষ্ট হোচ্ছে না, আধ ক্রোশের বেশী দূর গিয়ে পড়েছি; কিন্তু কোথায় যাচ্ছি, ঠিক নাই, কোন স্থান লক্ষ্য নাই। আমি যত এগুচ্ছি, সূর্য্যও তত এগুচ্ছেন; রৌদ্র প্রায় দেখা যায় না; কেবল উচ্চ উচ্চ তরুশিখরে আর উচ্চ উচ্চ সৌধশিখরে স্বর্ণ বর্ণ আভা দৃষ্ট হচ্ছেলো; এমন সময় দেখি, আমার সম্মুখ দিক থেকে একটি লোক এক গাছা ছড়ি ঘুরাতে ঘুরাতে হন্ হন্ করে চলে আস্‌ছে। ব্যবধান প্রায় কুড়ি হাত। মানুষ আসছে, পথের মানুষ, কত মানুষ যাওয়া আসা করে, কে তো কে, প্রথমে ভ্রুক্ষেপ কল্লেম না; আমিও এগিয়ে এগিয়ে যাচ্ছি, সে লোকটিও আমার দিকে এগিয়ে এগিয়ে আস্‌ছে দেখতে দেখতে ঠিক আমার সম্মুখে এসে দাঁড়াল্লো; সটান আমার মুখপানে চেয়ে, হঠাৎ জিজ্ঞাসা কল্লে, অলিভিয়া রোজ! তুমি এখানে কেমন করে এসেছো?

সম্বোধন শুনেই আমি চম্‌কে উঠলেম। এতক্ষণ তার মুখের

দিকে ভাল করে চাই নাই, সেই সময় চকিত নয়নে চেয়ে দেখলেম—বোধ হলো একটু একটু চেনা, কিন্তু কে সে, ঠিক্ চিন্তে পারলেম না। লোকটি আমাকে পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা কল্লে, প্যারিসে তুমি কবে এসেছো? কত দিন এখানে আছ? কার কাছে তুমি রয়েছো? কোন পাড়ার কোন বাড়ীতে তোমার বাসা?

এতগুলি প্রশ্ন যেন ঝড়ের মতন আমার মাথার উপর দিয়ে বোয়ে গেল। অবাক্ হয়ে একদৃষ্টে আমি তার মুখপানে চেয়ে রইলেম। প্রায় পাঁচ মিনিট ভাল করে দেখে, লোক-টিকে আমি চিন্তে পারলেম; সবিস্ময়ে মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞাসা কল্লেম, মিষ্টার পামর! তুমি এখানে অকস্মাৎ কোথা থেকে এলে?

স্মরণ হতে পারবে, লণ্ডনের সহরতলীতে যে দিন আমি মাতালের ভয়ে একটা সংকীর্ণ পথে প্রবেশ করি, কুকুর সঙ্গে করে হোরেস যে দিন সেই পথে প্রবেশ করে, সেইদিন এই লোকটি আমার পথপ্রদর্শক হয়েছিল, এই লোকটিই আমাকে মাতালের ভয় দেখিয়েছিল। বহু দিনের পর সেই লোক আমার চক্ষের সম্মুখে;—এই সেই মিষ্টার পামর।

পূর্ব্বেই বলা আছে, এই পামরের সঙ্গে আমার জানা শুনা ছিল, কিন্তু বেশী দিনের পরিচয় ছিল না। এই পামর যে দিন আমাকে মাতালের ভয় দেখায়, আমি বনপথে প্রবেশ কল্লে সেই দিন এই পামর আমাকে বিবাহ করবার আভাব জানিয়েছিল, ব্যগ্রতা জানিয়ে, মিনতি কোরে ভালবাসার কথা পেড়েছিল; আমি কোন প্রকার উৎসাহ দেখাই নাই। বহু-

দিনের পর প্যারিস নগরে সেই মিষ্টার পামরের সঙ্গে আবার আমার দেখা।

পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুজনে আমরা অনেকগুলি কথা বলাবলি কল্লেম; যে সকল কথায় ভালবাসার লক্ষণ প্রকাশ পায়, পামর তখন সে ভাবের একটি কথাও উত্থাপন কল্লে না। সংক্ষেপে সংক্ষেপে বল্লে, ছয় সাত মাস প্যারিসে আছে, কাজকর্ম্মের যোগাড় কচ্ছে। যে বাসায় থাকে, সেই বাসায় সে আমাকে একবার নিয়ে যাবার ইচ্ছা জানালে, এক রকম হলো ভাল; যে দিকে যাচ্ছিলেম, সে দিকে আমার কোন লক্ষ্যস্থল ছিল না। অথচ অন্ততঃ দশটা রাত্রি পর্য্যন্ত বাহিরে বাহিরে থাকা আমার দরকার ছিল; পামরের প্রস্তাবেই আমি সম্মত হলেম।

পথের মধ্যে যেখানে দেখা হয়েছিল, সেখান থেকে পামরের বাসা বেশী দূর ছিল না, দশ মিনিটের মধ্যেই সে আমাকে বাসায় নিয়ে তুল্লে। ছোট একখানি বাড়ী, দিব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ছোট একটি বারাণ্ডা, সেই বারাণ্ডায় টবে টবে গুটিকতক ফুলের গাছ। সন্ধ্যার সময় সেই সকল গাছে দিব্য দিব্য ফুল ফুটে ছিল, ফুর ফুর কোরে হাওয়া আসছিল, হাওয়ার সঙ্গে মিশে সেই সকল ফুলের সুগন্ধ আমাকে একটু আমোদিনী কল্লে। বারাণ্ডাতেই দুখানি চেয়ারে আমরা দুজনে বোস্‌লেম। নানা রকম গল্প আরম্ভ হলো।

সাত মাস পূর্ব্বে মিষ্টার পামর প্যারিসে এসেছে, সাত মাস পূর্ব্বের লণ্ডনের খবর তার কাছে অনেক শুনতে পাওয়া গেল। ডিউক কেশিংটন লণ্ডনে ফিরে আসেন নাই; হোরেস

রকিংহাম কারাগারে প্রাণত্যাগ কোরেছে; বৃদ্ধ রকিংহামের বিষয় আশয় নীলাম হয়ে গিয়েছে, যারা যারা রকিংহামের খাতক ছিল, তারা সকলেই অব্যাহতি পেয়েছে। মহাজনের মরণে অনেক নচ্ছার খাতক খুসি হয়, সেই কথা বলে মিষ্টার পামর একটু হাস্য করে ছিল। আমার মাতার মৃত্যু, পিতা পাগল, সে কথাও সত্য, পামরের মুখে তাও আমি জানতে পারলেম। শোক একটু নূতন হয়েছিল, নেত্রে অশ্রুপাত হয়েছিল, তথনি কিন্তু সে শোক সম্বরণ করেছিলেম। সিরিলের সঙ্গে পামরের দেখা হয়েছিল, সিরিল এখন সর্ব্বপ্রকারে সুখী, কেবল আমার জন্যই মনে মনে বিষাদ, পামরের মুখে সে কথাও আমি শুনলেম। আমার মুখে পামরও আমার সুখ দুঃখের অনেক কথা শ্রবণ কল্লে; পাঁচ জনকে আমি বিবাহ করেছিলেম, কেবল সেই কথাটা তার কাছে আমি প্রকাশ কল্লেম না।

পামর আমাকে একটি ঘরের ভিতর নিয়ে গেল, মদ খাবার অনুরোধ কল্লে; মদ আমি ছেড়ে দিয়েছি, এই কথা বলে সে অনুরোধ আমি এড়ালেম। পামর নিজে দুই তিন গেলাস মদ খেলে, কিছু জলযোগের সামগ্রী আনালে, ইচ্ছা না থাকলেও অগত্যা আমি কিঞ্চিৎ আহার কল্লেম।

বাসার ভিতর দুটি তিনটি লোক ঘুরে বেড়াচ্ছিল; বোধ হয়েছিল চাকর। একটিও মেয়ে মানুষ সেখানে আমি দেখতে পেলেম না। আগ্রহে, সন্দেহে, কৌতূহলে, পামরকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলেম, তোমার পত্নীকে কি তুমি এখানে সঙ্গে করে এনেছো?

আমার নয়নের উপর নিজের বিস্ফারিত নয়ন স্থাপন

কোরে, কেমন এক রকম চমকিত স্বরে পামর বোলে উঠলো, পদ্মি?—তোমার কি সে কথা মনে নাই?—এ জগতে তোমাকে ছাড়া আর কোন রমণীকে পত্নী বোলে আমি গ্রহণ কোর্ব্বো না, তোমার কাছে এইরূপ প্রতিজ্ঞা কোরেছিলেম, আমার সে প্রতিজ্ঞা কি তোমার মনে পড়ে না?—উঃ? বার বৎসরের কথা!—কিম্বা হয়তো আরও বেশী—আমার পক্ষে যেন শত শত যুগ—এই দীর্ঘকাল লণ্ডনের কত জায়গায় আমি যে তোমার কত অন্বেষণ করেছি, একে একে পরিচয় দিতে গেলে, মস্ত একখানা কেতাব হয়। শুনেছিলেম, ডিউক ফেশিংটনের সঙ্গে তুমি স্কট্‌লণ্ডে গিয়েছিলে, এডিনবরাতেও আমি তোমার বহু অনুসন্ধান কোরেছিলেম, ঠিকানা ধর্‌তে পারি নাই; কোন সংবাদও পাই নাই। এতদিনের পর জগদীশ্বর আমার প্রতি সদয় হোলেন, প্যারিসে এসে আবার আমি তোমার এই চন্দ্রবদন দর্শন কোল্লেম। যদি দেখাবার হোতো, বুক চিরে দেখাতেম, আমার বুকের ভিতর তোমার এই প্রতিমা-খানি আঁকা আছে।

মনে মনে হেসে, বাহিরে গাম্ভীর্য্য দেখিয়ে, কিঞ্চিৎ উচ্চ-কণ্ঠে আমি জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তবে কি সত্য সত্যই এখনও তুমি বিবাহ কর নাই?—পামর উত্তর কোল্লে, মনটিকে কোথা যে রেখে আমার কথাগুলি তুমি শুন্‌লে তবে?—এত কথা আমি বোল্লেম, তারপর আবার ঐ রকম প্রশ্ন?—এতক্ষণ কি তবে আমি অরণ্যে রোদন কোল্লেম?

আবার আমার হাসি পেলে। হাস্‌লেম না, সাবধানে হাসি চেপে রেখে, গম্ভীর বদনে আমি বোল্লেম, অরণ্যে রোদন নয়,

তোমার সব কথাই আমি শুনেছি, কিন্তু যে আশার উপর তুমি নির্ভর কোরে রয়েছ, সে আশা যে পূর্ণ হবে, সাহস কোরে সে কথা আমি বোল্‌তে পাচ্ছিনা। আমার যেন মনে হোচ্ছে, সেটা তোমার দুরাশা। একেতো আমার বয়স হোয়েছে, ত্রিশ বৎসর ছাপিয়ে গিয়েছে, এ বয়সে বিবাহ কোত্তে আমার সাধ হবে কি না, তা আমি বোল্‌তে পাচ্ছিনা, তাতে আবার নানা কারণে আমার মন বড় খারাপ হয়েছে। এত দিন অবিবাহিত থাকা তোমার পক্ষে ভাল হয় নাই। একটী সুন্দরী দেখে বিবাহ করাই তোমার পক্ষে ভাল ছিল।

পামর খানিকক্ষণ হাঁ কোরে রইল, তার মুখখানা হঠাৎ রাঙা হোয়ে উঠ্‌লো, তখনি আবার সে ভাবের পরিবর্ত্তন;—যেন উপহাসের হাসি হেসে, গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে, সে আমাকে বোল্লে, তুমি কি আমার সঙ্গে তামাসা কোচ্ছো?—এর মধ্যে তুমি কি বুড়ী হোয়েছ? এর মধ্যে কি তোমার বিবাহের সাধ ফুরিয়ে গিয়েছে?—ত্রিশ বৎসর বয়স! এই বয়সে সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করাই কি তোমার সংকল্প?—ছি—ছি—ছি! এতটা বৈরাগ্যভাব এনোনা। ত্রিশতো ত্রিশ, আশি বৎসরের সুন্দরীরাও পাকা চুলে কলপ দিয়ে, হাতির হাড়ে দাঁত বাঁধিয়ে বিশ বৎসরের রসিক নাগরকে বিবাহ করে; তাদের গর্ব্ভে পাঁচ সাতটা ছেলে মেয়েও হয়; নিজের দেশের বিবাহের কাণ্ডটা কি তুমি জান না? ত্রিশ বৎসর বয়সে একেবারে সুখ-সাগরের ভরা তরণীর হাল ছেড়ে দিয়ে বোসছো?

আবার হাস্য সম্বরণ কোরে, মিঠা মিঠা বুলিতে আমি উত্তর কোল্লেম, হাল ধর্ত্তেই আমি শিখি নাই, ছাড়াছাড়ির

কথা বলছো কি? যারা ধর্ম্মে জানে, তাদের কাছে গিয়ে উপাসনা কোরো, ভরা তরণী বেশ চোল্‌বে।

কতকটা যেন আশ্বাস পেয়ে, প্রেমের পাগল মিষ্টার পামর সকৌতুকে বল্লে, আমি তোমাকে হাল ধরা শিখাবো। তোমার প্রেম-তরণী যৌবন পসরায় পরিপূর্ণ; ত্রিশ বৎসরের সুন্দরীকে আমরা নবীনা যুবতী বোলে গণনা করি, যোড়শী বালিকারা যুবতী নামে গণ্য হোতে পারে না। যদি তুমি একান্তই আপনাকে তরণী চালনে অক্ষম মনে কোরে থাকো, বিবাহের অগ্রে কিছুদিন আমার কাছে শিক্ষানবিসী করো আমি তোমাকে বিলক্ষণ পাকা কোরে তুল্‌বো। ধিক্কার দিয়ে তীব্রস্বরে আমি বোল্লেম, তরুণীরা কি তরণী চালায়?—কার কাছে তুমি এ বিদ্যে শিখেছো? আসলেই তোমার রস বোধ নাই। তরুণীরা তরণী, পুরুষেরা চালায়, তরুণীরা চলে, এইটিই তো সর্ব্বলোকে জানে। সে জ্ঞান যখন তোমার হয় নাই, তখন তুমি আরও কিছুদিন আইবুড়ো থেকে, রসিক-রসিকাদের কাছে শিক্ষানবিসী কোরো। আমি যখন—

আর আমার বলা হোলো না। চারিদিকের গির্জ্জার ঘড়ীরা ঢং ঢং শব্দে ঘোষণা কোরে দিলে, রাত্রি দশটা।

বাসায় ফিরে আসবার জন্য আমি ব্যস্ত হোলেম; চেয়ার থেকে উঠে আমি দাঁড়ালেম; চঞ্চলস্বরে পামরকে বোল্লেম, আজ আমি বিদায় হই, অবকাশক্রমে আর একদিন এসে দেখা কোরে যাবো।

আমার দেখাদেখি শীঘ্র শীঘ্র আসন থেকে উঠে, ব্যগ্রভাবে আমার একখানি হাত ধোরে, উন্মত্ত পামর সবিনয়ে বোল্লে,

আর একটু থাকো;—স্ত্রীলোক তুমি, এই রাত্রিকাল, প্যারিসের রাজপথে অনেক রকম লোক বেড়ায়, মাতালও অনেক; একাকিনী যদি তুমি যাও, পথের মাঝে বিপদ ঘটতে পারে। আমার গাড়ী নাই, তা যদি থাকৃতো, তা হোলে আমার কোচমান নিরাপদে তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আসতো, তা যখন নাই, তখন তোমাকে একাকিনী ছেড়ে দিতে আমি পাচ্ছি না। আঁর একটু থাকো,—আমি নিজেই তোমাকে রেখে আস্‌বো। হেঁটে যেতে হবে কিনা, দুজনে এক সঙ্গে যাওয়াই ঠিক পরামর্শ। গল্প কোত্তে কোত্তে যাওয়া যাবে, পথশ্রমের কষ্টও অনুভব হবে না। হাঁ,—ভাল কথা,—তোমার বাসা এখান থেকে কত দূর?

একটানে লোকটার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, নিতান্ত অনিচ্ছায় আবার আমি উপবেশন কোল্লেম; একটু যেন অহঙ্কার জানিয়ে তারে আমি বোল্লেম, কি রকম লোক তুমি?—আমাকে কি তুমি এতই গরীব মনে কোরে রেখেছ? হেঁটেই যেতে হবে, এটা তুমি কি কোরে জানতে পাল্লে? আমার বাসা এখান থেকে এক ক্রোশের কিছু উপর; রাত্রিকালে তত পথ আমি হেঁটে যাবো, সেটা মনে করাই তোমার ভুল। সহর জায়গা, ঠিকা গাড়ীর অভাব কি?

অপ্রস্তুত হোয়ে পামর তখন একটু নরম সুরে বোল্লে, না—না—না,—সে কথা আমি বল্‌ছি না;—তবে কি জান, রাত্রিকালে ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় পাইচারি কোত্তে কোত্তে হেঁটে যাওয়াই ভাল; তাতে আরাম আছে;—দুজনে দিব্য হাওয়া খেতে খেতে, নানা রকম গল্প কোত্তে কোত্তে, বেশ যাওয়া

যাবে; তোমার বাসাটিও আমার দেখে আসা হবে। পাঁচ মিনিট বোসো, আমি প্রস্তুত হই।

প্রস্তুত হওয়া কি রকম, সেইটি জানবার আমার ইচ্ছা হোলো; তখনই তখনই জানতে পাল্লেম। মস্ত একটা টম্বল গেলাসে কানায় কানায় ব্রাণ্ডি ঢেলে বিলাতী পামর এক নিশ্বাসে এক চুমুকে, সব টুকু সাবাড় কোল্লে; তারপর মস্ত একটা টুপি মাথায় দিয়ে, এক গাছা ছড়ি হাতে কোরে, দ্রুতপদবিক্ষেপে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো; শিস্ দিয়ে দিয়ে লোকে যেমন কুকুরকে ডাকে, পোষাপাখীকে ডাকে, সেই রকম সঙ্কেতে আদর কোরে পামর আমাকে ডাকলে। আমার ইচ্ছা ছিল না তার সঙ্গে আমি আসি, কিন্তু সে যখন অগ্রগামী, তখন আর নিষেধ কোত্তে পাল্লেম না, নিষেধ কোল্লেও সে শুনতো না, কাজে কাজেই তার সঙ্গে আমাকে বেরুতে হোলো। রাস্তায় এসেই পামর আমার ডান হাতখানি তার নিজের বগলের ভিতর কায়দা কোরে আটকে রাখলে; সেই রকমে দুজনে পাশাপাশি হয়ে পদব্রজেই আমরা এক ক্রোশ পথ অতিক্রম কোল্লেম। পথে যেতে যেতে সে একে একে হরেক রকম গল্প তুলেছিল, কিন্তু সে দিকে আমার কাণ ছিল না, কাণ থাকলেও মন ছিল না। মন্দ মন্দ গতি, বাসায় পৌছুতে এক ঘণ্টার বেশী সময় লেগেছিল;—যখন পৌছিলেম, তখন দুই প্রহর বাজতে দশ মিনিট বাকী।

মনে করেছিলাম, বাসায় আমাকে পৌছে দিয়েই পামর ফিরে যাবে; তা কিন্তু গেল না, দ্বার উদ্ঘাটিত হবামাত্র সে আমাকে টেনে নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ীর ভিতর ঢুকে পড়লো।

বারণ করা ভাল হয় না, দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমি তাকে উপর ঘরে নিয়ে গেলেম।

সিল্‌ভিয়া তখনও শয়ন করে নাই, আমার সঙ্গে এক জন অপর পুরুষকে দেখে তার আশ্চর্য্য বোধ হয়েছিল, সে একটু বিরক্তও হয়েছিল; ভাব বুঝতে পেরে আমি তারে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বোলেছিলেম, ইনি আমার বন্ধু লোক, লণ্ডনে নিবাস, বহু দিনের পর দেখা; প্যারিসে বাসা আছে, দৈবযোগে পথে দেখা হওয়াতে ইনি আমাকে সেই বাসায় নিয়ে গিয়েছিলেন, কথায় কথায় সেখানে অনেকটা রাত্রি হয়ে গিয়েছিল, একা আমাকে আসতে দিলেন না, নিজেই সঙ্গে কোরে রাখতে এসেছেন।

কৈফিয়ৎ শুনে সিল্‌ভিয়ার পূর্ব্ব ভাবটা দূরীভূত হলো, তিন জনেই আমরা বৈঠকখানায় বস্‌লেম। দশ মিনিট পরে পামর আবার ক্লান্তি দূর করবার ছলে একটু মদ খেতে চাইলে; বাড়ীতে অতিথি এলে সেবা কত্তে হয়, সেবার জিনিস কোথা থেকে আসে? ভাবতে ভাবতে আমার মনে পড়লো, গত সপ্তাহে কাপ্তেন ফলিসানের জন্য যে একটা ব্রাণ্ডি এসেছিল, তার আধখানা মজুত আছে। আমি নিজেই সেই আধ বোতল ব্রাণ্ডি আর একটী গেলাস তার সম্মুখে ধরে দিলেম। বার বার তিন বার ঢেলে, তৃষ্ণার্থ পামর সবটুকু নিকাশ কোরে ফেল্লে, তার পর গল্প জুড়ে দিলে। সে আমাকে লণ্ডনে নিয়ে যাবে, সিরিলের সঙ্গে দেখা করাবে, উত্তম বাসাবাড়ী স্থির করে দিবে, বাসার সমস্ত বন্দোবস্ত করে দিবে, নিজে সর্ব্বদা এসে তত্ত্বাবধান কোর্ব্বে, সেই রকম গল্প, সিল্‌ভিয়া এক মনে তার

সমস্ত কথা শুনে শুনে, সতৃষ্ণ নয়নে আমার মুখপানে চাইলে। তার সেই দৃষ্টিপাতে আমি বুঝতে পাল্লেম, লণ্ডনে যেতে তার ইচ্ছা আছে।

সে রাত্রে আমাদের যে সকল আহার্য্য সামগ্রী প্রস্তুত ছিল, তিন জনে আমরা সেইগুলি আহার কোল্লেম; রাত্রি আড়াইটে বেজে ছিল, মাতাল পামর তত রাত্রে বাসায় যেতে চাইলে না, স্বতন্ত্র একটি ঘরে তার শয়নের ব্যবস্থা কোরে দেওয়া হলো। রাত্রি প্রভাতে আমার বাসাতেই হাজ্‌রে খানা খেয়ে, আশ্বস্ত পামর নিজের বাসায় চলে গেল। স্থির হয়ে থাক্‌লো, এক সপ্তাহ পরে আমরা লণ্ডনে চলে যাবো।

এক সপ্তাহের মধ্যে আমি আমার বাসাভাড়া পরিশোধ কোরে দিলেম, গাড়ী ঘোড়া বেচে ফেল্লেম, ঘরের জিনিস পত্র কতক কতক নিলামে পাঠালেম, বাসার লোকজনকে জবাব দিলেম; পামরও সেই অবকাশে নিজের বাসা উঠিয়ে আমাদের বাসায় উপস্থিত হলো, সপ্তাহের শেষে আমরা লণ্ডন নগরে যাত্রা কল্লেম। প্রিয় সখি সিল্‌ভিয়া আমার সঙ্গ ছাড়া হোতে চাইলে না, তাকেও আমি সঙ্গে রাখলেম। প্যারিসের সুখ ভোগ ফুরালো, নূতন প্রণয়ের সব সাধ মিট্‌লো, প্যারিসে আসবার পর মনে আমার যে নূতন আশার সঞ্চার হয়েছিল, মনের সেই সকল আশা আমার মনে মনেই বদল হোয়ে গেল।

সপ্তদশ তরঙ্গ।

আমার অধঃপতন।

ভাগ্য সর্ব্বত্র সঙ্গে সঙ্গে থাকে। স্থানের পরিবর্ত্তনে ভাগ্যের পরিবর্ত্তন হয় না। ভুক্তভোগী হয়ে আমি জান্‌তে পেরেছিলেম, ভাগ্যে আমার সুখ নাই। যন্ত্রণা ভোগের জন্যই আমার জন্ম হয়েছিল, সুখভোগের জন্য জন্ম হয় নাই; তাই আমি সর্ব্বদা মনে করি। আমি লণ্ডনে চল্লেম, ভাগ্য আমার সঙ্গে সঙ্গে চল্লো।

টাকায় সুখ হয় না। প্যারিস পরিত্যাগ করে যখন আমি গাড়ীতে উঠি, তখন আমার হাতে যথেষ্ট টাকা—হোরেসের নোটের তাড়া আমার হস্তে ছিল, ডিউক্ ফেশিংটনের প্রায় তিন হাজার গিনি আমি প্রাপ্ত হয়েছিলেম; প্যারিসেও পিমারিও প্রায় পাঁচ হাজার গিনি দিয়েছিলেন, আর যেকটা বিবাহের নামে প্রহসনের খেলা, তাতেও আমার প্রায় দশ হাজার গিনি লাভ হয়েছিল। প্রথম বিবাহে অনেক টাকা আমি যৌতুক পেয়েছিলেম, সে সব ছাড়া বহু মূল্য জহরৎ ছিল। আমি লণ্ডনে চল্লেম, সব আমার সঙ্গে চল্লো।

ঠাঁই ঠাঁই বিশ্রাম করে, ঠাঁই ঠাঁই যানবাহন বদল করে অবশেষে লণ্ডনের সীমাভাগে পৌছিলেম। পামর বলেছিল সীমাভাগ, আমি কিন্তু জানতেম না—সেটা কোন যায়গা। সিল্‌ভিয়াকে আর আমাকে গাড়ীর ভিতর বসিয়ে রেখে, পামর

একবার নেমে গিয়েছিল, কোন দিকে গিয়েছিল, সেটা আমি লক্ষ্য রাখি নাই। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হোয়ে গিয়েছিল। গাড়ীর লণ্ঠ-নের আলোতে আমি দেখেছিলেম, বামদিকে অনেক দূর পর্য্যন্ত নিবিড় অরণ্য; সে সময়ে সেই অরণ্য গভীর নিস্তব্ধ; বিহঙ্গের কলরবও শুনা যাচ্ছিল না। গাড়ীর ভিতর আমরা বোসে থাকলেম, এক একবার বাহির দিকে মুখ বাড়িয়ে দেখি, কেবল সেই বন দেখা যায়; অন্য দিকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হয় না। রাস্তায় আলো ছিল না—সহর যদি হতো, সহরের সীমা যদি হতো, তা'হলে অবশ্যই রাত্রিকালে সব রাস্তায় সরকারি আলো জ্বলতো; রাত্রি প্রায় আটটা হয়েছিল, আমাদের গাড়ীর আলো ভিন্ন রাস্তার কোন দিকে একটাও আলো দৃষ্টিগোচর হলো না; ধারে ধারে লোকালয় থাকলে লোকের বাড়ীর দ্বারে গবাক্ষে আলো দেখা যেতো, তাও দেখতে পেলেম না; বোধ হলো, নিকটে লোকালয় নাই। আমি তখন ভয় পেলেম, মনে মনে তর্ক কল্লেম, এটা তবে কোন যায়গা? সিলভিয়াকে জিজ্ঞাসা কল্লেম,—সিলভিয়া পূর্ব্বে অনেক দিন লণ্ডনে ছিল, আমার কথা শুনে সিলভিয়া বল্লে, এটা সহর নয়, সহরতলীও নয়; গাড়ো-য়ান বোধ হয় পথ ভুলে এই দিকে এসে পোড়েছে।

আধ ঘণ্টার অধিকক্ষণ গাড়ীর ভিতর আমরা বসে আছি, পামর ফিরে এলো না। ক্রমশঃই দেরী হতে লাগ্‌লো, দেরীর সঙ্গে সঙ্গে আমারও আতঙ্ক বৃদ্ধি, আরও আধ ঘণ্টা,—তখনও পামর এলো না। ক্রমে ক্রমে অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে উঠলো। হঠাৎ জন কতক লোক ছুটে এসে আমাদের গাড়ী-খানা উল্টে ফেলে দিলে। গাড়োয়ানকে প্রহার করে এক দিকে

তাড়িয়ে দিলে; ঘোড়া দুটো খুলে দিলে, ঘোড়ারা অন্য দিকে ছুটে পলালো, আমরা চীৎকার করে উঠলেম। কেহই আমাদের সাহায্য কোত্তে এলো না। গাড়ীর চাকা উপর দিকে, আমরা নীচের দিকে। ভয়ে আমরা থর থর কোরে কাঁপছি আর ক্রমাগত চেঁচাচ্ছি;—চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদছি। গাড়ীর লণ্ঠন চূর্ণ হয়ে গিয়েছিল, আলো নিবে গিয়েছিল, চতুর্দ্দিকে ঘোর অন্ধকার! সেই অন্ধকারের ভিতর থেকে কাল সর্পাকার চারখানা হাত গাড়ীর ভিতর;—হাতগুলো আমাদের দুজনকে গাড়ীর ভিতর থেকে টেনে বাহির কল্লে, দুজনের মুখেই কাপড় বেঁধে ফেল্লে; শক্ত শক্ত দড়ি দিয়ে আমাদের দুজনের হাত বেঁধে সেইখানে ফেলে রাখলে, অন্ধকারেই বুঝলেম চার পাঁচ জন লোক আমাদের পাহারায় থাকলো, পাছে আমরা ছুটে পালাই, কিম্বা পালাবার চেষ্টা করি, সেই জন্যই পাহারা। নিশ্চয়ই বুঝতে পাল্লেম, যারা আমাদের ধোরে ছিল, তারা ভয়ঙ্কর ডাকাত, নিকটের সেই জঙ্গলেই তাদের আড্ডা।

আমাদের বেঁধে রেখে, গাড়ীর ভিতর কি কি জিনিস আছে, ডাকাতেরা তাই অন্বেষণ কোত্তে লাগলো; অন্য জিনিস কিছুই ছিল না, কেবল আমার সেই পোটমানটি ছিল। দুটো ডাকাত সেই পোটমানটা বাহির কোরে নিয়ে, এক জনের মাথায় তুলে দিলে; তার পর আমাদের দাঁড় করিয়ে, দুজনের কোমরে লম্বা লম্বা রশি বেঁধে আমাদের চার দিকে ঘিরে, সেই রশি ধোরে টেনে টেনে সেই জঙ্গলের ভিতর নিয়ে চল্লো। বনের ভিতর সুড়ঙ্গ পথ, সেই সুড়ঙ্গ পথে টেনে টেনে আমাদের একটা পাতাল পুরীতে নিয়ে গেল। গোটাকতক ভয়ানক ভয়ানক

শিকারী কুকুর ঘেউ ঘেউ কোরে ডেকে উঠলো। এক জন ডাকাত তাদের ধমক দিলে, আর তারা ডাকলো না।

পাতালের ভিতর মস্ত একখানা বাড়ী। ডাকাতেরা আমাদের সেই বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল। যম দূতের মতন বিকটাস্য জনকতক লোক বড় বড় মশাল জ্বেলে আমাদের দেখতে এলো। কেবল সেই পর্য্যন্ত আমার মনে হয়; তার পর আমরা অজ্ঞান হোয়ে পড়েছিলেম, ডাকাতেরা কি কোরেছিল, কোথায় আমাদের রেখেছিল, সেখানে কি কি কাণ্ড হোয়েছিল, কিছুই আমরা জান্‌তে পারি নাই।

অনেক রাত্রে আমাদের চৈতন্য হোয়েছিল। তখন দেখেছিলেম ছোট একটা কামরা; এক কোণে মিট্ মিট্ কোরে একটা আলো জ্বল্‌ছিল, বিছানা পত্র কিছুই ছিল না, ভিজে স্যাঁৎ সেঁতে মেজেতেই আমরা পোড়েছিলেম। ঘরটা তিন হাত লম্বা, তিন হাত ওসার; পা ছড়িয়ে শয়ন করবার উপায় ছিল না; ঘরের ছাদে কড়ি কাঠ ছিল না, খিলান করা; দাঁড়াবার চেষ্টা কোল্লে খিলানটা মাথায় ঠেকে। বনের ধারে ডাকাতেরা আমাদের মুখ বেঁধেছিল, হাত বেঁধেছিল কিন্তু যখনকার কথা বোল্‌ছি, তখন সে সকল বাঁধন ছিল না; আপনাদের কায়দায় নিয়ে গিয়ে, ডাকাতেরা আমাদের বাঁধন খুলে দিয়েছিল।

ঘরের কোন দিকে একটীও জানালা ছিল না; কেবল একটা কম চওড়া লোহার দরজা। কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে উঠে সেই দরজার কাছে আমি গেলেম, গায়ে যত জোর ছিল, সব জোর একত্র কোরে অনেকক্ষণ সেই লোহার দরজা

টানাটানি কোল্লেম, তুর্জ্জয় কপাট একটু কাঁপলোও না; ক্লান্ত হোয়ে ফিরে গিয়ে সিল্‌ভিয়ার পাশে আমি বোসলেম, তখন আমার মনের ভিতর যে কি রকম আতঙ্ক, যাঁদের অনুভব শক্তি আছে, কিম্বা যাঁরা কখনও সেই রকম বিপদে পোড়েছেন, তাঁরাই তা বুঝ্‌তে পার্‌বেন। ভাবতে লাগলেম, এইবারেই প্রাণ গেল! এই রকমে মরাই হয়তো আমার ভাগ্যলিপি! আবার ভাবলেম, প্রাণে হয় তো মারবে না, আরো হয়তো কি কু-মতলব আছে। প্রাণে মারা যদি অভিপ্রায় হোতো, তবে আমরা যতক্ষণ অচেতন ছিলেম, ততক্ষণের মধ্যেই নিকাশ কোরে ফেল্‌তো। প্রাণে হয়তো মারবে না। তবে তাদের অভিপ্রায় কি? ডাকাতেরা টাকার লোভে মানুষ ধরে, টাকাতো তারা লুটে নিয়েছে, তবে আমাদের ছেড়ে দিলেনা কেন? আর তবে তাদের কি মতলব?

ভাবছি, এমন সময় ক্যাঁ কোঁ—ক্যাঁ কোঁ, ঘর্ঘরশব্দে সেই লৌহকপাট ঘুরে এলো, একটা লোক প্রবেশ কোল্লে; এক হস্তে একটা মশাল, অন্য হস্তে একখানা সানক। দরজাটা ঠেলে ঠেলে বন্ধ কোরে দিয়ে, লোকটা যখন সেই সানকখানা আমার সম্মুখে রাখলে, তখন দেখলেম, সানকের উপর একখানা আধপোড়া পাউরুটি আর ছোট এক ভাঁড় জল। খাব কি, লোকটাকে দেখেই আমার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল। খুব খর্ব্বাকৃতি, প্রকাণ্ড মোটা, বুকখানা প্রায় তুই হাত চওড়া, ঘাড়েগর্দ্দানে এক সমান, মুখখানা যেন চাকার মতন, চোক তুটো যেন ভাঁটার মতন, নাকটা যেন সিংহীর মতন, দাঁতগুলো যেন কুমীরের দাঁতের মতন, মাথাটা খুব ছোট, তাতে

একগাছাও চুল ছিল না। সেই লোক আমাদের কাছে বোসে, বড় বড় দাঁত বাহির কোরে, জোরে জোরে বোল্‌তে লাগলো, খা তোরা খা, জল রুটি খা; তোদের কোন ভয় নাই; আমাদের সর্দ্দার আজ সহরে বেরিয়েছেন, রাত্রেই ফিরে আসবেন, তোদের রূপ দেখে মোহিত হোয়ে যাবেন, একজনকে তিনি নিজে বিয়ে কোরবেন, আর একজনকে আমি চেয়ে নেবো। তোকেই তিনি বিয়ে কোরবেন, আর ঐ ছুঁড়ীটাকে আমি দখল কোর্ব্বো। খা তোরা। আমার কথায় যদি রাজী থাকিস্ তা হোলে এই রাত্রে আরও ভাল ভাল খাবার জিনিস এনে যোগাবো। মদ আন্‌বো, মাংস আন্‌বো, ভাল ভাল রুটিও আন্‌বো, কি বলিস্?

ভয়ে, ঘৃণায়, ক্রোধে আমি তখন যেন হতবুদ্ধি হোয়েছিলেম, তথাপি মনে একটু সাহস এনে, লোকটাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, তুমি কি আমাদের কাছে সত্য কথা বোল্‌বে? দোহাই ধর্ম্ম, ব্যগ্রতা কোরে মিনতি করি, সত্য কোরে বল,—অবশ্যই তুমি জান,—গাড়ীতে আমাদের সঙ্গে যে লোকটি ছিল, সে লোকটি কোথায় গেল?

ডাকাতটা গর্জ্জন কোরে বোল্লে, কোথায় গেল, আমি তা কি জানি? যাদের লোক, যাদের খবোর, তারাই তা জানবে, আমি তা কি কোরে জানবো? যে কথা বোল্লেম, তাতে যদি তুই রাজী থাকিস্, সর্দ্দারকে যদি ভজনা করিস্, আমাকে যদি পছন্দ করিস্, তবেই তোদের রক্ষা, তা না হোলে সর্দ্দারের হুকুমে এই রাত্রেই তোদের আমি কেটে ফেল্‌বো।

প্রাণভয়ে কাঁপতে কাঁপতে আমি মাথা হেঁট কোল্লেম। মনে হোতে লাগলো, সেই পামরটারি এই কাজ; ডাকাতের দলে খবর দেবার জন্যই সেই পামরটা সন্ধ্যার পর গাড়ী থেকে নেমে এসেছিল। পামরটা প্রকৃতই পামর! সেই ধূর্ত্ত পাষণ্ডটাই হয়তো এই ডাকাতের দলের সর্দ্দার!

আমার মনের ভিতর ঐ রকম অনুমান আসছিল, ঠিক সেই সময় আর একটা লোক গুড়ি মেরে মেরে আমাদের কয়েদ ঘরে প্রবেশ কোল্লে; এক হাতে একটা পিস্তল, এক হাতে একখানা তলোয়ার। মুখখানা ভাল কোরে দেখতে পেলেম না, বোধ হোয়েছিল মুখোসপরা। পোষাকটা কিন্তু খুব জাঁকালো; ঠিক যেন যোদ্ধাদলের সেনাপতি। যে লোকটা আগে এসেছিল, তাকে সম্বোধন কোরে, ঘোংরা ঘোংরা আওয়াজে সেই নূতন লোকটা জিজ্ঞাসা কোল্লে, কেমন রে ব্যাট্‌কিলার! এরা বলে কি? রাজী আছে?

ব্যাট্‌কিলার উত্তর কোল্লে, রাজী না হোয়ে যাবে কোথা!—সব কথা আমি বোলেছি। রাজী না হোলে কেটে ফেল্‌বো, সে কথা বোলতেও বাকি রাখিনি। ঐ রকম উত্তর দিয়ে, আমার মুখের দিকে চেয়ে হ্যাড়া মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বড় বড় দাঁত বাহির কোরে, ব্যাটকিলার আমাকে বোল্‌তে লাগলো বুঝেছিস্?—ইনিই আমাদের সর্দ্দার। দেখেছিস, কেমন রূপ! দেখেছিস্ কেমন দামি দামি জহোর, কেমন চমৎকার পোষাক! কোন দেশের রাজারাও এমন সুন্দর হয় না; এমন পোষাক চক্ষেও দেখতে পায় না। তোর কপাল ভাল, তুই এই রাজার পাটরাণী হবি। ইনি এ অঞ্চলের একজন প্রতাপশালী লর্ড।

বয়স খুব কম—বয়স খুব কম,—দেখতেই তো পাচ্ছিস্, বড় জোর উনিশ কি কুড়ি। এখনও বোলছি রাজী হ!—কেন মিছে বেঘোরে প্রাণ খোয়াবি, আমার কথায় রাজী হ! বড় রাজার বড় রাণী হোয়ে চিরকাল সুখে কাটাবি।

এই সময় সিলভিয়া অলক্ষিতে একবার আমার দিকে চক্ষু ঘুরালে; আমি তৎক্ষণাৎ তার মনের ভাব বুঝতে পারলেম। মাথা তুল্লেম না, অধোবদনেই মৃদু কম্পিতস্বরে র‍্যাটকিলারকে বোলছিলেম, ফরাসি রাজ্য থেকে আমরা এসেছি, যে লোকটি আমাদের সঙ্গে এসেছিল, তাকে যদি তোমরা খুঁজে খুঁজে বাহির কোত্তে পার, তা হোলে—

সবে মাত্র আমি ঐ রকম ভূমিকা আরম্ভ কোরেছি, সেই সময় হঠাৎ এককালে অনেকগুলো কুকুরের বিকট ঘেউ ঘেউ রব; বাহির দিকে বহু লোকের পদশব্দ,—পদ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে যেন বহু শৃঙ্খলের ঝম্ ঝম্ শব্দ। সভয়ে আমি মনে কোল্লেম, আড্ডার সব ডাকাত বুঝি একসঙ্গে সেজে গুজে এই দিকে আস্‌ছে! তা নয়,—পাঁচ জন অস্ত্রধারী পুলিসের লোক দ্রুতপদে সেই গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লে। আরও অনেক লোক ঘরের বাহিরে কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো। যে পাঁচ জন প্রবেশ কোরেছিল, তাদের মধ্যে যে ব্যক্তি প্রধান, সেই ব্যক্তি ক্ষিপ্রহস্তে সেই গুড়িমারা লোকটার মুখের মুখোসটা একটানে ছিঁড়ে ফেলে দিলে;—প্রকাশ পেলে মিষ্টার পামর। চক্ষের নিমিষে পামরের আর র‍্যাটকিলারের হাতে হাত-কড়ি পড়লো;—ছাড়া ছাড়া নয়, উভয়েরই চারিখানা হাত এক

সঙ্গে বাঁধা ;—কটিদেশে লৌহ শৃঙ্খল ; পায়ের বেড়ির সঙ্গে সেই শৃঙ্খল বাঁধা।

যা আমি অনুমান কোরেছিলেম, তাই ঠিক। সেই পামরটাই ডাকাতের সর্দ্দার। ক্রমে ক্রমে প্রকাশ পেলে, সুড়ঙ্গের ভিতর যতগুলো ডাকাত ছিল, সকলেই বাঁধা পোড়েছে ; ঘরে ঘরে—গহ্বরে গহ্বরে খানাতলাসি হোচ্ছে। আমি ভাবছিলেম, পুলিস অকস্মাৎ সেখানে কেমন কোরে এলো ! পুলিসের মুখেই আমার মনের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল। সেই আড্ডার ডাকাতেরা বৎসরাবধি সেই জঙ্গলে আড্ডা কোরে আছে, লোকের বাড়ীতে ডাকাতি করে না, যায়গায় যায়গায় তাদের গুপ্তচর ফেরে, টাকাওয়ালা পথিক লোকের সন্ধান পেলেই আড্ডায় এসে খবর দেয়, ডাকাতেরা সেই সকল লোককে গ্রেপ্তার কোরে যথাসর্ব্বস্ব লুটপাট করে, প্রকাশ হবার ভয়ে বন্দী লোকগুলিকে প্রাণে মেরে বনের ভিতর পুঁতে রাখে, কতক কতক মৃতদেহ নদীর জলে ফেলে দেয়। পুলিস এ সকল বৃত্তান্ত অবগত হোয়েছিল, কিন্তু ধোত্তে পারেনি। সুড়ঙ্গের মুখে পাথর চাপা থাকতো, পাথরের উপর লতাপাতা ঢাকা থাকতো, পুলিসের লোকে গুপ্ত আড্ডার পথটা জানতে পারতো না ; ডাকাতেরাও সর্ব্বদা দল বেঁধে সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ কত্তো না, নিশাকালে বনের নানা দিক দিয়ে এক একজন উপস্থিত হোতো। যে রাত্রের কথা বলছি, সেই রাত্রে পামর যখন সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে, তখন নূতন আহ্লাদে কিম্বা হয়তো মদের ঝোঁকে সুড়ঙ্গের মুখটা বন্ধ কোরে আসতে ভুলেছিল ; ভিতর থেকে বন্ধ করবার কৌশল ছিল, পামরের ভুল অবশ্যই

পুলিসের পক্ষে সুবিধার হেতু হোয়েছিল। জঙ্গলের সীমায় ডাকাতেরা যখন আমাদের গাড়ী উল্টে ফেলে, আমাদের বেঁধে আনে, নিশ্চয়ই সেই সময় পুলিসের গোয়েন্দা সেইখানে গা ঢাকা হোয়ে লুকিয়েছিল, থানায় খবর দিয়েছিল, তাতেই আমাদের উদ্ধার, তাতেই ডাকাতেরা গ্রেপ্তার।

চোরামাল কোথায় কোথায় ছিল, পুলিস সে সকল গুপ্ত-স্থান ঠিক কোত্তে পারেনি, মালামাল কিছুই বাহির হয়নি, আমার পোটমান্‌টিও তারা কোথায় লুকিয়ে ফেলেছিল, তারও কোন কিনারা হয়নি; ভাগ্যে আমাদের প্রাণরক্ষা হোয়েছিল, সেইটিই পরম লাভ।

সমস্ত ডাকাত, সমস্ত কুকুর, সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, গোটাকতক ঘোড়া, আড্ডার মধ্যে যা যা ছিল, রাত্রিকালেই পুলিসের থানায় সমস্ত চালান হোয়ে গেল, আমাদের দুজনকেই থানায় যেতে হোলো। আমরা ঠিক ঠিক এজাহার দিয়েছিলেম, সাক্ষীর খাতায় আমাদের নাম উঠেছিল, বিচারের সময় আদালতে হাজির হোয়ে জবানবন্দি দিতে হবে, কোন্ বাড়ীতে আমরা থাক্‌বো, থানায় সেই ঠিকানাটী ইতিমধ্যে লিখে পাঠাতে হবে, এই রকম একটা অঙ্গীকারে একখানা একরার লিখে, পুলিসের কর্ত্তা আমাদের দস্তখত করিয়ে নিলে। যতটুকু রাত্রি ছিল, থানা বাড়ীতেই আমরা বাস কোল্লেম, পুলিসের লোকেরা আমাদের আহারের ও শয়নের উত্তম ব্যবস্থা কোরে দিয়েছিল। প্রভাতে আমরা খালাস পেলেম। পুলিসের একজন লোক আমাদের সঙ্গে এসে রাজধানীতে পৌঁছে দিয়ে গেল।

পৌঁছিলেম তো সহরে, কিন্তু থাকি কোথায় প্রাণরক্ষা হোয়েছিল, কিন্তু সম্বলগুলি সমস্তই হারিয়েছিলেম; গহনাগুলি পর্য্যন্ত আমার অঙ্গে ছিল না, পরিধানের দ্বিতীয় বস্ত্রও সঙ্গে ছিল না, একেবারে নিঃসম্বল। কি করি, কোথায় যাই, মৃদুপদে চল্‌তে চল্‌তে কেবল সেই ভাবনাই ভাবতে লাগ্‌লেম। ভিখারী হোতে পার্ব্বো না, ভিখারী হোলেও ভিক্ষা পাব না, লণ্ডনের টাঁকাওয়ালা লোকেরা ভিখারীকে ভিক্ষা দেয় না, গরীবের প্রতি তাদের দয়া হয় না, রাস্তায় যদি উপবাসী লোকের জীর্ণশীর্ণ বিবস্ত্র দেহ তাদের নজরে পড়ে, ঘৃণায় তারা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যায়; বড় বড় চৌঘুড়ীতে যারা রাস্তা কাঁপিয়ে বেড়ায়, গরীব লোক দেখ্‌লে তারা সেদিকে ফিরেও চায় না; আরো বরং জোরে জোরে গাড়ী হাঁকিয়ে সেদিক থেকে তখনি তখনি সরে যায়; আরো শুনেছি, এক একজন দাম্ভিক বড়লোক নাকি গাড়ীর কাছে গরীব লোক দেখ্‌লে সপাসপ্ চাবুক লাগায়! সে অবস্থায় লণ্ডনের বড় লোকের কাছে যে আমরা কোন রকম সাহায্য পাবো, সে আশা—সে দুরাশা, মনেও জায়গা দিলেম না; ম্লান বদনে ধীরে ধীরে লণ্ডনের বড় বড় রাজপথ অতিবাহন কোত্তে লাগ্‌লেম।

যেখানে মানুষে সাহায্য করে না, গরীবের প্রতি সেখানে দয়াময় পরমেশ্বরের কৃপা হয়; একটা না একটা উপায় তিনি জুটিয়ে দেন; দয়াময়ের কৃপায় কোন না কোন লোকের সুমতি উপস্থিত হয়। আমরা তখন সেই কৃপানয় পরমেশ্বরের কৃপা-লাভ কোর্‌লেম।

আমরা চলেছি,—রাস্তার ধারে ধারেই চলেছি;—রাস্তা দিয়ে কত লোক চোলে যাচ্ছে, কেহই আমাদের দিকে চেয়েও দেখ্‌ছে না। আমাদের পোষাকের চটোক্ ছিল না, ফুলের সাজের বাহার ছিল না, ঠোঁটে গালে রংমাখা ছিল না, বেশ বিন্যাসের পারিপাট্য ছিল না, কেনই বা আমাদের দিকে সৌখিন লোকের নজর পোড়্‌বে? আমরা যাচ্ছি,—সমস্ত দিনই যাচ্ছি,—বেলাও প্রায় শেষ হোয়ে এসেছে;—ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অতিশয় কাতর হোয়ে পোড়েছি; পা আর চলে না; রাস্তার ধারের একখানা পাথরের উপর দুজনে বোসে পোড়লেম। বোসেই আছি, ভাবনা তরঙ্গের গণনা হয় না, বোসেই আছি, এমন সময় দেখি, একটি ভদ্রলোক ছড়ি দিয়ে জুতা ঠুক্‌তে ঠুক্‌তে মন্থর গতিতে সেই দিকে চোলে আস্‌ছেন; পশ্চাতে একজন আর্দ্দালী। যে ফুটপাথে আমরা বোসেছিলেম, সেই ফুটপাথেই তাঁরা। দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেই ভদ্রলোকটি ঠিক্ আমাদের নিকটে এসেই একটু থোম্‌কে দাঁড়ালেন।

সলজ্জ সতৃষ্ণনয়নে আমি সেই ভদ্রলোকটির মুখের দিকে চাইলেম। খানিকক্ষণ দেখে দেখে তাঁকে আমি একটু একটু চিন্তে পারলেম; তিনিও বোধ হয় আমাকে চিন্তে পেরে-ছিলেন; কেমন কোরে পেরেছিলেন, সে কথা একটু পরেই বোল্‌ছি। খানিকক্ষণ আমার মুখপানে চেয়ে চেয়ে হঠাৎ তিনি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, মিশেস্ হোরেশ! এতদিন তুমি কোথায় ছিলে?

চোম্‌কে উঠে, মৃদুকণ্ঠে আমি বোল্লেম, ক্ষমা করুন, ও

নামে আমাকে সম্ভাষণ কোরবেন না;—হোরেশের সঙ্গে আমার বিবাহ হয় নাই।

আমার মতন মৃদুস্বরে তিনি তখন বোলেছিলেন, 'ওঃ! হোরেশটা তবে মিথ্যাবাদী ছিল! তার মুখে শুনেছিলেম, তুমি তার বিবাহিতা স্ত্রী। যাক্ সে কথা,—তোমরা এমন কোরে রাস্তায় বোসে রয়েছ কেন?

আমি উত্তর কোরেছিলেম, বেশী কথা বলবার শক্তি নাই। একটি ভদ্রলোক আমাকে ফ্রান্সে নিয়ে গিয়েছিলেন, গত কল্য আমরা লণ্ডনে এসেছি, রাত্রে আমাদের ডাকাতে ধোরেছিল, ঈশ্বরের করুণায় নিস্তার পেয়ে এসেছি। দুই দিন উপবাস!

সেই কথা শুনে ভদ্রলোকটি কাতর হোলেন, মনে মনে কি একটু ভেবে, আর্দ্দালীকে একখানা গাড়ী ডাকৃতে বোল্লেন; আর্দ্দালী গেল, আমাকে তিনি বোল্লেন, কোন ভাবনা কোরো না, আমার একখানি স্বতন্ত্র বাড়ী আছে, সেই বাড়ীতেই তোমাকে আমি নিয়ে যাচ্ছি, যতদিন ইচ্ছা, সেই খানেই তুমি থাকতে পার্ব্বে; সমস্ত খরচ আমি দিব, কোন কষ্ট হবে না।

গাড়ী এলো, ভদ্রলোকটি আমাদের দুজনকে সেই গাড়ীতে তুলে দিয়ে, নিজেও আরোহণ কোল্লেন; আর্দ্দালী কোচ্‌বাক্সে বোস্‌লো। আধ ঘণ্টার মধ্যে একখানি বাড়ীর সম্মুখে গাড়ী পৌঁছিল, আমরা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম; দেউড়িতে একজন দরোয়ান ছিল, ভদ্রলোকটি চুপি চুপি তারে কি হুকুম দিয়ে, আমার দিকে একবার চাইলেন। দরোয়ান বেরিয়ে গেল, আর্দ্দালী সেইখানে বোসে থাকলো; আমরা

তিনজনে উপরে গিয়ে উঠ্‌লেম। বাড়ীখানি খুব বড় নয়, কিন্তু বেশ কেতা দুরস্ত। সারি সারি চারিখানি ঘর, ভিতর দিকে টানা বারাণ্ডা; রেলের ধারে ধারে টিনের টবে টবে গুটিকতক ফুলগাছ। সিঁড়ির মাথার উপর চীনের মাটিতে গড়া দুটি পরী,—পরীদের হাতে দুটি দুটি লণ্ঠন; শোভা অতি সুন্দর।

সেই দরোয়ান ছাড়া বাড়ীতে আর কোন লোক জন ছিল না, বোধ হোলো খালি বাড়ী, কিন্তু ঘরগুলি বেশ সাজানো। একটি ঘরে গিয়ে আমরা বোস্‌লেম। একটু পরে একটা বাক্স মাথায় কোরে একটা লোক এলো; বুঝ্‌তে পারলেম, হোটেলের মুটে। লোকটা চলে যাবার পর, ভদ্রলোকটি সেই বাক্স খুলে অনেক রকম খাবার জিনিস বাহির কোরে একটা টেবিলের উপর সাজালেন, জিনিসের সঙ্গে দুটি মদের বোতল। ঘরে জিনিস পত্রের অভাব ছিল না, যা যা আবশ্যক, সমস্তই প্রস্তুত। আমরা টেবিলে গিয়ে বোস্‌লেম, অত্যন্ত ক্ষুধা হোয়েছিল, পরিতোষরূপে ভোজন কোল্লেম। সুরাপানের অনুরোধ হোয়েছিল; সে অভ্যাস আমি ত্যাগ কোরেছি, এই কথা বোলে ক্ষমা চেয়ে সে দায়টা আমি এড়ালেম।

ভদ্রলোকটির পরিচয় এইখানে বলি। হোরেশের বাড়ীতে যখন আমি থাকৃতেম, তখন সেই বাড়ীতে যে সকল বন্ধুবান্ধবের যাওয়া আসা হোতো, সেই ভদ্রলোকটি তাঁদেরি মধ্যে একজন। তিনি আমার হাতে একখানি কার্ড দিয়েছিলেন, পোড়ে দেখলেম, তাঁর নাম লর্ড র‍্যাম্‌পার্ট; দিব্য অমায়িক, দিব্য মিষ্টভাষী, দিব্য সুরসিক।

সন্ধ্যা হোয়ে গেল, আর্দ্দালী একবার উপরে এসে দুটি তিনটি বাতী জ্বেলে দিলে, যে রকম যে রকম হুকুম হোলো, সেই সকল হুকুম তামিল করবার জন্য আর্দ্দালী আবার নেমে গেল। বিশেষ পরিচয়ে জান্তে পারলেম, সেই আর্দ্দালিটি লর্ড র‍্যাম্‌পার্টের প্রধান ভ্যালে।

রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত লর্ড র‍্যাম্‌পার্ট আমাদের কাছেই থাক্‌লেন, সিল্‌ভিয়ার পরিচয় পেলেন, সিল্‌ভিয়ার শিষ্টাচারে যথেষ্ট সন্তোষ প্রকাশ কোরলেন। রাত্রেও কিছু কিছু আহার করা হোয়েছিল, লর্ড স্বয়ং তিন গেলাস স্যাম্পীন খেয়েছিলেন, সিল্‌ভিয়াকেও প্রদান কোরেছিলেন, সিল্‌ভিয়া কেবল ভদ্রতার খাতিরে এক এক চুমুক পান কোরেছিল, আরো এক ঘণ্টা থেকে, পাঁচ রকম গল্প কোরে, আমাদের শয়নের ব্যবস্থা কোরে দিয়ে কল্য প্রাতঃকালেই আসবো বোলে, লর্ড বাহাদুর বিদায় গ্রহণ কোরলেন। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র শয্যায় আমরা উভয়ে শয়ন কোরলেম।

পরদিন বেলা দশটার সময় লর্ড বাহাদুর দর্শন দিলেন। সঙ্গে অনেকগুলি লোক। তিনজন মুটে, আর বাকি লোক-গুলি বাসা বাড়ীর কাজকর্ম্ম করবার জন্য নিযুক্ত। মুটেরা তিনটি বাক্স এনেছিল। একটিতে উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী, আর দুটিতে বস্ত্রালঙ্কার। আমার ও সিল্‌ভিয়ার তিন তিন সুট নূতন পোষাক, আবশ্যক মত জহরত, দুটি রেশমী ছাতা, পাঁচ জোড়া জুতা, একটি ঘড়ী, আর গুটিকতক খেলবার পুতুল।

খানসামা, বাবুর্চ্চি, ঝাড়ুদার, বাজার সরকার, পত্রবাহক

পেয়াদা, সমস্তই বাহাল হোলো; অভাব থাকলো পরিচারিকার। লর্ড বাহাদুর বল্লেন, বৈকালে তাদের আনা যাবে। আপাততঃ যারা উপস্থিত থাকলো, আমার হুকুম মতে তারা সকল কাজ কোর্ব্বে, লর্ড বাহাদুরের সেইরূপ আদেশ। আমি তখন অনেকগুলি লোকের মনিব হোলেম।

লোকাভাবে বেলা দশটার পূর্ব্বে আমাদের হাজ্‌রেখানা প্রস্তুত হয় নাই, দশটার পর প্রস্তুত হোলো। লর্ড র‍্যামপার্ট আমাদের সঙ্গে সেই বাড়ীতেই হাজরে খেলেন; এক ঘণ্টা থেকে তিনি চোলে গেলেন। বৈকালে আর এলেন না, একেবারে রাত্রি আট্‌টার সময় উপস্থিত হোলেন। রাত্রি প্রায় বারটা পর্য্যন্ত বিশুদ্ধ আনন্দ।

এই রকম দশ দিন। সেই দশ দিন পরে এক রাত্রে লর্ড আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, হোরেস তো নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কোরেছে, পৃথিবী থেকে চোলে গেছে; এখন কি তুমি একাকিনীই থাকবে?—স্ত্রীলোকের একাকিনী থাকা ভাল নয়; একজন অভিভাবক থাকা বড় দরকার। সকল কথাই তো তোমার মুখে শুনেছি, কিছুই আমার বুঝতে বাকি নাই। লণ্ডনে তুমি একটি বিবাহ করো। তোমার এই সখিটিও দেখছি কুমারি, ইটির জন্যও একটি সুপাত্র সন্ধান করা যাক্। কি বলো?

আমি কোন উত্তর কোল্লেম না। এই খানে বোলে রাখি, প্রথম দিন বৈকালে লর্ড র‍্যাম্‌পার্টকে যখন আমি রাস্তায় দেখেছিলেম, তখন তাঁর কৃষ্ণবসন পরিধান; আজিও সেই রকম কৃষ্ণবসনে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত; গলাবন্ধটি পর্য্যন্ত, হাতের

দস্তানাটি পর্য্যন্ত সমস্তই কৃষ্ণবর্ণ। আমাকে নিরুত্তর দেখে, কৃষ্ণবাসমণ্ডিত লর্ড বাহাদুর একটু সঙ্কোচিতভাবে বোলেছিলেন, সম্প্রতি আমার সংসারে দুটি দুর্ঘটনা হোয়েছে;—আমার স্ত্রীবিয়োগ আর পিতৃবিয়োগ। এক বৎসর আমাকে শোক-চিহ্ন ধারণ কোরে থাকতে হবে। তা যদি না হোতো, তা হোলে—,

কথা শুন্‌তে শুন্‌তে চমকিত হোয়ে, চমকিত নয়নে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে, তৎক্ষণাৎ আমি চমকিতস্বরে জিজ্ঞাসা কোরেছিলেম, তা হোলে কি হোতো?

লর্ড। তা হোলে—তুমি যদি কোন দোষ বিবেচনা না করো, তা হোলে আমিই তোমাকে বিবাহ করবার প্রস্তাব কোত্তেম।

আমি। বিবাহ আমার অনেক হোয়ে গিয়েছে, বিবাহের সুখ আমার যথেষ্ট ভোগ হোয়েছে, আর আমার বিবাহের সুখে দরকার নাই।

লর্ড। আচ্ছা, যদি দরকার নাই, বিবাহ যদি না কোত্তে চাও, তবে আমার বিলাস-লক্ষ্মী হোয়ে মনের সুখে কাল কাটাও। তোমার সহচরির জন্য আমি একটি পছন্দ সই যুবা নাগর যোগাড় কোরে দিব।

আমি। আপনি মহৎ লোক, আমি দুঃখিনী; আমাকে ও রকম কথা বলা আপনার মতন লোকের উচিত হয় না।

লর্ড। বেশ উচিত হয়। তোমার রূপসাগরে যৌবন-তরঙ্গ ঢল ঢল কোরছে, এমন যৌবনে ভোগবিলাসে বিরত

থাক্‌লে মন কথনই ভাল থাকবে না, মন ভাল না থাকলে শরীরও মাটি হোয়ে যাবে।

আমি। মাটির শরীর মাটি হোয়ে যাবে, সেটা আর আশ্চর্য্য কি? সংসারের সকলকেই মাটী হোতে হয়।

লর্ড। সে সব চরম কালের কথা এ সময় উত্থাপন করা পাগলামী মাত্র। মাটি হোতে হবে, সর্ব্বদা যদি সে কথাটা মনে রাখা যায়, তা হোলে সংসার চলে না, সংসার থাকে না, আমোদ প্রমোদের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হোয়ে যায়। তুমি দুঃখিনী, আচ্ছা, দুঃখিনীকে আমি রাজরাণী—

প্রথম রাত্রে যে আর্দ্দালী এসেছিল, চঞ্চলপদে সেই আর্দ্দালী গৃহমধ্যে প্রবেশ কোরে, লর্ডের হাতে একখানা চিঠি দিলে। চিঠিখানা পাঠ কোরেই লর্ড বাহাদুর সহসা আসন থেকে উঠে বিষণ্ণবদনে আমাকে বোল্লেন, বড় জরুরী চিঠি; এখনি আমাকে যেতে হোচ্ছে; আর এক সময়ে সংসারের কথা তোমাকে আমি বুঝাবো। ত্বরিতস্বরে এই কটি কথা বোলেই আর্দ্দালীর সঙ্গে তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন।

আমি সেই সময় হেসেছিলেম। লর্ড র্যাম্‌পার্টের পিতৃ-বিয়োগ হোয়েছে, সেই জন্যই তিনি কৃষ্ণবসন পরিধান করেন। আমাদের দেশে শোক প্রকাশের প্রধান চিহ্ন কৃষ্ণবসন;—কৃষ্ণবসনের নাম শোকবসন। মাতৃ-পিতৃ-বিয়োগে পুত্রকন্যাগণের সুখস্বচ্ছন্দে আহার বিহারাদি সমস্ত কার্য্যই চলে, মদ্য-মাংসের ও কন্দর্প-সেবার মাত্রাটা বরং বাড়াবাড়ি হয়; যতটা শোক কেবল কৃষ্ণবর্ণ বসনের ভিতর ঢাকা থাকে। ঢাকা থাকে

কি ভাসতে থাকে, যাঁদের শোক, তাঁরাই সে কথা বোল্‌তে পারেন; আমি তো কিছুই বুঝ্‌তে পারি না।

সেই রাত্রের পর পাঁচ দিন আর আমি লর্ড র‍্যামপার্টকে দেখতে পেলেম না। তারপর তিনি নিত্য নিত্য আসতে আরম্ভ কোল্লেন; নিত্য নিত্য আমাকে সংসার-তত্ব, প্রণয়-তত্ত্ব, যৌবন-তত্ব আর ভোগবিলাসের অন্তঃরস্থ তত্ব এক এক কোরে বুঝাতে লাগলেন। আমার খরচের জন্য মাসে মাসে হাজার গিনি প্রদান করবার অঙ্গীকার কোল্লেন, রাণীরা যে রকম বসন ভূষণ ব্যবহার করেন, আমাকে সেই রকম বসন ভূষণে সাজাইবেন বোল্লেন, আরো যে কত রকমের কত কথা, সব এখন আমার মনে নাই।

আবার আমি প্রলোভনের দাসী হোলেম। পণ্ডিতেরা বলেন, নারী জাতি মোমের পুতুল, পুরুষ জাতি জ্বলন্ত অগ্নি, উভয়ে এক সঙ্গে থাকলে মোমের পুতুল শীঘ্র শীঘ্র দ্রব হয়। সেটা বড় পাকা কথা। আমার মন দ্রব হোয়ে গেল, তিন মাস পরে আমি লর্ড র‍্যামপার্টের কুৎসিত অভিলাষের বশবর্ত্তিনী হোয়ে পোড়লেম। টাকা, গহনা, ভাল ভাল বস্ত্র এবং বিবিধ বিলাস সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে আমার অধিকারে আসতে লাগলো। মাসে মাসে হাজার গিনি দিবার অঙ্গীকার ছিল, ক্রমে ক্রমে চার পাঁচ গুণ ছাপিয়ে উঠলো। বাড়ীর সংলগ্ন আস্তাবলে আমার জন্য দুখানা গাড়ী আর পাঁচ সাতটা ঘোড়া মজুত থাকলো। লর্ড বাহাদুর আমাকে যেন প্রাণ অপেক্ষাও বেশী ভাল বাসতে লাগলেন। বুঝেও আমি বুঝি না; কতবার আমি ঠকেছি, তথাপি আমার জ্ঞান জন্মে নাই।

পিতৃশোকের অবসান হোলে তিনি আমাকে গির্জ্জায় নিয়ে ব্যবস্থামত বিবাহ কোর্ব্বেন সেই রকম আশ্বাস দিয়ে রাখলেন! আশ্বাসে ভুলে পূর্ব্ব সংকল্প আমি পরিত্যাগ কোল্লেম। লর্ড র‍্যামপার্ট আবার আমাকে মদের হ্রদে ডুবালেন। রোজ রোজ কেবল স্যাম্পীন—কেবল স্যাম্পীন—কেবল স্যাম্পীন!

এইখানে আমার অধঃপতন! না না,—অনেক দিন পূর্ব্বেই আমার অধঃপতন হোয়েছিল। হোরেস যখন আমাকে লণ্ডনে আনে, তখনি আমার অধঃপতনের সূত্রপাত। তবে কিনা, বার তের বৎসর কিছু কিছু আশা ছিল, এইবার পূর্ণ নিরাশা! এইবার সেই অধঃপতনটা খুব পাকাপাকি! কত বন্ধুবান্ধব আসেন, সধবা বিধবা কত রকম রঙ্গিণী আসেন, দুটি পাঁচটি কুমারিও আসেন, তাঁদের সঙ্গে বেহায়া হোয়ে আমি কত রকম খেলা করি, এখন সে সকল কথা মনে হোলেও লজ্জা হয়।

এক বৎসর অতীত। লর্ড র‍্যামপার্টের আদর যত্ন সমভাব। দিন দিন বরং বেশী বেশী। নিতান্ত দুঃসময়ে তিনি আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন, ঘোর বিপদে তিনি আমার আশ্রয়দাতা, সুতরাং তাকেও আমি ভালবাস্‌তে শিখ্‌লেম। হায় হায়! ভালবাসা কিন্তু বেশীদিন দেখাতে পাল্লেম না। যে বৎসরের কথা বোল্‌ছি, সেই বৎসর খ্রীষ্টম্যাস পর্ব্ব দিবসে লর্ড র‍্যামপার্ট হঠাৎ ঘোড়া থেকে পোড়ে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হোলেন। আবার আমি সহায়শূন্য হোলেম। বাড়ীখানি তিনি আমার নামে লিখে দিয়েছিলেন, আশ্রয়শূন্য হোলেম না; বাড়ীখানি আমার নিজেরি থাক্‌লো। টাকার অভাব হয় নাই, সুতরাং

দাস-দাসীগণকে জবাব দিলেম না, কেবল ফাজিল লোক কিছু কমিয়ে দিলেম।

মাঝখানের একটা কথা আমি ছেড়ে গিয়েছি। লর্ড র‍্যামপার্টের বাড়ীতে আশ্রয় পাবার পর আমাদের ঠিকানা লিখে পুলিশের থানায় পত্র পাঠিয়েছিলেম। একমাস পরে আমাদের নামে আদালতের শমন আসে। ওল্ড বেলীর সেসন্ কোর্টে ডাকাতি মকদ্দমার বিচার। আমরা হাজির হোয়ে জবানবন্দী দিয়েছিলেম। অন্যান্য সাক্ষী থাকলেও উপস্থিত-ক্ষেত্রে আমরাই দুজন প্রধান সাক্ষী। প্যারিস নগরে পামরের সঙ্গে আমার দেখা হোয়েছিল, সে আমাকে লণ্ডনে আন্‌বার পরামর্শ কোরেছিল, আমার কাছে অনেক নগদ টাকা, ব্যাঙ্ক-নোট ও মহামূল্য জহরত ছিল, বিশ্বাস কোরে সে সব কথাও আমি পামরকে বোলেছিলেম, জজের কাছে সে সব বৃত্তান্ত প্রকাশ কোত্তেও আমি বাকি রাখি নাই। বিচার শেষ হোয়ে গেল। ধরা পোড়েছিল পঞ্চান্ন জন; তাদের মধ্যে জন দশেক লোক ডাকাতি কোত্তো না, সুড়ঙ্গের ভিতর পাহারা দিত, আর বড় বড় ডাকাতের পরিচর্য্যা কোত্তো। সেই দশ জনের দশ দশ বৎসর নিউগেট্ কারাগারে কয়েদ থাক্‌বার দণ্ডাজ্ঞা। বাকি পঁয়তাল্লিশ জনের চিরজীবন নির্ব্বাসন।

লর্ড র‍্যাম্‌পার্টের অপঘাত মৃত্যুর পর আমি একবার সিরিলের সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছা কোরেছিলেম, কিন্তু পারি নাই; লজ্জা আমাকে বারণ কোরে রেখেছিল। এত দীর্ঘকাল কোথায় ছিলেম, কি কি কোরেছি, কেমন কোরে পরিচয় দিব, কত মিথ্যা কথা রচনা কোর্ব্বো, কোন মুখে তেমন

স্নেহাস্পদ সাধুস্বভাব প্রিয় সহোদরের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবো, তাই ভেবে সে ইচ্ছাকে তফাৎ কোরে দিয়েছিলেম, চক্ষে কিন্তু জলধারা বর্ষিত হোয়েছিল, মনের ভিতর হু হু কোরে আগুন জ্বলেছিল।

সহোদরের সঙ্গে দেখা করা হোলো না। র‍্যামপার্টের প্রদত্ত টাকাগুলি নিয়ে, সেই বাড়ীতেই আমরা থাক্‌লেম। যে পথে আমি দাঁড়িয়েছিলেম, সে পথটা বড় সোজা; ধর্ম্মের পথ দুর্গম, অধর্ম্মের পথ সুগম। অধর্ম্মের পথে আমার অনেক বন্ধু জুটেছিল। কারে বলে বন্ধু, কারে বলে বৈরি, মোহের ঘোরে সেটা নির্ণয় করবার জ্ঞান আমি হারিয়েছিলেম। র‍্যামপার্টের একজন বন্ধু নিত্য নিত্য প্রলোভন দেখিয়ে, সেই অবস্থায় আমার মন টোলিয়েছিল, তাকেই আমি অভিভাবক বোলে দেহ সমর্পণ কোরেছিলেম, প্রায় এক বৎসর কাল সে আমাকে নিজস্ব কোরে রেখেছিল, তার কাছেও আমি অনেক টাকা পেয়েছিলেম। লোকটার নাম কর্ণেল ক্যাটার পিলার। এক বৎসর পরে আমাতে তার অরুচি জন্মালো, সে আমাকে ছেড়ে দিয়ে গেল। তার পর আট বৎসর। সেই আট বৎসরের মধ্যে আট দশ জন ধনবান লম্পট একে একে আমার মুরুব্বি হোয়েছিল, তাদের কাছেও আমি অনেক টাকা পেয়েছিলেম। সকলের নাম আমি বোলবো না;—বলবার দরকারও নাই; কেবল শেষের দুজনের নাম প্রকাশ করা আবশ্যক মনে কচ্ছি; কেন না, ভেল্‌কিবাজীর মতন তারা অনেক খেলা খেলেছিল। একজনের নাম কাপ্তেন গোলাস্, দ্বিতীয় জনের নাম ভাইকাউণ্ট অ্যাম্বুস্। একজন বড় জমীদারের

সঙ্গে মকদ্দমা কোরে কাপ্তেন গোলাস দেউলে হোয়েছিল, টাকার শোকে আত্মহত্যা কোরেছিল। অসম্ভব অপব্যয়ের ঘোর তুফানে ভাসতে ভাসতে ভাইকাউণ্ট অ্যাম্বুস্ পথের ভিখারী হোয়েছিল; পথের লোকের কাছে দুটি একটি ফার্দ্দিং ভিক্ষা কোত্তেও তার লজ্জা ছিল না; ভিখারী অবস্থাতেই উপবাসে, উপবাসে সেই হতভাগার প্রাণান্ত! সেই অ্যাম্বুস্টা একজন ধনবান্ জমীদারের পোষ্যপুত্র ছিল।

জীবনচক্রের এই রকম বিপরীত বিঘূর্ণন দেখে দেখে আমার ঘৃণা জন্মালো, বিলাস বাসনা পরিত্যাগ কোল্লেম। পাপের পথে—পাপের ফাঁদে আর পদার্পণ কোর্ব্বো না, জগৎপিতার নামে শপথ কোরে সেই রকম আমার প্রতিজ্ঞা,—সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

লর্ড র‍্যামপার্ট আমার সিলভিয়ার বিবাহ দিবেন বোলে-ছিলেন, তাঁর জীবনে কুলাল না, সিলভিয়ার বিবাহ হোলো না। আমার চেয়ে সিলভিয়ার বয়স কম, তথাপি বিবাহ কোত্তে সিলভিয়ার ইচ্ছা হয় নাই; সিলভিয়া চিরকুমারী থাকলো। ঈশ্বরকে সাক্ষী রেখে আমি বোলতে পারি, সিলভিয়ার চরিত্র নিষ্কলঙ্ক; যতদিন আমার সঙ্গে জানা শুনা, অন্ততঃ ততদিন সিলভিয়াকে আমি পবিত্র সতী-কুমারী বোলেই জেনে রেখেছিলেম, একদিনের জন্যও কোন প্রকার পাপের দিকে তার মন টলে নাই। আমাদের দেশে সতী কম, কিন্তু আমার সিলভিয়া সতী কন্যার একটি উজ্জ্বল আদর্শ।

দুরবস্থার দাসী হোয়ে, হোরেসের চক্রে প্রতারিত হোয়ে অবধি আমি অনেক পাপ কোরেছি; অন্য পাপে কলঙ্কিত

না হই, নারী জাতীর প্রধান ধর্ম্ম যে সতীত্ব, সেই সতীত্ব-রত্ন আমি বিসর্জ্জন দিয়েছি। শেষকালে গণিকাবৃত্তিও অবলম্বন কোত্তে হোয়েছিল। হায় হায়! স্ত্রীলোকের যদি সতীত্ব যায়, তবে আর বাকি থাকে কি? মহা পাপীয়সী আমি! পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, সেইটি স্মরণ কোরে, সর্ব্বপাপ বিমোচনের জন্য জগদীশ্বরে মনপ্রাণ সমর্পণ কোরে, সাধ্যমত সৎকার্য্যে আমি ব্রতী হোয়েছিলেম। দেশের টাকাওয়ালা লোকেরা গরী-বের কষ্টে দৃক্‌পাত করেন না, আমি সাধ্যমত কতকগুলি গরীব-লোকের সাহায্য কোত্তে আরম্ভ করি; বাড়ীর কাছেই আসুক, কিম্বা পথেই দেখা হোক, যথার্থ গরীব লোক দেখলেই আমার দয়া হোতো, তাদের উপকারের জন্য আমার পাপার্জ্জিত ধনের অনেকাংশ আমি বিতরণ কোরেছি। নিজের মুখে নিজের সৎকার্য্যের শ্লাঘা কোত্তে নাই। পাঁচজনকেও জানাতেও নাই, গোপনে গোপনেই আমি দান কোরেছি।

ভাইকাউণ্ট অ্যাম্বুশের পতনের পর আমার হৃদয়ে সৎ-প্রবৃত্তির উদয়। সিল্‌ভিয়ার সঙ্গে ধর্ম্মশাস্ত্রের সদালাপে আমার দিনযামিনী সুখে কাটতে্ লাগলো। অদৃষ্টের ভোগ কে বোল্‌তে পারে! সেই রকম একটু শান্তির অবসরে আমি আর একটা মহাবিপদে পোড়েছিলেম।—খুনদায়!—অকস্মাৎ খুনের দায়ে আমাকে মহাবিব্রত হোতে হোয়েছিল। কিছুই আমি জানতেম না, কিছুই আমি ভাবি নাই, কোথাকার খুন, কি বৃত্তান্ত, লোকটা কে, কে খুন কোরেছিল, কিছুই আমার জানা ছিল না। একটা গলাকাটা অজ্ঞাত লোক একরাত্রে আমার বাড়ীর দরজার বাহিরে পোড়েছিল; তাতেই আমার উপর পুলিশের

সন্দেহ। পুলিশে আমি হাজির হোয়েছিলাম; একজন ব্যারিষ্টার দিয়াছিলেম,—ব্যারিষ্টারটি ফৌজদারী মামলায় যেমন সুদক্ষ, স্বভাবেও সেইরূপ ভদ্রলোক। তিনি আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, হাকিমের কাছে তুমি এই মর্ম্মে জবাব দাও যে, যে রাত্রে খুন, সে রাত্রে আমি বাড়ীতে ছিলাম না। ঐ রকম জবাব তুমি দাও, তারপর যা কোত্তে হয়, আমি আছি।

ব্যারিষ্ট্যার আমাকে আরো বোলেছিলেন, পশ্চিম সহরতলীতে আমার একটী বন্ধুর একখানি বাগান আছে, খুনের রাত্রে সেই বাগানে তুমি ছিলে, এই কথাই আমি প্রমাণ কোর্ব্বো। বাগানে যে সকল লোকজন আছে, তাদেরও শিখিয়ে রাখবো, যাঁর বাগান, তাকেও আমি রাজী কোর্ব্বো। তুমি বোলো, বাগানে সেই রাত্রে নৃত্য-গীতের মজলিস ছিল, তুমি সেই মজলিসে নিমন্ত্রণে গিয়েছিলে। ঠিক্ ঠিক্ প্রমাণ হোয়ে যাবে।

সেই ব্যারিষ্টারটির সঙ্গে তৎপূর্ব্বে দুই একদিন আমার আলাপ হোয়েছিল, তাতেই আমার উপর তাঁর ঐরূপ অনুগ্রহ। তাঁর পরামর্শে পুলিসে আমি সেই রকম জবাব দিয়েছিলেম, বাগানের লোকেরাও সাক্ষী হোয়েছিল, সিল্‌ভিয়াও সাক্ষী হোয়েছিল, আমার বাড়ীর চাকর দরোয়ানেরাও সেই বয়ানে সাক্ষ্য দিয়েছিল। জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ! সেই উপায়ে মিথ্যা খুনের দায় থেকে আমি উদ্ধার হোয়ে এসেছি।

দেখুন, আমার অধঃপতনের সীমা কত দূর! যে সকল কাজ আমি কোরেছি, তাতে তো অধঃপতন হোয়েই ছিল, তার উপর আবার ঐ একটা উপসর্গ!—খুন দায়!—যদিও

সে দায় থেকে ধর্ম্ম আমাকে রক্ষা কোরেছেন, তথাপি কিন্তু কত বড় কলঙ্ক! অমুক লোক একটা খুনি মামলায় আসামী হোয়েছিল, এই যে একটা ভয়ানক দুর্ণাম, সেটা কিছুতেই মোচন করা যায় না। কথাটা কাণে শুনলেও প্রাণ শিউরে উঠে। বিশেষতঃ খবরের কাগজে আমার নাম ছাপা হোয়ে গিয়েছে। লণ্ডনের মতন যায়গায় ছোট ছোট পুলিস কেশ পর্য্যন্ত খবরের কাগজে উঠে; অত বড় খুনি মামলাটা অবশ্যই ছাপা হোয়েছে; তিন চারখানা খবরের কাগজে আমি স্বচক্ষেই দেখিছি, নিজেই পাঠ কোরেছি; নিষ্পাপ হোলেও মনে একটুও শান্তি পাচ্ছি না, খুনি মামলার বিচার হয় নাই, প্রকৃত অপরাধীকে গ্রেপ্তার করবার জন্য পরোয়ানা বেরিয়েছে; কতদিনে ধরা পোড়বে,—পোড়বে কিনা পোড়বে, কে বোল্‌তে পারে! বিনা প্রমাণে—আরো আমার সাফাই সাক্ষীর জোরে আমি কিন্তু অব্যাহতি পেয়েছি। সেটা হোলো আজ আট মাসের কথা। এই আট মাস আমি প্রায় সর্ব্বক্ষণ সেই মহা কলঙ্কের মূর্ত্তি চক্ষের উপর দর্শন করি;—মূর্ত্তি যেন ভয়ঙ্করী বেশে রাত্রিকালে স্বপ্নযোগেও আমার চক্ষের কাছে আসে। আর আমি এ সংসারে থাক্‌বো না। যারা যারা এই ভয়ঙ্কর সংসারকে সুখের সংসার বলে, তারা নিতান্তই মহা মোহে বিভ্রান্ত; আমি বুঝেছি, এ সংসার কেবল পাপের সংসার! আর আমি এই পাপ-সংসারে বাস কোর্ব্বো না। রোমরাজ্যে চোলে যাবো। সেখানে আমাদের পবিত্র ধর্ম্মগুরু মহারাজ পোপ অবস্থান করেন; যে স্থানে পোপের অধিষ্ঠান, সে স্থানটি আমাদের পবিত্র তীর্থ; শীঘ্রই আমি তীর্থযাত্রা কোর্ব্বো।

আমি পরম পূজ্য রোমান ক্যাথলিক্ ধর্ম্মের সেবা করি, পোপ আমার পরম গুরু, পোপের রাজ্য মধ্যে আমি আশ্রয় গ্রহণ কোর্ব্বো। আমার বয়স এখন চল্লিশ বৎসর; সেখানকার যোগিনী মঠে আমি যোগিনী হোয়ে থাক্‌বো। সিলভিয়া আমার সঙ্গে থাক্‌বে; যদি ইচ্ছা হয়, সিলভিয়াও আমার সঙ্গে যোগিনী হবে। যেখানে রাজধানী সেই খানেই মহাপাপ; এক মাসের মধ্যেই আমি এই লণ্ডন নগরী ছেড়ে যাবো। বাড়ীখানা বেচে ফেলবো, গাড়ী ঘোড়া বেচে ফেলবো, জিনিসপত্র বিলিয়ে দিব, জন্মের মত পাঠ উঠাবো। সিরিলের সঙ্গে দেখা হোলো না, সেই একটি বড় আক্ষেপ থাকলো। দেখা কোত্তে পাল্লেম না, অদৃষ্টের বিড়ম্বনা। আমারও দোষ নয়, সিরিলেরও দোষ নয়। এক মাসের মধ্যেই আমি পালাবো। তার পর আমার কি দশা হবে, যিনি আমাকে ভবসংসারে পাঠিয়েছেন, তিনিই জানেন। আপাততঃ এই পর্য্যন্তই আমার জীবন-কাহিনী সমাপ্ত।
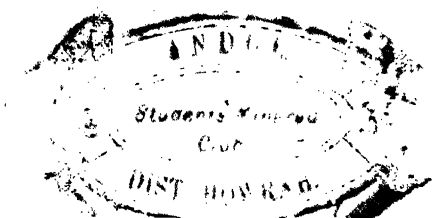
উপসংহার।

কুমারি অলিভিয়া রোজ আমার কাছে ঐরূপ আত্মকাহিনী বর্ণন করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নিজের নাম প্রকাশ করিয়াছেন, আমি তাঁহার জীবন-কাহিনীর মনোযোগী শ্রোতা, আমি কিন্তু আমার নিজের নামটি অপ্রকাশ রাখিলাম। অপ্রকাশের কি কারণ, পাঠক মহাশয়েরা সেটি জানিতে চাহিবেন না। নাম অপ্রকাশ রাখাতে যদি আমার কিছু অপরাধ হয়, ভরসা আছে, দয়া করিয়া তাঁহারা সে অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন।

এই আখ্যায়িকার নামকরণ করা হইয়াছে—বিলাতী স্বর্ণবাই। এরূপ নাম দিবার কি কারণ, মফঃস্বলবাসী পাঠক মহাশয়েরা হয়তো তাহা জানিবার নিমিত্ত কৌতূহলী হইতে পারেন, তাঁহাদের সেই কৌতূহল চরিতার্থ করিবার মানসে এইখানে আমি সেই প্রশ্নের কৈফিয়ৎ প্রদান করিলাম।

কলিকাতা নগরে একটি স্বর্ণবাই ছিলেন, তিনি আমাদের স্বদেশী স্বর্ণবাই। অধুনা যদিও তিনি কলিকাতায় উপস্থিত নাই, কিন্তু ভারতমাতা তাঁহাকে কোলে করিয়া রাখিয়াছেন। অলিভিয়ার যেরূপ সংকল্প, সেইরূপ সংকল্পে আমাদের স্বর্ণবাইজী তীর্থবাসিনী হইয়াছেন। কলিকাতা সহরে স্বর্ণবাইজীর যে প্রকার বহু লীলার বিবরণ লোকমুখে শুনিতে পাওয়া যায়, অলিভিয়া রোজের বহু লীলার সহিত তাহার বিস্তর মিলন আছে। কেবল মিলনমাত্র কেন, অনেকগুলি কার্য্য ঠিক এক রকম। সেই

কারণে অলিভিয়ার নাম দেওয়া হইল—বিলাতী স্বর্ণবাই। অলিভিয়ার নামে একটা খুনি মামলা উঠিয়াছিল, আমাদের স্বদেশী স্বর্ণবাইজীর নামেও সেই রকম একটা মিথ্যা খুনি মামলা রুজু হইয়াছিল; অলিভিয়া রোজ যেমন সগৌরবে সেই খুন দায়ে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন, স্বদেশী স্বর্ণবাইজীও সেইরূপ গৌরবে খুনদায় হইতে অব্যাহতি পান। সেই নিমিত্তই এই পুস্তকের নাম দেওয়া হইল—বিলাতী স্বর্ণবাই।

বিলাতী স্বর্ণবাই এই অলিভিয়া রোজ। বিলাতে সেই রকম আরো দুটি পাঁচটি স্বর্ণবাই আছেন কিনা, বোধ করি, আমাদের পাঠক সমাজে সে প্রশ্নটাও উঠিতে পারে। দুটি পাঁচটি ছোট কথা, বিলাতের মতন সভ্য যায়গায় বোধ হয় অনেক স্বর্ণবাই থাকিতে পারেন, সকলকে আমরা জানি না, সুতরাং সংখ্যা দিতেও পারা গেল না। বিনা অন্বেষণে যাঁহাকে পাওয়া গিয়াছিল, তাঁহারি জীবন কাহিনী প্রকাশ করা হইল। পুনর্ব্বার বলি, তাহার নাম অলিভিয়া রোজ,—ওরফে রোজ ল্যাম্বার্ট,—ওরফে বিলাতী স্বর্ণবাই।

সম্পূর্ণ।